দু'টি পালক



কৃষ্ণধন নাথ

মৌমিতা প্রকাশনী

আগরতলা ত্রিপুরা-৭৯৯ ০০১

দু'টি পালক

Dooti Palak
(A Bengali Novel)
By Krishnadhan Nath

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা আগরতলা, ২০১০

প্রকাশিকা
সোমা মজুমদার
১, রোণাল্ডসে রোড, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা - ৭৯৯ ০০১
মোবাইল - ৯৪৩৬১ ২৭৯২১/৯৮৬২১ ৭২৩০৬

অক্ষর বিন্যাস
শ্রীমতী সুদীপ্তা দেব
সানগ্রাফিক্স, আগরতলা

মুদ্রণ
গিরি প্রিন্ট সার্ভিস
৯১/এ, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৯

ISBN 978-81-908745-4-0

প্রচ্ছদ
পুষ্পল দেব

মূল্য
একশত পঞ্চাশ টাকা

সকল প্রেরণা ও শক্তির উৎস
আমার সহধর্মিণী
শ্রীমতী ঊষা নাথকে

প্রকাশিকার কথা

এবামেও যে ব্যতিক্রমী মননধর্মী উপন্যাস রচিত হতে পারে তা কৃষ্ণধন নাথেব পাণ্ডুলিপি আকারে, দুটি পালক না পড়ার আগে বুঝতেই পারি নি। শিল্পীর তুলির প্রতিটি টানেই ফুটে উঠেছে আশ্চর্য সব কাল্পনিক ছবি, যা সবাইকে ভাবিয়ে তুলতে পারে, চমকিত করতে পাবে। কৈশোর-যৌবনের চির মধুর খন্ডচিত্র সমূহ যেন কোন মহাকাব্যের পটচিত্র। কৃষ্ণধন নাথ মূলতঃ একজন ক্রান্তদর্শী কবি। উপন্যাসের বিস্তীর্ণ পটভূমি জুড়ে রয়েছে মরমী কবি হৃদয়ের নিবিড় পবশ। উপন্যাসটিতে একাধারে সেক্স-রোমন্স-ধর্ম - দর্শণ -রাজনীতি সমাজনীতি ও জীবনের আলোকিত বহু বিষয় দীপ্তিময় ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত। এইটি আসলে প্রাচ্যের ভ্যালেন্টাইনস্ ডের এক রোমান্টিক মহা উপাখ্যান।

এই উপন্যাসটি মিলায়ধর্মী। পরতে পরতে দুটায় টান। রহস্যময়তায ভরা। শুরু করলে শেষ না করে ওঠা যায় না। বহুদিন পর বাংলা সাহিত্যও এক অননা উপন্যাসেব স্বাদ পাবে বলেই আমার ধারণা।

লেখকের অন্যান্য বইঃ

পৃথিবীর এপারে ওপারে (কাব্যগ্রন্থ-১৯৮৯)

চাবুক (কাব্যগ্রন্থ - ১৯৯৭)

ইলচা বিলচা (ছড়া সংকলন-২০০২)

মৌমিতা প্রকাশনী-র প্রকাশিত বইঃ

একুশের খোঁজে (কাব্যগ্রন্থ-২০০৪)

ইতিহাস ও সংস্কৃতিব আলোকে নাথধর্ম (গবেষণা গ্রন্থ-২০০৪)

ঢিম্ ঢিমা ঢিম্‌ঢিম (ছড়ার কবিতা সংকলন - ২০০৯)

লেখকের কথা

এই উপন্যাসটি ২০০৭ সালে কৈলাসহরে লেখা। উপন্যাস লেখার জন্য যে ভূতলস্পর্শী অভিজ্ঞতা, সুগভীর একাগ্রতা, অপার্থিব দরদী শিল্পী মন ও মননের প্রয়োজন, আমার মধ্যে এসকল মহৎ গুণের প্রচুর ঘাটতি বিদ্যমান। দৈন্যের মাঝারে দাঁড়িয়ে সত্যিকারের বিশ্বাসের ছবি অঙ্কন সহজ কাজ নয়। কোন রকম পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই হিজিবিজি লিখতে লিখতে যে মনের মধ্যে উপন্যাসের একটা ছবি দাঁড়িয়ে যাবে তা আমি ভাবতেই পারিনি। শৈশবের বর্ণময় ফেলে আসা স্মৃতি মঞ্জুরীর গায়ে কল্পনার রঙ তুলির সাহায্যে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কয়েকটা পরিচ্ছদ লিখে ফেললুম, মনে হচ্ছিল যে হয়তো একটা উপন্যাস সত্যি-সত্যিই অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত সে অঘটনটা ঘটে গেল। লিখতে লিখতেই উপন্যাসের একটা নামও মনে এসে গেল। ভেবেছিলাম উপন্যাসের নাম রাখবো 'শ্বেত পালক'। আর তখনই ঘটে গেল এই অবিশ্বাস্য অলৌকিক ছোট্ট ঘটনা। প্রাসঙ্গিক এই ঘটনাকে বাদ দিলে যে ভূমিকাটা নিরর্থক হয়ে পড়বে। কৌতূহলী মনও যে তা উল্লেখ্যের দাবি করে চলেছে। এই উপন্যাসের বৃহত্তর অংশই কৈলাসহরে আমার সরকারী আবাসে বসে লেখা। একদিন সকালবেলা কয়েকটি পাতা লিখে আমার কোয়ার্টারের সব্জী বাগান দেখে ফিরে এসে দেখি আমার বিছানার উপর অতি ক্ষুদ্র এক জোড়া পাখির পালক। ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হোল যে আমার উপন্যাসের নাম তো ঠিক করেছি 'শ্বেত পালক'। এটি তার কোন ইঙ্গিত নয় তো ? না ফেলে পালক দু'টি যত্ন করে রেখে দিলুম। এখনো রয়েছে। পরে অনেক ভেবে চিন্তে নাম পাল্টে "দু'টি পালক" নাম রাখি।

এই উপন্যাসে আমার জন্ম ও কর্মভূমি ত্রিপুরার নর-নারীর হৃদয়ের আর্তি-ভালোবাসা, ছোট'ছোট অনুভূতি, জল-জঙ্গল, সমাজ ও রাজনৈতিক সংঘাতের বিচিত্র কোলাজ পরতে পরতে উঠে এসেছে। লিখতে গিয়ে আমি কোথাও শিল্প বাস্তবতাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করিনি। আমি বিশ্বাস করি চেতনাদীপ্ত উপলব্ধি কখনোই অবাস্তব নয়। সাহিত্য সাধনা তো এ রাজ্যে কোন পেশা নয়। সকলেই আমার মতোই নেশার ঘোরেই লিখেন। লেখক মাত্রেরই পাঠকের কাছে একটা দায়বদ্ধতা থাকে। সেই দায়বদ্ধতার কথা আমার মাথায় রাখতে হয়েছে। পাঠক বোদ্ধা পাঠকের অনুভূতি চিরকালই মিশ্র। আমি এর বেশী প্রত্যাশাও করি না। আমি আজ কৃতার্থ যে আমি শেষ পর্যন্ত উপন্যাস লিখতে পেরেছি। সমালোচিত হলেই নিজেকে ঋদ্ধ মনে করবো।

কৃষ্ণধন নাথ



দু'টি পালক

তিয়ায ভাবুক। তিয়াষ স্বপ্ন দেখে। তাব চাবপাশে জোনাকির মতো স্বপ্ন ঝরে পড়ে । সে ভালোবাসে ফুল, পাখি, প্রজাপতি, জোনাকি, আকাশের তাবা, নীলচাঁদ। তার চারপাশে খেলা কবে শরতে পদ্ম, শিউলি, কাশফুল। হেমন্তে কুন্দকলি, স্নিগ্ধনীল শিশির, মিষ্টি হিমেল হাওযা। বসন্তে শিরীষ, শিমুল, অশোক, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, মাধবী। তার প্রিয় জল থই থই পদ্মদীঘি। যে জলে অবিরাম ভেসে বেড়ায় বালিহাঁস, পানকৌড়ি, হংস মরাল। পদ্মদীঘিব জল ছুঁয়ে বসে থাকতে ভালোলাগে তিয়াযেব। পদ্মদীঘির জলে পা ডুবিয়ে তিযাষ কবি কৃষ্ণধন নাথেব কবিতাটি মাঝে মাঝে আবৃত্তি করে,

দীঘিব জলে ডুবিয়ে দিযে পা,
নীল সাগরেব স্বপ্ন দেখি চুপে,
তোমার বুকে লুকিয়ে আমাব মুখ
তৃপ্ত আমি নীল আকাশী রূপে।

পদ্মদীঘিব জলে দুবন্ত শৈশব সাঁতার কেটে বেড়ায়। তিয়াষেব মানস পটে ফুটে ওঠে শ্বেত পদ্মদলে উদ্ভাসিত টলটলে জলে পবিপূর্ণ ধনী সাগব। উদযপুর শহর থেকে একটু দূবে মাতাবাড়ি যাবার পথে ব্রহ্মাবাড়ি। সাব্রুম-উদয়পুব জাতীয সড়কেব বামপার্শ্বে একটা পেট্রোল পাম্প। বিপবীতে পুলিশ ওয্যারল্যাস টাওযাব। এবই পাশ দিযে একটি প্রশস্ত ইট বিছানো গাড়ি রাস্তা সবকাবী কোয়ার্টাব গুলোকে পাশে রেখে ধনী সাগবেব পাড় দিযে আবার বেঁকে ডানদিকে জেলা কারাগার, বামদিকেখাদ্য গুদাম বেখে রাস্তাটি লালমাটিব ধূলা অঙ্গে মেখে পূর্ত দপ্তবেব অফিসের সামনে এসে ফের জাতীয় সড়কে মিশেছে। ধনী সাগরের পাড়ে সরকারী কোয়ার্টারে থাকে তিয়াষরা। তার বাবা উদযপুর মহকুমা শাসকের অফিসে অতিবিক্ত মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট পদে বৃত। সেই কোয়ার্টাবেব পাশে ধনী সাগব। যার জলে শরতে ফোটে রাশি রাশি পদ্মফুল। শীতে আসে বিদেশী পরিযাযী অতিথি পাখিবা। ধনী

দু'টি পালক

সাগরের নির্মল জলে দল বেঁধে তারা ভেসে বেড়ায়। পদ্মপাতার ঝোপে ডিম পাড়ে। সেই ডিম থেকে ছোট ছোট ধূসর সাদা বাচ্ছা বেরোয়। মায়ের সঙ্গে সেই হংস শিশুরাও জলে সাঁতার কেটে বেড়ায়। হংস বালিকাদের সাথে সেই জলে তিয়াষ ও সাঁতার কাটে । আর তার সাথে সাঁতার কেটে বেড়ায় একটি জলপদ্ম। নাম তার জুঁই। শ্বেতপদ্মের মতো ফরসা কোমল স্নিগ্ধ আভা মন্ডিত গাত্রত্বক। মাথায় একরাশ কুঞ্চিত কালো কেশ। হাতের আঙ্গুল শ্বেত করবীর কুঁড়ির মতো সুঁচলো। তেমনি পেলব। ভ্রমর কালো দুটি আঁখির তারা যেন বনহরিণী থেকে চুরি করে এনে কোন ভাস্কর বসিয়ে দিয়েছে । যুগল কালো ভুরুদ্বয় যেন শুক্লা দ্বিতীয়ার বাঁকা চাঁদ। কুন্দফুলের মতো সাদা দুই পংক্তি দন্ত পাটি। হাসলে যেন রাশি রাশি মুক্তো ঝরে পড়ে। ওষ্ঠ দুটি পাকা ডালিম ফলের লালিমা মাখানো। ক্ষীণ কটি দেশ পট চিত্রের মা দুর্গার চিত্ররূপ।

জুঁই আর তিয়াষ দু'জনেই শৈশবের বন্ধু। দুরন্তপনা ভরা সমগ্র শৈশব জুড়ে - শৈশবের সমগ্র চেতনা জুড়ে - তিয়াষের জীবনে - জড়িয়ে থাকে জুঁই - জুঁইয়ের পরশ। জুঁই এবং তিয়াষরা সরকারী কোয়ার্টারে থাকে। মুখোমুখি দুই পরিবারের কোয়ার্টার। মফঃস্বল শহরের ছোট সরকারী আবাস। তিয়াষের বাবা তপোধীর নাথ সরকারী অফিসার। মা নন্দিতা শিক্ষিকা। জুঁইয়ের বাবা হিমাদ্রি উদয়পুর জেলা আদালতের পেশকার, মা মাধুরী সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সুপার ভাইজার। জুঁইরা অনেকদিন ধরেই এই কোয়ার্টারে আছে । তিয়াষরা সাম্প্রতিককালের বাসিন্দা। দুই পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক বেশ নিবিড় ও গভীর। তিয়াষের বয়স বার, জুঁইয়ের দশ। তিয়াষ সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, জুঁই পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে।

হৃদয় জুড়ানো সবুজের সমারোহে নানা স্মৃতি বিজড়িত প্রাণ মাতানো শৈশব বেলার অমোঘ আনন্দ প্রবাহের কোন তুলনা হয় না। শৈশব মানেই স্বপ্নে ভরা রঙিন দিনের পালতোলা ময়ূরপঙ্খী । দিগন্তহীন সময়ের নীল জলে অবিরাম ভেসে বেড়ানো। অফুরন্ত আনন্দ ধারার ফেনিল উচ্ছ্বাস। হাসির উচ্ছ্বাসে রিম্‌ঝিম্‌ বর্ষার পুলক শিহরণ। আসলে শৈশব মানেই তো ছুঁয়ে দেখা। শৈশবে কেবল পরশের সুখ, ভোগের কোন উপকরণ নেই।

ধনী সাগরের স্বচ্ছ জলে তিয়াষ ও জুঁই সাঁতার কেটে বেড়ায়। তিয়াষের মাঝে মাঝে মনে হয়, এ যেন ঠাকুমার কাছে শোনা রূপকথার সেই ক্ষীরের সাগর। যেই সাগরের নীচে লুকিয়ে আছে এক আশ্চর্য মায়াপুরী। যেখানে সোনার পালঙ্কে মরণ কাঠির স্পর্শে সুখ নিদ্রায় শুয়ে আছে এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা। আর ধনী সাগরের জলে সাঁতর কাটতে গিয়ে সন্তরণরত জুঁইকে দেখলেই তার মনে হয়, জুঁই যেন সেই স্বপ্নপুরীর রাজ

কুমারী। এই মাত্র সোনার কাঠির স্পর্শে জেগে যেন ভেসে উঠেছে। তার অপূর্ব সুন্দর ফরসা হাত-পা, চোখ-মুখ, চিবুক, ডালিম রাঙ্গা ওষ্ঠ। জলে ভেজা কেশরাশি - দেখেই তিয়াষের মন বলে জুঁই সত্যিই সেই অচিনপুরের কুচবরণ কন্যা, যার মেঘবরণ কেশ। সাঁতার কাটার সময় জুঁইকে দেখলে মনে হয়, বুঝি একটা সত্যিকারের পদ্মফুল সাঁতার কেটে চলেছে।

তারা দু'জন একই সঙ্গেই নানা খুনসুটি করে বেড়ায়। তিয়াষের স্কুল দুপুরে, জুঁইয়ের সকাল বেলা। স্কুল ছুটির পর পাড়ার অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের সাথে দল বেঁধে তারা কখনো লুকোচুরি, কখনো বা চোর-পুলিশ, কখনো এক্কা-দোক্কা আবার কখনো বা খোলামাঠে গোল্লাছুট খেলে বেড়ায়।

জুঁইয়ের সঙ্গে তিয়াষের খুব ভাব। রবিবার বা ছুটির দিন হলে কখনো জুঁই এসে তিয়াষকে ডাকবে-তিয়াষদা , চলো সাঁতার কাটতে যাবো। আবার কখনো তিয়াষ জুঁইকে ডেকে বলবে - এই জুঁই স্নান করতে যাবি নাকি। গেলে তাড়াতাড়ি আয়, আমি যাচ্ছি কিন্তু ।

ধনী সাগরের জলে সাঁতার কাটতে কাটতে তারা জলডুবি খেলা খেলে। একদিন এমনি সাঁতারের সময় শাপলা ফুলের নালে জুঁইয়ের পা জড়িয়ে যায়। কিছুতেই জুঁই পা ছাড়াতে পারছিলনা। যতই পা ছাড়াতে চায়, ততই দুইপা আরো বেশী আটকে যায়। তিয়াষ হঠাৎ দেখতে পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জুঁইকে জড়িয়ে ধরে টেনে একেবারে পাড়ে নিয়ে আসে। জুঁইয়ের তখন চোখ বোঝা। বুকটা ধুক ধুক করছিল। তিয়াষের কোলের উপর মাথা শোয়ানো। সারা শরীর জলে সিক্ত, কালো কুঞ্চিত কেশরাশি থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে জল পড়ছে। তিয়াষের মনে এক অনাস্বাদিত অনুভূতি খেলে বেড়ায়। জুঁই যেন তার বহু জন্মের পরিচিত। জন্ম-জন্মান্তর ধরেই যেন তাদের এই অনন্ত শৈশবের খেলা-বেলার দিন চলছে। তারা বহু জনম ধরে এই অনন্ত বিশ্বলোকে সাঁতার কেটেই চলেছে - বিরামহীন। তিয়াষ ডাকে - জুঁই, এই জুঁই, চোখ মেল। দ্যাখ্, আমাব দিকে তাকিয়ে দ্যাখ্।

তিয়াষের সঙ্গে নিত্যই কত খুনসুটি করে জুঁই। কিন্তু এমন কোনদিন তো তিয়াষের কোলে মাথা রেখে চোখ বুজে শুয়ে থাকেনি জুঁই। জুঁইয়ের কেমন যেন এমনি শুয়ে থাকতে ভালো লাগছে। ইচ্ছে করছে না চোখ খুলে তাকাতে। কি একটা অস্পষ্ট ভালো লাগা সারা শরীর-মনে নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। আকাশ থেকে চাঁদ নেমে এলে, কিংবা ঝিঁ ঝিঁ ডাকা সন্ধ্যার অন্ধকারে জোনাকীরা উড়ে বেড়ালে যেমন ভালো লাগত, তেমনি এক অজানা, অচেনা অথচ একান্ত আপনার করা কি একটা ভালো লাগার অনুভব সমগ্র চেতনা জুঁড়ে সুড়সুড়ির

মতো খেলা করছে। মা-বাবা ছোট বেলায় জুঁইকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করলে যে রকম ভালো লাগত । এই ভালো লাগার অনুভূতি তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর মধ্যে যেন কেমন একটা মিষ্টি মিষ্টি লজ্জা লজ্জা ভাবও রয়েছে। জুঁইয়ের এই অনুভূতিটা যে পুরো ভাষাহীন, কথাহীন। কোন কিছু দিয়েই যেন বোঝানো যায় না। অকস্মাৎ এক অজানা আবেগে চোখ মেলেই দুই হাত বাড়িয়ে সে তিয়াষকে জড়িয়ে ধরে। এইভাবে অনেকক্ষণ তারা পদ্মফুলের ঝোপের আড়ালে লোক চক্ষুর অন্তরালে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুপচাপ বসে থাকে। বাঁধন ছাড়তে যে ইচ্ছেই করছে না।

তারপর এক সময় দু'জনই দু'জনকে ছেড়ে দিয়ে টুপ করে দীঘির জলে ডুব দিয়েই ঘরে ফিরে এল। কী এক অনাবিষ্কৃত লজ্জায় দু'জনের কেউই কারো চোখের দিকে তাকাতে পারছিল না। তিয়াষ এবং জুঁই দু'জনেই বুঝতে পারছিল যে তাদের জীবনে আজ কিছু একটা ঘটেছে। এমনি ঘটনার আসলে কোন বয়স লাগে না। এমনতরো ঘটনায় সব বয়সের নর-নারীর মধ্যেই ক্ষণিক লজ্জা এসে গ্রাস করে। সব বয়সের মানুষই ক্ষণকালের জন্য বোবা হয়ে যায়। মেয়েদের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় রয়েছে। আর এই ইন্দ্রিয় শৈশব থেকে সক্রিয়। জুঁই ও তিয়াষের মধ্যে যে অনুভব - এক অজানা রোমাঞ্চ ও পুলক - তার একটা ভাষা আছে। কবি কৃষ্ণধন নাথের - 'একুশের খোঁজে' কবিতায় যে অনন্ত অভিব্যক্তি ব্যক্ত হয়েছে তার তুলনা সমগ্র বাংলা কাব্য জগতে বিরল। যারা ভাষাহীন তাদেরও তো ভাষা থাকে। কবি যখন বলেন , —

"পাতা ঝরা রাবার বনের উদাস ব্যাকুলতায়,
শিমুল শিরীষ গুলমোহরের দুর্মর মাদকতায়
পলাশ পিয়াল হিম চম্পার মনমাতানো উল্লাসে
শিউলি কদম বকুলের মাতাল সুবাসে
শাপলা, হেলেঞ্চা পাতা, শুষনি শাকের নরম আবেশে
আমার হৃদয়ে যে আশ্চর্য অনুভূতি জাগে —
তারও একটা ভাষা আছে।"

সেই ভাষার ব্যাপক তাৎপর্য এই বয়সে না বুঝেও যে তারা অনেক কিছু আভাষে বুঝে গেছে তাতে কোন সংশয় নেই।

তিয়াষকে দু'একদিন না দেখলেই জুঁই যেন তার মনে কী এক গভীর শূন্যতা অনুভব করে। জুঁই তার পুতুলের বিয়ে দেবে। বড়ো আয়োজন চলছে। মৌ, দিয়া এবং

দু'টি পালক

নীতা জুঁইয়ের পুতুল খেলার সাথী। জুঁই বাবাকে মনু দর্জির দোকান থেকে রঙ বেরঙের কাপড়ের টুকরো এনে দিতে বলেছিল। বাবা তা যেন কবেই ভুলে গেছে।

জুঁই তাই তিয়াষকে একদিন বলে - তিয়াষ দা, আমার পুতুলের জন্য কাপড় এনে দেবে ? বাবাকে বলেছিলাম। বাবা তো ভুলেই গেছে। তুমি এনে দাও না। নীতার পুতুলের সঙ্গে, আমার পুতুলের বিয়ে দেবো।

জুঁই জানে, তিয়াষকে বললে, তিয়াষ যে ভাবে হোক তা এনে দেবেই। তিয়াষের মধ্যে জুঁই যেন অস্ফুট ভবিষ্যতের কি একটা ছবি দেখতে পায়। অস্পষ্ট একটা ছবি। দূর কোন ভবিষ্যতের। জুঁইয়ের চোখের সামনে একটা নাম না জানা জগৎ তিয়াষকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

সেদিন ছুটির দিন। দু'জনেই সকাল থেকে নানা খুনসুটি করে বেড়াচ্ছিল। কী একটা ঘটনায় রেগে গিয়ে তিয়াষ জুঁইয়ের একটা পেন্সিল নর্দমার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। এরপর রাগ করে জুঁই তিনদিন তিয়াষের সঙ্গে কোন কথা বলেনি। তিয়াষের সঙ্গে এই যে কথা না বলা, তারজন্য জুঁই মনে মনে এমন ব্যথা পেয়েছিল কেন ? কেন তার এত কষ্ট লেগেছিল ? কেন সে অভিমানে বিছানায় শুয়ে সকলের অলক্ষ্যে কেঁদেছিল ? তিয়াষের জন্য জুঁইয়ের এমন কান্না পায় কেন ? তিয়াষতো তার আপন কেউ নয়, আত্মীয়ও নয়। তবু এমন হয় কেন ? আত্মীয় না হলে মানুষ আপন হতে পারে ? মাকে জিজ্ঞেস করবে ভেবেছিল জুঁই। জিজ্ঞেস করতে আবার নিজের কাছেই কেমন একটা লজ্জা লাগছিল। কিসের এই লজ্জা ? মেয়েদের লজ্জা কি বেশী? মেয়েরা কাঁদে। কেন কাঁদে ? কেবল কি মেয়েরাই কাঁদে? বাবা বকলে মা কাঁদে । মা বকলে তো বাবা কাঁদে না। রাঙ্গা পিশিকেও কাঁদতে দেখেছে জুঁই। ছোট মাসীর বিয়ের সময় মাসী ও দিদা কেবল কাঁদতো। মেয়েদের কান্না আপনা আপনিই বেশী পায়। অভিমানের কান্না যা সকল নারীরই একান্ত নিজস্ব ও আপনার, এর কোন দোসর হয় না।

বাবা সেইবার কালকাতা থেকে ফিরতে জুঁইয়ের জন্য অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর পুতুল এনেছিল। কয়েকটি মেম ও সাহেব পুতুলও ছিল। চরকিটা ঘুরিয়ে দিলে সাহেব ও মেম পুতুল ভারী সুন্দর কোমর দুলিয়ে নাচে। নীতার বাবাও নীতার জন্য পুতুল এনে দিয়েছেন।

নীতার বাবা জজ সাহেব। চোর-ডাকাতদের জেলে পুরতে নাকি তিনি ভারী ওস্তাদ। সবাই তাঁকে বড় ভয় করে। খুবই বদমেজাজী। শশধর শিকদার। নাম শুনলেই চোর ডাকাতদের হৃদকম্প শুরু হয়। জুঁই ও নীতা এক ক্লাসেই, একই স্কুলে পড়ে । নীতাদের

দুষ্টি পালক

কোয়ার্টার জুঁইদের কোয়ার্টার থেকে বেশ একটু দূরে। জেলখানা এবং সরকারী খাদ্য গুদাম পেরোলেই তাদের কোয়ার্টার।

জুঁই নীতাকে একেবারেই পছন্দ করে না। নীতা বড্ডো নাক উঁচু মেয়ে। নীতার বাবা জজ, আর জুঁইয়ের বাবা জেলা জজ আদালতের পেশকার। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। বাবার বড় চাকুরীর অহংকার নীতার মধ্যে কুৎসিতভাবে প্রকট। নীতা কথায় কথায় তার বাবার চাকুরীর তুলনা দেয় সব ব্যাপারে। তাই নীতাকে জুঁইয়ের একেবারেই ভালো লাগে না।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরতে নীতার সঙ্গে জুঁইয়ের বেশ ঝগড়া বেধে যায়। বিবাদের বিষয় তুচ্ছ হলেও পরিণাম কিন্তু খুবই খারাপ হয়।

জুঁই নীতাকে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে জিজ্ঞেস করে — নীতা, তোর বাবা তোকে এবার পূজোয় কি পোশাক কিনে দিয়েছে রে ?

নীতা — এবার বাবা আমাকে একটা মেরিন ব্লু জীনস্ সেট কিনে দিয়েছে। তোর জন্য তোর বাবা কি কিনলো ?

জুঁই — বাবা আমায় এবার পূজোতে কাঁথা স্টিচের উপর বুটিকের কাজ করা শালোয়ার কামিজ কিনে দিয়েছে।

নীতা — কাল বিকেলে তোর মার সঙ্গে রুমার বার্থ ডে পার্টিতে যে পোশাকটি পরে এসেছিলি - সেটা ছিলো তোর এবারের পূজোর ড্রেস ?

জুঁই বলল — হ্যাঁ।

নীতা — ইস্ । তোর বাবার কী বিশ্রী চয়েস রে ? তোর জন্য একটা ভালো সেট কিনে দিতে পারেনি ?

জুঁই নীতার কটু মন্তব্যে মনে মনে খুব রেগে যায়। তারপর বলে - তোর ওই ম্যাড়ম্যাড়ে জীনস্ থেকে আমারটা হাজার গুণ ভালো। তোর পোশাকের চেয়ে দেখতে যেমন ভালো, তেমন সুন্দর, তেমনি পরতেও আরাম। তুইতো কেবল ধেমাক দেখাস। তোর বাবার টাকার গরম আবার বেশী। বাপ থেকে মেয়ে আরও তিন ডিগ্রি উপরে। ওই শুঁটকির মতো বেঢপ ড্রেস পরলে যে তোকেও শুটকি মাছের মতো লাগে, তা তুই একটুও বুঝিস না ?

নীতা — ওই চুড়িদার পরলে যে তোকে চামচিকের মতো লাগে - তা তুই বুঝিস্ ? মেয়ের, ঢং দেখে বাঁচিনা। তোর কী রূপের অহংকার কম ? আমরা বুঝি সেটা জানি না ?

দু'টি পালক

জুঁই — তোর ওই পোশকটা একটা পেট মোটা ইদুঁরকে পরালে আরো ভালো লাগতো দেখতে।

নীতা — তোকে তো দেখতে ভূতের মতো লাগে।

জুঁই — তোকে দেখতে লাগে শাক-চুন্নির মতো।

নীতা — বাবা যেমন একটা ভল্লুক, মেয়েটাও তেমন।

জুঁই — তোর বাবা যেমন শিম্পাঞ্জী, তুই ও তেমন।

সারা রাস্তা জুড়েই জুঁই ও নীতা ঝগড়া করতে করতে এল। শিশুদের ঝগড়া ও যে কখনো কখনো বড়দের ঝগড়ায় রূপান্তরিত হয়, তা জুঁইয়ের জানা ছিল না।

রাত্রে জুঁইদের বাড়িতে জজ সাহেব শশধর বাবু চাপরাশি পাঠিয়ে জুঁইয়ের বাবাকে জরুরী তলব পাঠালেন। সচরাচর শশধর বাবুর ওখানে হিমাদ্রি বাবুর ডাকে পড়ে না। তিনি অতিরিক্ত সেশন জজের অধীনে কাজ করেন। জজ সাহেব কেন হিমাদ্রিকে ডেকে পাঠাল তা সে অনুমান কবতে পারল না। হিমাদ্রি ডাক পেয়ে জজ সাহেবের কোয়ার্টারে গেলেন। সেখানে যাবার পরই ঘটনা অন্যখাতে মোড় নিল। জজ সাহেব রেগে কাঁই হয়ে আছেন। হিমাদ্রিকে দেখে কোন সৌজন্য প্রদর্শন না করেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তারপর বললেন — মিঃ মজুমদার, আপনার মেয়েকে এসব কি শিক্ষা দিচ্ছেন ? আপনি মেয়েকে এমন শিক্ষা দিলে - আপনাকেও তো উচিৎ শিক্ষা দিতে হয়।

জজ সাহেবের কথা শুনে হিমাদ্রি হকচকিয়ে গেলেন। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হিমাদ্রি বলল — আপনি কি বলছেন স্যার, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনা। জজ সাহেব - বুঝতে পারছেন না ? নাকি বুঝেও না বোঝার ভান করছেন ? হিমাদ্রি এবার বিনীত ভাবে বলে— সত্যি বলছি, আমি কিছুই জানি না স্যার, কি ঘটেছে বা হয়েছে, তা একটু বলুন না স্যার।

জজ সাহেব হিমাদ্রিকে সব জ্ঞাত করলেন। জুঁই স্কুল থেকে ফেরার পথে জজ সাহেবের মেয়ে নীতাকে যা নয় তা বলে গাল মন্দ করেছে। শুধু তাই নয়, জজ সাহেবকেও শিম্পাঞ্জী বলে কটূক্তি করেছে।

হিমাদ্রি সব শোনার পর জজ সাহেবের কাছে মেয়ের আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করল এবং ক্ষমা চেয়ে নিল। শুধু তাই নয়, মেয়েকে শাস্তি দেবার কথাও বললো এবং মেয়ে যাতে ভবিষ্যতে আর কোনদিন এমন আচরণ না করে সেই ব্যাপারেও নিশ্চয়তা দান করল।

দু'টি পালক

হিমাদ্রি অতি সজ্জন, অমায়িক, পরোপকারী, বন্ধুবৎসল। সংস্কৃতি প্রেমী, গান-বাজনা ভালোবাসেন। অফিস নাটকে অভিনয় করেন। বিপদে পড়লে সকলকে সাহায্য করেন। সাধারণ পেশকারের চাকুরী করলেও হিমাদ্রি উচ্চ শিক্ষিত। বাংলা সাহিত্যে অনার্স সহ এম.এ. পাশ। আইন কলেজে পড়বার সময় হঠাৎ-ই বাবা মারা যান। বাধ্য হন পড়া ছেড়ে চাকুরী নিতে। ডাই-ইন-হারনেস কেইসে বাবার চাকুরীটাই নিয়ে নিল হিমাদ্রি। ভালো ছাত্র হিসাবে হিমাদ্রির বেশ সুনাম ছিল। কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ হিমাদ্রিকে খুব ভালোবাসত। গল্প-কবিতা লেখাব প্রতিও ঝোঁক ছিল হিমাদ্রির। সংসারের চাপে এবং অভাব অনটনের তাড়ায় সব ছেড়ে ছুড়ে সংসার জীবনে মন দেয় হিমাদ্রি।

শান্ত, ধীর, স্থির হিমাদ্রি জজ সাহেবের কথায় বড়ো অপমানিত বোধ করেন। হিমাদ্রি তার মেয়েকে পরম স্নেহে, যত্নে, আদরে ও শাসনে বড়ো করে তুলছেন। হিমাদ্রি খুবই আদর্শবাদী। বামপন্থী আদর্শের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। জুঁই প্রতি বছরই ক্লাসে ফার্স্ট হয়। জজ সাহেবের মেয়ে নীতাও জুঁইয়ের সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ে। কিন্তু জুঁইকে ছাপিয়ে একবারও যেতে পারেনি। প্রতিবারই জুঁইয়ের পেছনে থাকে। কখনো দ্বিতীয়, আবার কখনো বা তৃতীয় হয়। জজ সাহেব ও তাঁর স্ত্রী জুঁইয়ের প্রতি একটা চাপা ঈর্ষা পোষণ করেন। তাঁরই অধঃস্তন একটি সাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর মেয়ে হয়েও যে ভাবে জুঁই এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে ঈর্ষা হওয়া অতি স্বাভাবিক। মেয়েটির রূপে-গুণে কোন তুলনা নেই। জুঁই দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি তার নাচ। জুঁইয়ের নৃত্য অতি সাবলীল। অনুষ্ঠানে জুঁইয়ের নাচ দেখে সকলেই তাকে বাহবা দেয়। ধ্রুপদী এবং রবীন্দ্রনৃত্যে নিয়মিত তালিম নেয় জুঁই। ভালো গানও গায়। মা মাধুরীই জুঁইয়ের গানের শিক্ষিকা। তবে জুঁইয়ের গান অপেক্ষা নাচের প্রতি ঝোঁক বেশী।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। নির্মল মধ্য শরতের আকাশে চাঁদের রূপমাধুরী চারদিকে ঝরে পড়ছে। ঘরে ফিরতে ফিরতে হিমাদ্রি বীতরাগ হবার চেষ্টা করে। ঘরে ফিরে হিমাদ্রি কি মেয়েটাকে বক্‌বে ? মারবে ? কি শাস্তি দেবে ! জুঁই যে তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে, সমগ্র সত্তা জুড়ে - তাকে আঁকড়ে ধরে আছে। এমন ফুটফুটে নিস্পাপ মেয়েটির গায়ে হাত তোলার কথা ভাবতেই পারে না হিমাদ্রি। হিমাদ্রি যে মেয়েকে বকতেই পারে না, মেয়ের গায়ে হাত তোলা... আর ভাবতে পারছে না হিমাদ্রি।

জুঁই তো কারো সঙ্গে কখনো ঝগড়া বিবাদ করে না। জুঁই সদা-চঞ্চল, হাসি-খুশী, সপ্রতিভ। স্কুলের সব শিক্ষক-শিক্ষিকাই জুঁইকে খুবই আদর করে ও ভালোবাসে। আসলে জুঁই দেখতে এমনই যে তাকে আদর না করে পারা যায় না। জুঁই যে একদিন রমেশ স্কুলের

গর্বের ধন হয়ে উঠবে। রূপে-গুণে জুঁইয়ের তুলনা মেলা সত্যিই ভার। অফিস থেকে ফিরে এসে জুঁইকে না দেখলে হিমাদ্রির কিছুতেই ভালো লাগে না। অফিস থেকে ঘরে ঢুকবার আগেই হিমাদ্রি মেয়েকে ডাক দেবে - আমার মা কোথায় রে ?

বাবার ডাক শুনেই জুঁই দৌড়ে এসে বাবার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মেয়েকে পেয়ে হিমাদ্রির বুকটা জুড়িয়ে যায়। জুঁই এখন বড় হয়েছে। একটু লজ্জাও হয়েছে। তবু বাবার কোলে না বসলে জুঁই যেন মনে শান্তি পায় না।

মাধুরী বাবার কোলে জুঁইকে দেখে বলে — এতবড় মেয়ে হয়েছে, তবু আদিখ্যেতা। কি রে জুঁই, তুই তো এখন বড় হয়েছিস্। বাবার কোলে বসতে হয়?

জুঁই বাবার কোল থেকে উঠে মায়ের দিকে তেরচা চোখে চেয়ে ফট ফট করে চলে যায়। আবার কখনো বা বলে — বাবা আদর করলে তোমার বড্ডো হিংসে হয়, তাই না। তুমি বড্ডো হিংসুটে মা।

জুঁইয়ের কথা শুনে হিমাদ্রি ও মাধুরী দু'জনেই হেসে ওঠে। কখনো কখনো অফিস থেকে ফিরে এসে বাবা ডাকলে — জুঁই পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। হিমাদ্রি ফাঁক দিয়ে জুঁইয়ের পায়ের নুপূর দেখতে পায়। তাবপর না দেখার ভান করে। মেয়েকে পর্দা সহ জড়িয়ে ধরে। বাবা-মেয়ের এমন কত যে খুনসুটি চলে সারাদিন তা বলার নয়। মাধুরী কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে বাপ-মেয়ের খেলায় যোগ দেয়। মেয়েকে নিয়ে হাসি-আনন্দে হিমাদ্রি ও মাধুরীর দিন চলে যায়।

সকলেই বলাবলি করে যে জজ সাহেব নাকি তেমন ভালো লোক নন। অফিসে তাঁর সম্পর্কে নানা কানাগুঁসো শোনা যায়। তাঁর বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স তদন্তও চলছে। পাঁচ লাখ টাকা ঘুষ খেয়ে নাকি এক খুনের আসামীকে বেকসুর খালাস করে দেন। হাই কোর্ট সব নথি তলব করেছে। তাঁর পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টেন্টের সঙ্গেও নাকি তাঁর একটা ইয়ে ইয়ে সম্পর্ক রয়েছে। কি একটা তদন্তের নাম করে যতন বাড়ি ডাক-বাংলোয় মেয়েটিকে নিয়ে দু'দিন কাটিয়ে এসেছেন। বর্তমানে মেয়েটির স্বামীর সঙ্গে মেয়েটির কোন সম্পর্ক নেই। মেয়েটির নাম সুভদ্রা। স্বামী একজন কন্ট্রাকটার। সে আর একটি মেয়েকে বিয়ে করে অন্যত্র থাকে। আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা চলছে। কোন সন্তান সন্ততি নেই।

ধনী সাগরের পারে পিচ ঢালা রাস্তায় হিমাদ্রি একবার এদিকে আর একবার ওদিকে — এমনি ভাবে একা একা হাঁটাহাঁটি করে বেড়াচ্ছে। এমন সময় কোথায় কোন গাছের ডালে বসে একটা লক্ষ্মী পেঁচা ডেকে উঠল। কয়েকটা বাদুড় হঠাৎ পাখা ঝাপ্টে উড়ে গেল। অসময়ে কোথাও হয়তো কোন পেয়ারা বা কলা পেকেছে। তারই গন্ধে বাদুড়

উড়ে যায়। নীল চাঁদের মায়াময় আলোয় সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত, আলোকিত। ধনী সাগরের জলে বেশ কটা পদ্মফুল ফুটেছে। শীতের অতিথিদের এখনো দেখা নেই। গত বছরের কয়েকটা বালিহাঁস মাঝে মাঝে ইতঃস্তত জলে ভেসে বেড়ায়। প্রতি বছরই এই জলাশয়ে অজস্র বালিহাঁস আসে, এদের সঙ্গে বক, সারস, পানকৌড়িও থাকে। গত ক' বছর ধরে এখানে উড়ে আসছে ধবধবে সাদা পদ্মফুলের মতো কয়েক জোড়া শুভ্র হংস মরাল। এরা যখন পালতোলা নৌকার মতো জলে ভেসে বেড়ায়, কি যে ভালো লাগে দেখতে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পক্ষীতত্ত্ববিদদের মতে এই হংস মরালরা সাধারণতঃ শীতের মরশুমে উত্তর সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চল থেকে এখানে আসে। শীতের শেষে আবার তারা তাদের স্বভূমিতে ফিরে যায়।

প্রথম প্রথম পাড়ার আশে-পাশের কিছু লোকজন নির্বিচারে বালিহাঁস মেরে খেত। নির্বিচারে পরিযারী পাখি হত্যা রোধ করার জন্য তিয়াষের বাবা তপোধীর, হিমাদ্রি এবং আরো কয়েকজন প্রতিবাদী মিলে অতিথি পাখি হত্যার বিরুদ্ধে সরব হয়। পরে জেলা শাসক, জেলা পুলিশ আধিকারিক ও বন বিভাগের কর্তাদের হস্তক্ষেপে পাখি হত্যা বন্ধ হয়। তাদেরই প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগে ধনী সাগরের পারে পাখির আলয় গড়ার উদ্দেশ্যে রোপন করা হয় বকুল, নাগকেশর, মহানিম, সোন্ধাল, তমাল, পিয়াল, চাঁপা-সুন্ধি, জাম, জারুল ও সোনাঝুরি গাছ। ধনী সাগরের অর্দ্ধেক জলাশয় জুড়ে শ্বেত কমল, শাপলা-শালুক সহ নানা জলজ উদ্ভিদের বাসভূমি আর চারপাশে নানা ঋতুর ফুল ও বাহারী গাছের সারি। বিকেলে বাঁধানো পাড়ে বসলে শীতল হাওয়ায় সমগ্র হৃদয় মন জুড়িয়ে যায়।

ছুটির দিনে তপোধীর, হিমাদ্রি, নন্দিতা, মাধুবী, সস্ত্রীক অরিন্দম বাবু, জীবেশ বাবু - সবাই মিলে দারুণ আড্ডা জমে। জুঁই, তিয়াষ, দিয়া, রিয়া, মৌ এবং পাড়ার ছেলে-মেয়েরা রাস্তায় ছুটে বেড়ায়। তাদের মতো করে তারা খেলে। বড়ো ভালো লাগে দেখতে। শিশুদের খেলা আর বড়দের আড্ডা- সব মিলিয়ে এক নিটোল-নিখাদ আনন্দ উল্লাস। কখনো বা বসে গানের আসর। চলতে চলতেই হিমাদ্রির নানা কথা মনে পড়ে। গাছে শিউলি ফুল ফুটেছে। বাতাসে শিউলির সৌরভ ভেসে বেড়ায়। কিন্তু কিছুতেই হিমাদ্রির মন শান্ত হতে চায় না। জজ সাহেবের কথা মনে পড়তেই হিমাদ্রির মাথাটা বেশ গরম হয়ে ওঠে। ঘরে আসতে ইচ্ছে করে না হিমাদ্রির। রাস্তার মধ্যে কেবল এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। হিমাদ্রির ফিরতে দেরী দেখে মাধুরী রাস্তার দিকে এগিয়ে আসে। এতক্ষণ বারান্দায় বসে মাধুরী ও নন্দিতা গল্প করছিল। রাত হয়েছে দেখে দু'জনেই উঠে পড়ে। তিয়াষ পড়াশুনো করছে। জুঁই স্কুল থেকে আসার পরই চুপ চাপ। তার কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে

না। তপোধীর ঘরে টি.ভি. দেখছে। হিমাদ্রি ও তপোধীরদের কোয়ার্টার মুখোমুখি।

কোয়ার্টার থেকে দু'টো চার ধাপওয়াল ছোট সিঁড়ি দুইদিক থেকে নেমে পিচঢালা রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। কোয়ার্টার গুলো রাস্তা থেকে ফুট চার-পাঁচ উপরে। টিলা কেটে সমান করেই তার উপর কোয়ার্টারগুলো নির্মিত হয়েছে। পুরোনো মডেলের টাইপ - থ্রি টুইন কোয়ার্টার। প্রতিটি কোয়ার্টারের টাইপ একই রকম। সামনে তিনটি রুম। পেছনে কিচেন, ডাইনিং স্পেস ও ল্যাট্রিন-বাথরুম। রুম থেকে বেরুলে এক চিলতে বারান্দা ও একটি ছোট ওঠা নামার সিঁড়ি। হিমাদ্রিদের ঘরের সামনে একটা নোনতা ফলের গাছ, আর একদিকে হলুদ লতা করবীর ঝাড়। তপোধীরদের কোয়ার্টারের সামনে একটি শেফালী ফুলের গাছ, অন্যদিকে একটি কুন্দ ফলের ঝাড়, মাঝে একটি হাস্নুহানার লতা। কয়েক মাস আগে নন্দিতা লাগিয়েছে।

বাইরের সিঁড়ির সামনে দাঁড়ালে চোখে পড়ে জলভরা পদ্মদীঘি, আর সারি সারি বাহাবী গাছ। দেখলে মনে হয় আদ্যিকালের সান্ত্রীরা অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চাঁদের স্নিগ্ধ জোছনার সঙ্গে কুয়াশার একটা নীল চাদর ধনী সাগরের জলের উপব বিছানো। শীতের আমেজ পুরোপুরি লাগেনি। তবে ভাদ্রের তীব্র উত্তাপ অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। মাধুরী লক্ষ্য করে দেখে হিমাদ্রি একটু দূবে বাস্তার মাঝে অনবরত পায়চাবি করে বেড়াচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে সে ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। একবার এদিক একবার ওদিক। মাধুরী জানে হিমাদ্রির রাগ হলে সে বার বার একই জায়গায় এমন করে পায়চারি করে তাব রাগের বহিঃপ্রকাশ কবে থাকে। মাধুরী বুঝতে পারে জজ সাহেবের বাড়িতে নিশ্চয়ই কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। না হলে এতক্ষণে হিমাদ্রি ঘরে ফিবে আসত। তাছাড়া এত বাতে রাস্তায় একা একা এভাবে হেঁটে বেড়াত না।

মাধুবী একটু চিন্তিত হয়ে কোয়ার্টারের দিকে ফিরে এসে নন্দিতাদের ঘরে ঢুকেই ডাক দেয় — নন্দিতা, এই নন্দিতা - । শোন্ - শোন্ তপোধীর দা কোথায় রে , ডাক তো ।

মাধুরীর কণ্ঠে একরাশ উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ে। তপোধীর ও হিমাদ্রি একই কলেজের ছাত্র। পুরোনো বন্ধু। তপোধীর হিমাদ্রির দুই ক্লাস সিনিয়র। প্রথম পরিচয়েই হিমাদ্রি তপোধীরের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে। তপোধীর তৃতীয় বর্ষেব ছাত্র। দর্শন শাস্ত্রে অনার্স। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। কবি, গল্পকার, সুবক্তা, হাসি-খুশী। কলেজের অধ্যাপকদের প্রিয়। প্রথম থেকেই হিমাদ্রি তপোধীরকে, তপোধীরদা বলেই ডাকে। হিমাদ্রি বেশ ক' বছর ধরেই এই কোয়ার্টারে আছে। তপোধীর উদয়পুর বদলী হবার খবর পেয়েই হিমাদ্রি অনেকটা

জোর করেই তাদেরকে এই কোয়ার্টারে নিয়ে আসে। তখন এই কোয়ার্টারটা খালি পড়েছিল। ওদিকে আবার নন্দিতা ও মাধুরীও পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু । তারা দু'জনেই বিলোনীয়ার মেয়ে। নন্দিতাদের বাড়ি ইন্দ্রপুরী সিনেমা হলের সন্নিকটে। মাধুরীদের বাড়ি আর্য কলোনী। মাধুরীর দাদা-বৌদি নন্দিতাকে খুব ভালোবাসে।

মাধুরীর ডাক শুনেই নন্দিতা ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসে। তারপর বলে — কি রে মাধুরী, কি হয়েছে, এমন করছিস্ কেন ?

নন্দিতা এবার তপোধীরের উদ্দেশ্যে বলে — ওগো শুনছ, টি.ভি টা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি একটু এদিকে এসো তো।

নন্দিতার ডাক শুনে টি.ভি. বন্ধ করে তপোধীর বেরিয়ে আসে। মাধুরী বলে — তপোধীরদা একটু এদিকে আসুন তো। দেখুন তো জুঁইয়ের বাবা ঘরে না এসে রাস্তার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু একটা ঘটেছে। অফিসে কিছু হলো কি ? জজ সাহেবের চাপরাশি এসে ডেকে নিয়েছিল। একটা কিছু অবশ্যই হয়েছে। একটু যান তো তপোধীর দা।

এক সঙ্গে সকলেই ঘর থেকে বেবিয়ে আসে। কৌতূহলী তিয়াষও বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। কিন্তু জুঁইয়ের দেখা নেই। স্কুল থেকে ফিরে সে যে জুঁই ঘরে ঢুকেছে, একবারের জন্যও ঘরের বাহির হয়নি।

তিয়াষ একবার জুঁইকে ডেকেছিল— এ জুঁই, কি করছিস্ ? বের হবি না? তিয়াষের ডাকে কোন সাড়া দেয়নি জুঁই। নীতার সঙ্গে ঝগড়া করার কথাও কাউকে কিছু বলেনি। বাইরের ঝগড়া-বিবাদের কথা বাবা-মাকে বলতে বড়ো সংকোচ বোধ করে জুঁই। বাবাকে জজ সাহেব চাপরাশি পাঠিয়ে ডাকার পরও জুঁই এই প্রসঙ্গে কোন কথা বলেনি। সারাক্ষণ চুপচাপই ছিল। নীতা আজ জুঁইকে নানা বাঁকা বাঁকা কথা শুনিয়েছে। শুধু তাই নয়, তার বাবা সম্পর্কেও নানা কটূক্তি করেছে। জুঁইও অবিশ্যি আজ ঝগড়াটে মেয়েদের মতো নীতার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। নীতার প্রতিটি কথার পিঠেই উত্তর দিয়েছে। অন্যান্য দিন তো কোন কথা বললে জুঁই উত্তর না দিয়ে চলে আসত। মেয়েটির বড্ডো বাড়। জজ সাহেবের মেয়ে বলে আর কাউকে চোখেই লাগে না। তাই আজ জুঁইও নীতাকে বেশ ক'কথা মুখের উপর শুনিয়ে দিয়েছে। রাগের মাথায় নীতাকে কথাগুলি না বললেও পারতো। বাবা-মা বা তাঁদের বয়েসীরাও সকলেই গুরুজন। বাবা-মায়েদের উদ্দেশ্যে অশোভন মন্তব্য করা অনুচিত। গুরুজনদের তো শ্রদ্ধাই করে জুঁই। নীতা যা করেছে, জুঁই তো একই অপরাধেই অপরাধী। নীতা যে এক নম্বরের ঝগড়ুটে মেয়ে তা সবাই জানে। এখন থেকে তো জুঁইকেও সবাই ঝগড়ুটে বলবে। বাবা-মা তো রোজ স্কুলে যাবার সময় [illegible] বারণ করে দেয় —

দু'টি পালক

জুঁই স্কুলে গিয়ে কারো সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করবে না কিন্তু। লোকে খারাপ বলবে। কেউ কিছু বললে মাষ্টার মশাইদের বলে দিস্।

জুঁই তো তার বাবা-মার বারণও শুনলো না। জুঁই একেবারেই কোন ভালো কাজ করেনি। ভালো-ছেলে মেয়েদের এমন বদ আচরণ অভিপ্রেত নয়। জুঁই কি তবে ক্রমশঃ পাল্টে যাচ্ছে ? ভালো হবার গুণগুলো কি ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে জুঁই ? ক্ষোভ-দুঃখ-অপমান-অভিমান এবং লজ্জায় তিয়াষের ডাকেও তাই কোন সাড়া দেয়নি জুঁই।

তিয়াষদা মনে মনে খুব কষ্ঠ পাচ্ছে। অন্যের কথায় ব্যথা পেয়ে জুঁইয়ের উচিৎ হয়নি তিয়াষদাকে কষ্ট দেওয়া। তিয়াষদা প্রতিদিনের মতো নিশ্চয়ই জুঁইয়ের জন্য প্রতীক্ষা করেছিল। কিসের এই প্রতীক্ষা? প্রতীক্ষার কি কোন ভাষা হয়? - কোন ভাষা আছে ? প্রতীক্ষার মাঝে কোথায় যেন এক অদৃশ্য অমোঘ টান রয়েছে। হৃদয়ের টান না থাকলে যে প্রতীক্ষা অর্থহীন। প্রতীক্ষা মানেই তো হৃদয়ের আকুলি-বিকুলি।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে তপোধীর এগিয়ে যায় হিমাদ্রির দিকে। হিমাদ্রি কেবল এদিক-ওদিক করছে।

তপোধীর ধীরে ধীরে হিমাদ্রির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর ডাক দেয় - এই হিমাদ্রি, তুমি কি করছ এখানে। সারারাত কি একবার এদিক - আরেকবার ওদিক করে হেঁটে হেঁটে কাটিয়ে দেবে নাকি ?

ততক্ষণে সিঁড়ির শেষ ধাপ পেরিয়ে নন্দিতা ও মাধুরীও রাস্তায় নেমে এসেছে। রাস্তা শুনশান। কোন এক বাড়ি থেকে নেড়ি কুত্তার ডাক শোনা যাচ্ছে। তিয়াষও ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সব দেখছে। তিয়াষও বুঝতে পারে কিছু একটা ঘটেছে এবং তা জুঁইকে নিয়েই।

তপোধীরের ডাকে হিমাদ্রির সম্বিৎ ফিরে আসে। সে যে অনেকক্ষণ এখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা তার খেয়ালই নেই। হিমাদ্রি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে জোছনার আলোয় একবার তপোধীরের দিকে চায়। তারপর কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করেই দ্রুত পাশ কাটিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। পেছন পেছন মাধুরী, নন্দিতা ও তপোধীর ও এগিয়ে যায়। সকলেই কি ঘটেছে তা জানতে চায়। কিন্তু হিমাদ্রি কারও কোন কথার উত্তর না দিয়ে সোজা ঘরে ঢুকে। তারপর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ডাক দেয় - জুঁই এদিকে আয়।

বাবার ডাক শুনে জুঁই হিমাদ্রির কাছে আসতেই — হিমাদ্রি সজোরে জুঁইয়ের গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। থাপ্পড় খেয়ে টাল সামাল দিতে না পেরে জুঁই মেজের উপর গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। ক্ষিপ্রহাতে জুঁইকে তপোধীর ধরে ফেলে, তারপর টেনে বুকে

জড়িয়ে ধরে হিমাদ্রির সামনে আড়াল করে দাঁড়ায়। নন্দিতা তাড়াতাড়ি এসে তপোধীরের কাছ থেকে জুঁইকে নিয়ে তাদের ঘরে চলে যায়। হিমাদ্রির অতর্কিত ব্যবহারে সকলেই বেশ হকচকিয়ে যায়।

তপোধীর তখন হিমাদ্রিকে বলে — হিমাদ্রি, এ তুমি ঠিক করছো না। কি হয়েছে সব বলবে তো।

মেয়েকে মারার পর মন কিছুটা শান্ত হয় হিমাদ্রির। কিছুটা লজ্জাও পায়। জজ সাহেবের কথায় এতক্ষণ সারা শরীর জ্বলছিল। এবার জ্বালা কমে আসে। মনে অনুতাপও দেখা দেয়। হিমাদ্রি পূর্বাপর সব ঘটনার বিবরণ দেয়।

সবশুনে তপোধীর বলে — হিমাদ্রি, তোমার জুঁইকে মারা ঠিক হয়নি এবং আমি সমর্থনও করতে পারছিনা। তুমি ভালো করতে যদি সব ঘটনা সবিস্তারে জুঁইয়ের কাছ থেকে জেনে নিতে । কোন ঘটনাই এক তরফা হতে পারে না। তোমাদের তো জানাই আছে, শিকদার সাহেব কেমন মানুষ। না, হিমাদ্রি, তুমি কাজটা ঠিক করনি। তোমার এ হেন কাজে আমার কিন্তু অনুমোদন নেই। দোষ তো নীতাও করতে পারে।

হিমাদ্রির এখন অনুতাপ হতে থাকে। মেয়েকে মেরে হিমাদ্রি এখন মনে মনে বেশ কষ্ট পাচ্ছে। পুরুষ মানুষের কষ্ট সবচেয়ে বেশী। পুরুষ মানুষ সহজে তার মনের ব্যথা প্রকাশ করতে পারে না। তারা তাদের অন্তরেব দুঃখ-বেদনা-কষ্ট-যন্ত্রণা চাপা দিতে গিয়ে সবচেয়ে বেশী কষ্ট পায়। মেয়েকে মারার জন্য মাধুরীও স্বামীর উপর খুব রাগ করে রয়েছে।

জীবনে প্রথম বাবার মার খেয়ে জুঁই ফুঁ পিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তিয়াষদাও দেখতে পেয়েছে জুঁইয়ের বাবা জুঁইকে মেরেছে। সকলেব সামনে মারার জন্য জুঁইয়ের বড়ো অপমান লেগেছে। নীতার জন্য আজ জুঁইকে মার খেতে হলো। জুঁই আর কোনদিন নীতার সঙ্গে কথা বলবে না। নীতা জুঁইকে ও তার বাবাকে অভদ্র ভাষায় গালাগাল দিয়েছে। পাড়া গাঁয়ের চাষা ভূষোর ছেলে-মেয়েরাও আজ আর এমন কদর্য ভাষায় কাউকে গালাগাল করতে পারে না। জুঁই মা ও মাসীকে কাঁদতে কাঁদতে সব কথাই বলেছে।

হিমাদ্রি না খেয়ে শুয়ে পড়েছে । মাধুরী-হিমাদ্রিকে খাবার জন্য ডেকেছে, হিমাদ্রি কোন সাড়া দেয়নি। জুঁই কিছুতেই খাবে না। মাধুরীও না খেয়ে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ে । ঘরের আলো নিভিয়ে দেয়। জুঁই মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে থাকে। মাধুরী মেয়ের মাথায় আলতো ভাবে হাত বুলিয়ে দেয়। মায়ের আদর পেয়ে জুঁইয়ের কান্না আরো বেড়ে যায়।

দু'টি পালক

তপোধীর ও নন্দিতাও খাওয়া-দাওয়া করেনি। এতক্ষণ চুপ-চাপই বসেছিল। হিমাদ্রিদের ঘরের আলো হঠাৎ নিভে যাওয়ায়, এবং সবকিছু অদ্ভুতভাবে নীরব হয়ে যাওয়ায় তাদের সন্দেহ হয় যে, হিমাদ্রি ও মাধুরী না খেয়ে শুয়ে পড়েছে।

নন্দিতা এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকে - মাধুরী ও মাধুরী, দরজাটা খোল তো। দেখছিস্ রাত্রিবেলা আমাদের ফিল্টারে একটুও খাবার জল নেই। কাজের মাসী ফিল্টারে আজ জল দিতেই ভুলে গেছে। নন্দিতার ডাক শুনে মাধুরী ঘরের আলো জ্বেলে দরজা খুলে দেয়। নন্দিতা ঘরে ঢুকে পড়ে। পেছন পেছন তপোধীর।

কই, তোর মগ দে - মাধুরী বলে।

তপোধীর বলে — মাধুরী, হিমাদ্রি কোথায় ? হিমাদ্রি দুটো অপরাধ একদিনে করো না। তুমি না খেয়ে শুয়ে থাকলে মাধুরীরও খাওয়া হবে না। সকলের এক সঙ্গে উপোস করে শুয়ে থাকার কোন মানে নেই। একসময় তপোধীর খুব রাগ করে। তারপর হিমাদ্রি উঠে খেতে বসে। খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমাতে সেদিন সকলেরই বেশ রাত হয়ে যায়।

অনেক বলে কয়েও সে রাতে জুঁইকে কিছুই খাওয়ানো যায়নি। তপোধীর আর নন্দিতাও অনেক চেষ্টা করেছে। তবু জুঁই খায় নি। মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ায় হিমাদ্রি কোন মতে এক গ্রাস ভাত মুখে তুলতে পেরেছে। তার মনে হচ্ছিল - সমস্ত বুকটা মেয়ের জন্য ব্যথায় দুমড়ে মুচড়ে, ভেঙ্গে চুরে একাকার হয়ে যাচ্ছে । মেয়ে খায়নি দেখে মাধুরীও না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। মাঝরাতে ঘুমন্ত মেয়েকে নিজের বুকে টেনে নেয় হিমাদ্রি। ঘুমের মধ্যে মেয়েকে আদর করতে করতে হিমাদ্রি একসময় সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেলে।

আরও একজন সকলের অলক্ষ্যে সেদিন কেঁদেছে। তার কান্নার খবর কিন্তু কেউ সেদিন রাখেনি। সে তিয়াষ। খেতে বসেও তিয়াষ সেদিন খেতে পারেনি। কয়েক গ্রাস ভাত কোন রকমে মুখে পুরে জল গিলে সে উঠে পড়ে। নন্দিতা বা তপোধীর কেউই এ বিষয়ে তিয়াষকে কিছু বলেনি। তিয়াষের মনে, আজকের ঘটনা গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে এবং তিয়াষ সত্যি সত্যিই কষ্ট পাচ্ছে তা তারা বুঝতে পারে। তাদের সময় থেকে আজ কালকার ছেলে-মেয়েরা যে অনেক বেশী সংবেদনশীল। তপোধীররা ভাই বোন মিলে নয়জন। নন্দিতারাও আটজন। অসংখ্য ভাই-বোনের মাঝে তারা মানুষ। সংসারে অভাবের নিকষ কালো অন্ধকার। বাবার তেমন কোন রোজগার নেই। কখনো খাবার জুটে তো কখনো জুটে না। কেউ ভাত খেল কি খেল না, এনিয়ে কারো কোন মাথা ব্যথা নেই। বিশেষতঃ বাবা তাঁর ছেলে-মেয়েদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোন খোঁজ খবরই নিতো না। মায়ের

কিন্তু সকলের প্রতি ছিল সজাগ দৃষ্টি। কে খেলো, কে খেলো না - মায়ের সব দিকে খেয়াল থাকতো। কেউ রাগ বা অভিমান করলেও মা ডেকে এনে আলাদা ভাবে বুঝিয়ে শুনিয়ে খাওয়াতো। প্রতিবেলায় দশ-বারো জনের জন্য প্রয়োজনীয় তরি-তরকারীও জুটতো না। সকাল বেলা সকলেরই এক প্রস্থ পান্তা ভাত। এটাই রোজকার বন্দোবস্ত। পান্তা ভাত খেয়েই সব ভাই বোন স্কুলে চলে যেত। সবাই স্কুলে চলে গেলে মা এবার দুপুরের রান্নার যোগাড় - যন্তর শুরু করতেন। বাড়িতে কাজের লোক ছিল না, কাজের লোক রাখার সামর্থ্যও ছিল না। সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত মা - মা-দুর্গার মতো দশহাতে সংসার চালাতেন। বাবা ছিলেন খুবই রাগী। নুন থেকে চুন খসলেই বাড়িতে হৈ চৈ বাধিয়ে দিতেন। তপোধীর ও তার ভাই বোনেরা তাই বাবাকে এড়িয়েই চলতো।

অথচ তিয়াষ তপোধীরের একমাত্র ছেলে। কোন ভাই-বোন না থাকায় এক নিঃসঙ্গতা সব সময় তার চারদিকে খেলা করে। বাবা-মা দু'জনেই চাকুরীজীবী। সকাল বেলা দু'জনেরই কর্মস্থলে যাবার ব্যস্ততা - দিনের শেষে প্রগাঢ় শ্রান্তি বা ক্লান্তি বহন করে ঘরে ফিরে আসা। তিয়াষ বাবা মাকে সে ভাবে নিবিড় করে পায় না। সব মিলিয়ে তিয়াষের মধ্যে এক নিঃশব্দ শূন্যতা বিরাজ করছে। তিয়াষের কাকা - পিশি - মামা - মামী - দাদু - দিদা- ঠাকুমা-ঠাকুর্দা আছে। কিন্তু তিয়াষ তো একা নিঃসঙ্গ।

ছোট বেলায় একটু বুঝ হবার পর তিয়াষ মাকে জিজ্ঞেস করেছিল - মা, বড় মামা তোমার কি হয় ?

নন্দিতা উত্তর দিয়েছিল — ভাই।

তাহলে ছোটমামা, ধন মামা এরাও তোমার ভাই ?

— হ্যাঁ, এরা সবাই আমার ভাই।

আর বড় মাসী, ধন মাসী, ছোট মাসী - এরা তোমার কে ?

— এরা আমার বোন।

তিয়াষ তারপরে বলেছিল — তোমরা এতগুলো ভাই বোন ? আমার কোন ভাই বোন নেই কেন মা ? আমার যে একা একা একেবারেই ভালো লাগে না। তা হলে বাবাদেরও তো অনেক ভাই বোন। কেবল আমারই নেই।

নন্দিতা সেদিন ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে দিয়েছিল। তারপর তপোধীরকেও সে কথা জানিয়েছিল নন্দিতা।

আজকের পৃথিবীতে মানুষ বড়ো একা। নিঃসঙ্গ। একসময় আমাদের সমাজে

দু'টি পালক

দাদা, দিদি, জেঠা-কাকা, মাসী-পিসি, মামা-মামী কতো নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। আত্মীয়তার এই সম্পর্ক বা বন্ধনই সমগ্র সমাজকে চুম্বকের মতো বেষ্টন করে রেখেছিল। শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা, আতিথেয়তা, আপ্যায়ণ - কি ছিল না এই সমাজে। কিন্তু আজ সময়রে হাত ধরে বদলে যাচ্ছে আমাদের চির চেনা সেই প্রেম-প্রীতি-শ্রদ্ধা-সোহাগ ভালোবাসার শাশ্বত সমাজ। আর আমাদের চোখের সামনেই গড়ে উঠছে সম্পর্কহীন এক যান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। হৃদয় যেমন শুকিয়ে যাচ্ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে নদীও। দিনের পর দিন কলুষিত হচ্ছে মানুষের হৃদয়-মন, দুষিত হচ্ছে সমাজ-সংসার প্রকৃতি।

এমনি একদিন আসবে, যেদিন দাদা-দিদি, কাকা-পিশি, মামা-মাসী এমনি আত্মীয় বাচক শব্দগুলো ক্রমশঃ হারিয়ে যাবে। সংরক্ষণের অভাবে এই বিশাল পৃথিবী থেকে বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে কোন কোন প্রাণী সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে গেছে। যার ফলে প্রকৃতি জগতে এক প্রবল ভারসাম্যের অভাব দেখা দিয়েছে। বাস্তুতন্ত্রে সৃষ্টি করেছে গভীর সংকট। তেমনি মানব সমাজের এই সম্পর্কহীনতাও সমাজ জীবনে এক ভয়ংকর শূন্যতার সৃষ্টি করছে, যা পরিণামে সৃষ্টি করতে চলেছে ভয়ংকর বিপদ। এর অসংখ্য কূল লক্ষণ নানাভাবেই কিন্তু প্রকটিত। এ এক ঘোর অশনিসংকেত।

প্রবহমান সমাজ সম্পর্কের মধ্যেই মানব জীবনের গভীরতার মূল্যবোধ সুপ্ত। আত্মীয়ের প্রতি আত্মার টান, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান বোধ বিকাশের ধারা বেয়ে অনাদিকাল থেকে নানা রূপে নানা ভাবে এখনো সমান ক্রিয়াশীল। মানবতা কিংবা মানব সভ্যতার অবিরাম জয়গান বা ভেরী বাজিয়েও কিন্তু সম্পর্ক শূন্যতার এই অদৃশ্য ফাঁক পূরণ করা সম্ভব নয়। হ্রাসমান কিংবা ক্ষীয়মান সামাজিক মূল্যবোধ কিন্তু আমরা আর কোন ভাবেই পুনরুদ্ধার করতে পারবো না। প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ভান্ডার যেমন ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে, নদী জলধারা শুকিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে বনভুমি, তেমনি হারিয়ে যাচ্ছে চিরন্তন সামাজিক ও মানবিক সম্পর্ক।

আপনজন, আত্মীয় ও আত্মীয়তার পরিধির মধ্যে যে অচ্ছেদ্য বন্ধন, স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার যে নিবিড় নৈকট্য, প্রিয়জন বিয়োগ বা বিরহে যে ব্যথা-বেদনা হৃদয়কে ব্যাকুলিত এবং নয়নকে অশ্রুসিক্ত করে, সেখানে হৃদয়হীনতা, নিষ্ঠুরতা, অমানবিক আচার-আচরণ বিরলতম ঘটনা। পারিবারিক স্নেহ-মমতা ভালোবাসার অমোঘ পরিধির মধ্যে মধুর সম্পর্কের সর্বজন গ্রাহ্যরূপের কোন বিকল্প কিন্তু আজো এই সমাজ মানসে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে পরিদৃশ্যমান নয়।

প্রতীকী এক সন্তান ব্যবস্থা বৃহত্তর মানব সমাজের কোন কল্যাণ বা মঙ্গল সাধন করতে সক্ষম নয়। মনন, হৃদয়বৃত্তিকে যদি শৃঙ্খলিত করা হয়, সেই সমাজের অর্গল কোনদিন

মুক্ত করা সম্ভব নয়। আর তারই পরিণামে আজ আমাদের প্রতিবেশী-প্রতিবেশীতে, পাড়ায়-পাড়ায়, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, বিশ্বের প্রায় সর্বত্র এত হিংসা, হানাহানি, নিষ্ঠুরতা, ক্রুরতা, অনাচার-অত্যাচার-নানা অনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত। পরিবার ভাঙ্ছে, সমাজ ভাঙ্ছে - সর্বত্র শুধু ভাঙ্গনের ছবি। পূর্ণ নয়, সারা বিশ্বজুড়ে শুধু অপূর্ণতার সাধনা। খন্ডিত, অংশ, ভগ্নাংশের খেলা চলছে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। গোধূলির অস্তরাগের মহিমা ও মাধুর্য আজ তমসালিপ্ত। কবির কথাই ঠিক, 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন।'

তপোধীরের মন বড় সংবেদনশীল। প্রচন্ড দারিদ্র্যের সঙ্গে শৈশব থেকেই লড়াই করে তাকে মানুষ হতে হয়েছে। জন্ম স্বাধীন ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমার এককালের বর্ধিষ্ণু জনপদ ছোটখিলে। এই দেশ সমঝোতার ভিত্তিতে তখনো ত্রিখন্ডিত হয়নি। তারও.বহু আগে তপোধীরের বাবা এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাবা বিয়ে করেন। ছোটখিলের রাণীগঞ্জ বাজার - এক সময়ের সমৃদ্ধ জনপদও বটে। বড়ো বানিজ্য কেন্দ্রও । এই অঞ্চলের একটা ছোট ইতিহাসও আছে। জ্ঞান হবার পর থেকে তপোধীর জেনে এসেছে যে ছোটখিল মৌজাটি কর্তার তালুক। এই কর্তাবাবুর নাম লালু কর্তা। আসলে কর্তা মশাই যে কে ছিলেন তা প্রায় কেউই জানতো না। তপোধীরও অনেকদিনই ব্যাপারটা জানতে পারেনি। মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে পড়ার সময় তপোধীর জেনেছে যে ইনি রবীন্দ্র সান্নিধ্য ধন্য ত্রিপুরার অন্যতম সংস্কৃতি প্রেমী ব্যক্তিত্ব প্রয়াত ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মা ।ইনি মহামান্য রাজাধিরাজ মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদূরের অনুজ।ইনি ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের আজীবন সভ্য সভাপতি পদে বৃত ছিলেন।

এই মৌজাটি চারটি ছোট গ্রাম নিয়ে গঠিত। এই গ্রামগুলি হলো. বিজয়নগর, ব্রজেন্দ্রনগর, রমেন্দ্রনগর ও কল্যাণনগর। ত্রিপুরার রাজবাড়ির বিভিন্ন রাজপুরুষদের নামেই - এই গ্রামগুলির নামাকরণ করা হয়। বিজয়নগর গ্রামে রয়েছে কর্তাদের এক বিশাল চা বাগান। সেই বাগান 'লীলগড় টী এস্টেট' নামে পরিচিত। শোনা যায় কর্তা মশাই নাকি তাঁর যৌবনকালে দুইবার তালুক দেখতে এসেছিলেন। একবার এসেছিলেন আখাউড়া থেকে ট্রেনে চেপে লাকসাম পর্যন্ত। তারপর হাতীর পিঠে সওয়ার হয়ে রামগড় দিয়ে উঠেছিলেন তাঁদেরই পাকা কাছারী বাড়িতে। আর একবার একইভাবে ফেনী হয়ে নৌকাযোগে ফেনী নদীর জল পথে। কর্তাবাবু আসার খবরে চারদিকে প্রবল সোর গোল পড়ে যেত। গরীব দুঃখীরা কাছারী বাড়ি এসে ভীড় করতো। কর্তা মশাই তাদেরকে নতুন কাপড়-জামা দান করতেন। সেই সময় লীলাগড় চা-বাগানের পশ্চিম প্রান্তে দুইটি পাকা ইমারত বাড়ি তৈরী করা হয়। কর্তাবাবু কিংবা রাজবাড়ির লোকজনেরা এলে সেই বাড়িতে

থাকতেন। কর্তাবাবুদের সেই বাগান বাড়ি কাছারীবাড়ি নামেই খ্যাত ছিল। চা বাগানের পাশাপাশি কাছারীবাড়িব সামনে নানা ফলের গাছ লাগিয়েছিলেন। নানা জাতের আম, লিচু, সবেদা, পেয়ারা, মিষ্টি কামরাঙ্গা গাছের পাশাপাশি, দারুচিনি, তেজপাতা গাছও ছিল। সেই সময় এই ছোটখিল মৌজা কর্তাবাবুদের তালুক ছিল বলে ভূমি বন্দোবস্ত, খাজনা আদায় সবই কর্তাবাবুর নিযুক্ত রাজকর্মচারীরা করতেন। বর্তমানে কর্তাবাবুরা তাঁদের সম্পত্তি সব বিক্রি করে দিয়েছেন। কত কাল আগের সেই সব কথা।

মহাকালের হাত ধরে সময় সেতু পেরিয়ে সভ্যতার বিজয়রথ অন্ধকারের দুয়ার ভেদ করে উদয়ের পথে কালান্তরের পানে পাড়ি জমাচ্ছে। কেইবা মনে রাখে সাব্রুমের এই অখ্যাত গ্রামগুলির কথা। যেখানে একসময় সারি সারি ছোট ছোট শান্তির নীড় পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছিল। তপোধীর ছোট বেলায় দেখেছে গ্রামের চেনা-জানা শান্ত সহজ সবল মানুষ জনদের। ধর্মে বর্ণে-জাতে-গোত্রে পৃথক হয়েও এই দেশের চিরাচরিত সাধারণ সমাজ ব্যবস্থাব মতোই এখানে একটা মানবিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। প্রকৃতি যেমন ছিল নীরব শান্ত, মানুষেব মধ্যেও সেই অমলিন শান্তি লক্ষ্য করা যেতো। বাবা-মায়ের কাছে তপোধীর শুনেছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানী সেনাদের মোকাবেলা করার জন্য এখানে গোবা সৈন্যদেব ছাউনি পড়েছিল। জাপানী বোমার ভয়ে তারা এখানে বড় বড় বাঙ্কাব গড়ে তুলেছিল। সেই বাঙ্কাবেব কয়েকটি এখনো আছে।

এখানে চোর ডাকাতেব মাঝে মঝে উপদ্রব হতো। ততদিনে ভাবত-পাকিস্থান ভাগাভাগি হয়ে গেছে। হঠাৎই ছোটখিলে সিঁদেল চোরের উৎপাত শুরু হয়। টাকা-পয়সা ব্যাঙ্ক পোষ্টাফিসে রাখাব তেমন চল ছিল না। মানুষ বাড়ি ঘবেই কাঠের সিন্দুকে, মাটির নীচে গর্ত কবে অথবা মাচার নীচে নানা কৌশলে টাকা রাখতো। চোর সিঁদকেটে ঘরের ভেতর মাটির গর্তে রাখা টাকা যেখানে রয়েছে — ঠিক সে জায়গায় গিয়ে টাকা ভর্তি হাঁড়ি-কলসী নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। বের হয়ে গর্তটা বুজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বাড়িব মালিক টেরও পাচ্ছে না। কয়েক মাস পরে এমনি দু'তিনটি ঘটনা প্রকাশ হওয়ায়, খোঁজ নিয়ে দেখা গেল ততদিনে পনর-বিশ পরিবারের টাকা উধাও হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম বাড়ির লোককে সন্দেহ করলেও পরে সিঁদের গর্ত আবিষ্কার হবার পর সকলেই নিশ্চিত যে এটা সিঁদেল চোরের কাজ। কিন্তু চোব চিহ্নিত করণ এবং চোর ধরা কোনটাই হলো না। মাত্র কিছু দিন আগে ডাকাতির দায়ে জেল খেটে এসেছে কালু মির্জা। নাম করা ডাকাত। কালু মির্জার একটা সুনাম ছিল। সে কখনো তার নিজের গ্রামে ডাকাতি করতো না। বড় লোকের বাড়িতে বন্দুক নিয়ে ডাকাতি করতো। গ্রামের লোকে বলাবলি করতো যে কালু মির্জার বাড়িতে মাটির নীচে গুপ্তধন আছে। সিঁদেল চোর বেশী লোভ করতে গিয়ে মির্জার বাড়িতে

সিঁদ কেটে ঢুকে পড়ল। কথায় বলে ডাকাতরা রাতে ঘুমায় না। কালু মির্জা বউকে জড়িয়ে শুয়ে আছে। চোখে ঘুম নাই। কোথায় ডাকাতি করা যায় তাই ভাবছে। এমন সময় মাটি সরানোর শব্দ। কান খাড়া হয় কালুর। বুঝতে পারে ইঁদুর নয়, সিঁদ কাটছে চোর। ডাকাতের আবার চোরের ভয়। ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকে। বউ তো অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার নাক ডাকছে। সিঁদেল চোর কিছু পেয়েছে কিনা বোঝা গেল না। সিঁদ কেটে যে পথে এসেছিল সে পথেই বেরিয়ে যাবার পথে কালু মির্জা একটা বস্তা নিয়ে চুপ চাপ বসে থাকে। আর বেরুবার ঠিক মুহূর্তেই বস্তা দিয়ে চেপে ধরে তাকে টেনে তুলেই জোরে চীৎকার করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে টর্চ, হারিকেন, লণ্ঠন নিয়ে চারদিক থেকে লোকজন দৌড়ে আসে। কালু মির্জাকে দেখে চোর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে। আর কালু মির্জা চোরকে দেখে একেবারে হতবাক। সিঁদেল চোর যে কালু মির্জারই আপন ভগ্নিপতি রসুল মোল্লা। পরদিন গ্রামে সেই খবর চাউর হতেই সর্বত্র হৈ-চৈ পড়ে যায়। এই নিয়ে হাসাহাসি ও রঙ্গতামাসাও বেশ চলতে থাকে। পরে গ্রামীণ সালিশি সভা বসে। সালিশি সভায় ঠিক হয় যে রসুল মোল্লার মাথা মুড়িয়ে গাধার পিঠে বসিয়ে সারা গাঁয়ে ঘোরানো হবে। পরদিন যখন রসুল মোল্লার খোঁজ পড়ে, দেখা গেল যে আগের দিন রাতেই সে তার বৌ-পোলা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেছে। দুমাস পরে কালু মির্জাও এ দেশ ছেড়ে চলে যায়। ডাকাতের বাড়ি চুরি করার ঘটনা নিয়ে গ্রামের বুড়ো-বুড়িরা নোয়াখালি ভাষায় ছড়া বেঁধেছিল। —

হেস্কু ন হাদা খায়,
ডাকাইতের ঘরে চোর হান্ধায়।

তপোধীর একদিন এই কাহিনী হিমাদ্রিকে বলেছিল। সব শুনে হিমাদ্রি তপোধীরকে জিজ্ঞেস করেছিল — তপোধীর দা, তোমার ছড়ার মানেটা আমায় বুঝিয়ে দেবে ? আমি এর কোন মানে বুঝিনি।

তপোধীর তখন হিমাদ্রিকে বুঝিয়ে বলেছিল — 'হেস্কু' শব্দের মানে হলো - লোকটা যেমন তেমন লোক নয়। এক কথায় সাহসী। 'হাদা' মানে - তামাক পাতা। নোয়াখালি অঞ্চলের মানুষ তামাক পাতাকে সাদাপাতা বলে। অসমীয়াদের মতো তারা 'স' কে 'হ' বলে এবং 'ফ' কেও 'হ' বলে। ফলে এখানকার লোকের মুখে 'স' - 'হ' হয়ে যায়। সাদা পাতা স্থানীয় ভাষায় 'হাদা' বলে পরিচিতি লাভ করে । একথার পুরো মানে হলো — লোকটা যেমন তেমন লোক নয়, তার উপর আস্ত তামাক পাতা খায়, শুধু তাই নয়, সে ডাকাতের ঘরে গিয়ে চুরি করে। - সব শুনে হিমাদ্রি খুব এক চোট হেসেছিল।

দু'টি পালক

এখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বসত ছিল। কিন্তু শান্তি-সম্প্রীতির কোন রকম বিঘ্ন কখনো হয়নি। হিন্দু-মুসলমানের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার চল ছিল না। তবে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ছিল অটুট। মুসলমানদের রোজা, ঈদ নিয়ে এখানে কারো কোন মাথা ব্যথা ছিল না। হিন্দুদের পূজা পার্বণ নিয়েও কোথাও কোন উদ্বেগ ছিল না। বাক্সা মিঞা, বারিক সদাগর, বড় সদাগর, ইব্রাহিম সওদাগর, মনা মিঞা - এরা প্রায় সকলেই অর্থ-বিত্তে মুসলমান সমাজে খুবই প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। দেশ ভাগের পরও তাঁরা কোন দিন এদেশ ছেড়ে যাবার কথা ভাবেননি। কিন্তু হঠাৎই একদিন তপোধীর জানতে পারে এখানকার সব মুসলমানরাই পাকিস্তান চলে গেছে। এখানকার মতো তখন দেশ-রাষ্ট্রের খোঁজ খবর তেমন জানা যেত না। মুসলমানরা চলে যাবার পর অনেক হিন্দুই সেদিন তাদের সম্পত্তি জবব দখল করে নিয়েছিল। পবে টাকা পয়সা দিয়ে তারা নামে বেনামে ঐ সম্পত্তি দখল করে নেয়। তপোধীর জেনেছে যে তৎকালীন সরকারী নির্দেশেই - পুলিশ প্রশাসনের যৌথ প্রয়াসে এ রাজ্যের মুসলমানদের জোর করে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দেশ ভাগেব পব বহু হিন্দু অত্যাচারিত হয়ে এ বাজ্যে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে। তারাই এখন ধনে-সম্পদে বেশ বলীয়ান। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু বিতাড়ন দেশ ভাগের পর থেকে অব্যাহত বয়েছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পবে হিন্দুদের উপর যে বীভৎস নির্যাতন হয তার অনুপুঙ্খ বিবরণ বয়েছে তসলিমা নাসরিনেব 'লজ্জা' উপন্যাসে। তবে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেব মানুষ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা করেও নি এবং কোনদিন দেখেও নি। পূর্ব পাকিস্তানে ঊনিশশো একাত্তরের মুক্তি আন্দোলনে মুসলমান, মুসলমানদের হত্যা করেছে এবং নির্বিচারে। আলবদর, রাজাকার বাহিনী বুদ্ধিজীবীদের নৃশংস বর্বরভাবে হত্যা করেছে। পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নামে নিজের স্বাধীন অভ্যুদয় ঘোষণা করেছে।

এদেশে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় যতনা মানুষ মরে, তার চেয়ে বেশী মানুষ মারা যাচ্ছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কাবণে। তখন আর ধর্মের দোহাই নয়। আসলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পেছনেও সেই একই রাজনৈতিক সমীকরণই দায়ী। ক্ষমতার কুর্সি আঁকড়ে ধরার জন্যই রাজনৈতিক দলগুলি সারা বিশ্বজুড়ে নরমুন্ডের গেন্ডুয়া খেলা শুরু করেছে। সুক্ষ্ম আদর্শের ফিনফিনে পতাকা সব রাজনৈতিক দলেরই একটা না একটা আছে। বাস্তবে কোন দলই ঐ আদর্শের ধার ধারে না। রাজনৈতিক আদর্শবাদ আসলে একটা বিমূর্ত ধারণা। তাদের মাথার উপর আদর্শের পতাকা উড়ে, তার নীচে বসে নেতৃবৃন্দ দিব্যি ঘাড় দুলিয়ে হাওয়া খায়। পিল পিল পিপীলিকা শ্রেণীবৎ লক্ষ লক্ষ গণ দেবতার ভাগ্যে কি ঘটছে তা নিয়ে আসলে কারো কোন মাথা ব্যথা নেই। তপোধীরের আজু গোঁসাইয়ের পদটা মনে পড়ে,

দু'টি পালক

"এ সংসার মজার কুটি
আমি খাই দাই আর মজালুটি।"

আজ কালকার দিনে চাক্‌রী-বাক্‌রীর মতো রাজনীতিও এই দেশেব এক বৃহত্তর শ্রেণীর অন্যতম পেশা বা জীবিকা হয়ে উঠেছে। এই কর্মনাশা পেশায় যতই মানুষের ভীড় বাড়ছে, ততই অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্নীতি বেড়ে চলেছে, দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন ধীরে ধীরে ব্যাহত হচ্ছে। বেকারী বাড়ছে, শিক্ষিত বেকার যুবক ক্রমশঃ নৈরাশ্যে আক্রান্ত হচ্ছে, দেশজুড়ে নৈরাজ্য কায়েম হচ্ছে। জ্ঞানের চর্চা, বুদ্ধির চর্চা কমে যাচ্ছে। যতই রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটছে, ততই দেশে শিল্প-সাহিত্য-সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কবি যথার্থই বলেছেন —

"যে নদী হারায়ে, স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে।
যে জাতি জীবন হারা অচল - অসাড়,
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।"

কুসংস্কার ত্যাগ করে রাজনৈতিক সংস্কারের অন্ধগলিতে পা বাড়িয়ে মানুষ নিজের অজ্ঞাতেই তার আপন পরাভবকে মেনে নিচ্ছে। একটি সংস্কার ত্যাগ করে আর একটি সংস্কাব গ্রহণও এক ধরনের পশ্চাদ্ অপসরণ ও আত্ম পরাভব। এখন আর আদর্শের ব্যাপ্তি নয়, আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বিভ্রান্তি ছড়িয়ে যাও। মানুষ যত বেশী বিভ্রান্ত হবে, বাজনৈতিক দলগুলির যে ততই লাভ। ঈশ্বরের কাছে আমরা যেমন প্রার্থনা করে মঙ্গল কামনা করি, তেমনি রাজনৈতিক দলগুলির সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানাতে পারি না ? আমবা রাজনীতি চাই না, আমাদের ভালোটা দিন, আমরা বাঁচতে চাই।

ছোটখিল অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে বিশ-পঁচিশ ঘর মানুষকে বাদ দিলে প্রায় সকলেরই অবস্থা নুন আনতে পান্তা ফুবোনোর মতো। সারাগ্রামে কোনো পাকা বাড়ি নেই। হাতের মাপে বাড়ি ঘর বানানো হয়। ঘর-বাড়ি কাঠের গোল পালা, বাঁশের বেড়া, ছনের ছানি। যারা একটু অবস্থাপন্ন তাদের মাটির দেয়াল, টিনের ছানি। এখানকার বড় লোকদের অহংকারের প্রতীক ছিল টিনের ঘর এবং বাড়িতে পুকুর। পানীয় জল বলতে নদী, পুকুর বা কুয়োর জল। এই জল খেয়েই তো মানুষ দিব্যি বেঁচেছিল। এই কালের মতো সর্বব্যাপ্ত পরিবেশ দূষণের শিকার হতে হয়নি এই রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ের মানুষদের। পরিবেশ দূষণ - কখনোই সম্পর্ক দূষণে পরিণত হয়নি। সেকালে এই অঞ্চলের মানুষ টিউব-ওয়েল কি জিনিষ চোখেও দেখেনি। দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ গত চার দশকে

দু'টি পালক

কোথা থেকে যে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে ভাবাই যায় না। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যাওয়ার পথ ঘাট ছিল মাটি কাদায় ভরা। পাকা রাস্তা তো দূর অস্ত, কোথাও একটি ইট বিছানো রাস্তাও ছিল না। সকলেই খালি পায়ে হাঁটাচলা করতো। বাড়ি এসে গা হাত-পা ধুয়ে ঘরে ঢুকতে হতো। সব বাড়িতেই খড়ম কিংবা কাঠের পাদুকা। ছোটবেলায় খড়ম পায়ে হাঁটার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আজো তপোধীরের মনে পড়ে। খড়ম বা কাষ্ঠ পাদুকা পায়ে দিয়ে হাঁটার কথা এখন কেউই ভাবতেও পারে না। কী এক অদ্ভুত সময় ছিল তখন। সেদিনের মানুষ এসব নিয়েই কেমন এক আশ্চর্য সুখে সুখী ছিল। কষ্ট করে দু'বেলা দু'মুঠো যোগাড় করতে পারলে স্বয়ং ভগবানকেও তারা কোনদিন দোষারোপ করতো না। সেই সব সুখের স্মৃতি, ভালো লাগা, ভালোবাসার পরশ আজো মনকে বড়ো আলোড়িত করে তোলে। ভাবতে ভাবতে একসময় দু'চোখে ঘুম নেমে আসে তপোধীরের। আর ঘুমের মধ্যে দেখে এক অদ্ভুত স্বপ্ন।

সামনে বাবা, পেছনে তপোধীর। যেতে যেতে তারা পৌঁছে গেল এক অদ্ভুত একটা পাহাড়ী দেশে। চারদিকে সবুজ গাছপালা। গাছে গাছে নানা পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। কোথা থেকে দুটি হলুদ পাখি এসে তপোধীরের হাতের উপর বসল। একসময় পাখি দুটির রঙ এবং আকৃতি বদলে যেতে থাকে। ক্রমশঃ পাখি দুটি অপূর্ব সুন্দর নীল-সাদা প্রজাপতি হয়ে তপোধীরের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে থাকে। কখনো আবার গায়ের উপর এসে বসে, আবার উড়ে যায়। তপোধীব দেখে প্রজাপতিগুলো কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে প্রজাপতি দুটো ফুলপরী হয়ে যায়। পেছনে দুটি করে ডানা, আবার ছোট ছোট দুটি হাত - পা। পবী দুটি তপোধীরকে নিয়ে একটু দূরে একটি পাহাড়ী ঝর্ণার কাছে চলে যায়। ঝর্ণা না বলে জল প্রপাত বলাই ভলো। পাহাড়ের ঢালু বেয়ে তীব্র গতিতে তুষার কণার মতো সফেন ফেনিল জলকণা সশব্দে লাফিয়ে লাফিয়ে যেন কোন এক গভীর অতলে নেমে যাচ্ছে। জলকণার উপর সূর্যকিরণ পড়ে ক্ষণে ক্ষণে নানা আকৃতির রামধনুর ভাঙা-গড়ার খেলা। পরী দুটি উড়ে গিয়ে দুটি রামধনু ধরে নিয়ে এসে তপোধীরকে উপহার দেয়। তপোধীর পরীদের দেওয়া রামধনু উপহার পেয়ে খুশীতে আত্মহারা হয়ে নিজেও এগিয়ে যায় রামধনু ধরার জন্য। আর হঠাৎই পা পিছলে পড়ে যায় সেই জল প্রপাতের প্রবল স্রোতের আবর্তে। জল প্রপাত আর জল প্রপাত নেই। এক দুরন্ত পাহাড়ী নদী হয়ে প্রবল স্রোতের টানে নিজেই যেন কোথাও উধাও হতে ছুটছে। আর সেই নদীর দুর্বার স্রোত ধারা তপোধীরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বাবা এসে হাতবাড়িয়ে তপোধীরকে ধরতে যায়। ততক্ষণে তপোধীর বহুদূর চলে যায়। তপোধীর দেখে তার মাথার উপর দিয়ে পরী দুটি উড়ে চলছে। হঠাৎ কোথা থেকে একাট ডলফিন এসে তপোধীরকে পিঠে তুলে নিয়ে সাঁ সাঁ করে জল

কেটে নিয়ে যায় এক অচেনা-অজানা নির্জন দ্বীপে। একটু পরে সেই দ্বীপে পরী দুটিও হাজির হয়। তপোধীরের এতক্ষণে খেয়াল হয়, বাবা নেই। বাবার জন্য তপোধীরের কান্না পায়। তপোধীর বাবার জন্য কঁকিয়ে কঁকিয়ে ঘুমের মধ্যে কাঁদতে থাকে। তপোধীরের কান্না শুনে নন্দিতার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

নন্দিতা তপোধীরকে ধাক্কা মেরে বলে — এই ওঠো, কাঁদছ কেন ? কই গো কাঁদছ কেন? ওঠো ওঠো —

নন্দিতার ডাকে ঘুম ভেঙ্গে যায় তপোধীরের। ধমমড়িয়ে বিছানায় উঠে বসে। তখনও সম্পূর্ণ ধাতস্থ হয়নি। পুরো সম্বিৎ ফিরে আসার পর তপোধীরের স্বপ্নের কথা সব মনে পড়ে যায়। ততক্ষণে ভোরও হয়ে গেছে। ভোরের পাখিদের কিচির মিচির ডাক ভেসে আসে। দক্ষিণের জানালাটা বিছানায় বসে খুলে দেয় নন্দিতা। একরাশ ভোরের হাওয়া শিউলির সুবাস সহ ঘরে ঢুকে। শিউলির মিষ্টি গন্ধ হৃদয়ে এক অনাস্বাদিত আবেগের সৃষ্টি করে। তপোধীর নন্দিতাকে কাছে ডেকে নেয়। তারপর বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকে নন্দিতাকে। ভালোলাগা শৈশব-যৌবনের আশ্চর্য এক অবিমিশ্র অনুভূতি মগ্ন চৈতন্যে আলোড়ন তোলে। মনে এক অনাবিল চিত্ত বিমোথিত পুলক শিহরণ। কবির কাছেও এর কোন ভাষা নেই। এ যেন এক ভাষাহীন জগৎ। এমন সুন্দর অপরূপ অনাস্বাদিত মধুর মাধুরী মন্ডিত সুধা ঝরা মুহূর্ত যদি প্রতিনিয়ত জীবনের পাশে প্রতিটি নর-নারী তৈরী করতে পারে, তবে তো এ পৃথিবীতে কোন দিন হিংসা-দ্বেষ, অসূয়া-ঘৃণা, বিরাগ-বিদ্বেষ, নীচতা-হীনতা, ক্রুরতা-রূঢ়তা, হানাহানি-কাটাকাটির অবসান স্বাভাবিক ভাবেই হ্রাস পাবে। প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালোবাসার সোনার কাঠির স্পর্শে আমাদের নিত্য দিনের সমাজ সংসার সত্যিই তো একদিন ষড় ঋতুর ছন্দে গাথা অলকাপুরী হয়ে উঠতে পারে। জীবন যেখানে মন্দাক্রান্তা ছন্দে বয়ে যেতে পারে।

নন্দিতাও গভীর আবেগে তপোধীরের বুকে মুখ রাখে। তপোধীর ধীরে ধীরে নন্দিতার কোমল কুঞ্চিত কেশরাশিতে আঙুল দিয়ে বিনুনী কেটে চলে। নন্দিতার এলায়িত কালোচুলে শিউলি ফুলের সুঘ্রাণ। তপোধীর নন্দিতার চুলের গন্ধে বিভোর হয়ে ডুবে থাকে।

একজোড়া হলুদ পাখি শিউলি গাছের ডালে বসে — ইস্টিকুটুম মিষ্টি কুটুম ডেকে ওঠে। হলুদ পাখি দেখে তপোধীরের আবার স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যায়।

নন্দিতাকে পাখি দুটি দেখিয়ে তপোধীর বলে — দেখো নন্দিতা, আমি যেই দুটি পাখি স্বপ্নে দেখেছি — দেখো ওরা শিউলি গাছের ডালে বসে ডাকছে।

নন্দিতা এবার হাসতে হাসতে বলে — দেখো, আজ অফিসে নিশ্চয়ই কোন পরী এসে উপস্থিত হবে। পরীদের পাল্লায় পড়ে ঝর্ণার জলে হাবুডুবু খেয়ো না যেন।

দু'জনেই এবার হেসে ওঠে। সকালের আলস্য ভেঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

দু'টি পালক



ক্ষোভ, দুঃখ, অভিমান শিশুমনকে বড়ো বেশী ভারী করে তোলে। বাবা কোনদিন জুঁইকে মারেনি, বাবার মার খেয়ে জুঁই যেমন কেঁদেছে, তেমনি একসময় জুঁইয়ের মনে হয়েছে নিগলিত অশ্রুধারায় মনের সব মলিনতা, সমস্ত কালিমা, সমস্ত মান অভিমান ধুয়ে যেন সাফ হয়ে যাচ্ছে। নীতার সঙ্গে ঝগড়ার পর জুঁইয়ের মনে একটা পাষাণ ভার যেন চেপে বসেছিল। কাউকে বলতে পারছিলনা তার মনের কথা। অথচ ঘুম ভাঙতেই জুঁইয়ের কেমন হাল্কা হাল্কা লাগছে। ভোরবেলা জেগে উঠেই ফুলের সাজি নিয়ে শিউলি তলায় ফুল কুড়াতে যায় জুঁই। ফুল কুড়াতে গিয়ে দেখে দুটি হলুদ পাখি এ ডালে - ও ডালে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়ে যাচ্ছে। জুঁইকে দেখে পাখি দুটি 'ইষ্টিকুটুম - মিষ্টি কুটুম, বলে ডেকে উঠেই পাশের আতা গাছের ডালে গিয়ে বসে। মুখ ভেংচি দিয়ে জুঁইও পাখি দুটির উদ্দেশে বলে --- 'ইষ্টি কুটুম - মিষ্টি কুটুম.' কে তোদের কুটুম রে — ?

কার সঙ্গে কথা বলছিস্ জুঁই ? পেছনে তিয়াষের প্রশ্ন। তিয়াষ যে কখন এসে জুঁইয়ের পেছনে দাঁড়িয়েছে - জুঁই তা জানতেও পারেনি। তিয়াষের ডাক শুনে জুঁই নীরব হয়ে যায়। বুকের মাঝে কিসের এক অব্যক্ত যন্ত্রণা গুঞ্জরিত হতে থাকে।

তিয়াষ আবার ডাকে -- জুঁই - এ জুঁই। তিয়াষের ডাক শুনে জলভরা চোখ তুলে জুঁই তাকায়। তার সমস্ত দুঃখ মুক্তো হয়ে ঝরছে। জুঁইয়ের জলভরা চোখ তিয়াষকে স্পষ্ট দেখতে পায় না। তিয়াষ এগিয়ে এসে জুঁইকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার চোখের জল মুছে দেয়। তিয়াষের স্পর্শে জুঁইয়ের অন্তরলোকে কিসের এক অব্যক্ত বেদনার মীড় বেজে ওঠে। হৃদয়ের বীণা তারে খাদে-নিখাদে বেজে চলে নানা সুর। অবরুদ্ধ বরফ গলা জলধারা

প্রবল তোড়ে একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায়। তিয়াষের বুকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে জুঁই। তিয়াষের বুকই তো কাঁদবার আসল জায়গা। তিয়াষ আস্তে আস্তে জুঁইয়ের মাথায় - পিঠে এক পরিণত মানুষের মত হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। তিয়াষের হাতের স্পর্শে ধীরে ধীরে শান্ত হয় জুঁই। তারপর কোন কথা না বলে ফুলের সাজি নিয়ে ঘরে ফিরে যায়। আনমনা তিয়াষ এক পা দু পা করে ধনী সাগরের বাঁধানো ঘাটে এসে দাঁড়ায়।

পূব গগনে সূর্যদেব জেগে উঠেছে। শরতের স্নিগ্ধ হাওয়ায় ধনী সাগরের জলে ছোট ছোট ঢেউয়ের দোলা। কল-কাকলির বনে ডেকে দল বেঁধে সাঁই সাঁই শব্দ করে বালি হাঁস উড়ে যায়। আবার ঝুপ-ঝাপ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক একবার এক একটি দল উড়ে উড়ে অনেক দূর চলে যায় -— আবার সাঁই সাঁই শব্দ করে নামতে গিয়ে কল-কাকলির বান তোলে। সকালে - সন্ধ্যায় বালি হাঁসের এই নিত্য ওড়াওড়ি দেখে তিয়াষও এক একদিন স্বপ্নের ডানায় ভর করে মহাশূন্যের দিগন্ত খুঁজে বেড়ায়।

তিয়াষ ভাবে, তার আর জুঁইয়ের যদি দুটি ডানা থাকতো, তবে তারা দু'জনই উড়ে উড়ে সাত-সমুদ্র তের নীর পার হয়ে কখনো চলে যেতো অচিনপুরের ঘুম পরীদের দেশে, কখনো পিগমি বা লিলিপুটদের রাজ্যে, কখনো বা শঙ্খমালা, কাঁকন মালার খোঁজে, আবার কখনো বা কুচবরণ রাজকন্যার দেশে। কিংবা তাদের যদি একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া থাকতো অথবা থাকতো যদি মেঘে ওড়া পক্ষীরাজের বাচ্চা ঘোড়া, তাহলে কতোই না মজা হতো। তিয়াষ ভাবে, সত্যিকারের পক্ষীরাজ ঘোড় কি হয়, হয় না। ঠাকুমার কোলের কাছে বসে সব ভাই বোনরা এক সাথে মিলে শৈশবে রূপকথার গল্প শুনতো। ঠাকুমা কি যে মজার গল্প বলতে পারতো, সে সব কথা ভাবলে তিয়াষের মনে এখনো অদ্ভুত পুলক শিহরণ জেগে ওঠে। ছোটখিলে গ্রামের বাড়িতে গেলে জেঠতুতো - খুড়তুতো - মামাতো - পিসতুতো সব ভাই বোনেরা সারাক্ষণই ঠাকুমার পিছে পিছে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। আর সন্ধ্যা হলেই বসে যেত গল্প শোনার আসর। প্রতিবছর পূজার সময় একবার করে বাড়ি যাওয়া তো ছিলই, তাছাড়া মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে তিয়াষ গ্রামের বাড়িতে যেতো। আবার ঠাকুমাও কখনো কখনো তিয়াষদের কোয়ার্টারে কাটিয়ে যেত। ঠাকুমার স্পর্শ কেমন এক অলৌকিক জীবনের স্বাদ এনে দিত তিয়াষের জীবনে। ঠাকুমা গল্প বলতে শুরু করলে তিয়াষ একেবারে ঠাকুমার কোল ঘেঁষে বসতো। অনেকদিন পর পর তারা বাড়ি যেত বলে ঠাকুমা তিয়াষকে বড়ো ভালোবাসত। তাছাড়া তিয়াষ পড়াশুনোয় সব ভাই বোনদের চেয়ে ভালো বলে সবাই তাকে বড়ো আদর করতো। কাকা, কাকিমা, পিশিরা সবাই ভালোবাসে তিয়াষকে।

দু'টি পালক

তিয়াষ ভাবছে । ঠাকুমা যেন জলের ঘাটে বসে তিয়াষকে গল্প বলছে। আর ঠিক এই সময়ই এক ঝাঁক বালি হাঁস তিয়াষের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে সাঁই সাঁই শব্দ করতে করতে ঝুপ্ ঝুপ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। আনমনা তিয়াষ বালি হাঁসের সঙ্গে দীঘির জলে ভেসে যায়। সাদা প্রস্ফুটিত কমল দলে দীঘির জল পরিপূর্ণ। ভাবতে ভাবতে তিয়াষ বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায়। হঠাৎ পেছন থেকে কে এসে ধাক্কা দিয়ে তিয়াষকে দীঘির মধ্যে ফেলে দেয়। টাল সামলাতে না পেরে তিয়াষ জলে ডুবে যায়। ঠিক সেই সময় জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে জুঁই। তিয়াষ জল থেকে মাথা তুলে ঘাটের দিতে তাকিয়ে দেখে ঘাটে কেউ নেই। কিন্তু তিয়াষের বুঝতে বাকি নেই যে কে এমন কাজ করতে পারে। জুঁই ততক্ষণে ধনী সাগরের মাঝে গিয়ে জল থেকে মাথা তুলে 'কুক' বলেই আবার জলে ডুব দেয়। একটু পরে আবার মাথা তোলে। জলে ভেজা জুঁইয়ের মুখ দেখে তিয়াষের মনে হয়, ধনী সাগরের জলে বুঝি আর একটা পদ্মফুল বেশী ফুটেছে।

জুঁইকে দেখে তিয়াষও সাঁতার কেটে এবার তাকে ধরবার জন্যে এগিয়ে যায়। জুঁই বুঝতে পারে তিয়াষ তাকে ধরতে আসছে। কাছাকাছি আসতেই জুঁই ডুব দিয়ে দ্রুত অন্যদিকে চলে যায়। তাদের দেখাদেখি আরো কয়েকটা ছেলে মেয়ে ধনী সাগরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাড়ারই ছেলে-মেয়ে তারা, তারাও জুঁই-তিয়াষের পরিচিত। সকলে মিলে খেলতে থাকে জলডুবি খেলা। আবার এক সঙ্গে সবাই জলে ডুব দিয়ে এক হাত মুষ্টিবদ্ধ করে হাতের চেটোয় হাতুড়ীর ঘায়ের মতো জোরে জোরে ঘা দিলে বহুদূর থেকে জলের মধ্যে সে শব্দ শোনা যায়। তারপর চলে জলডুবি খেলা। একজন সাঁতার কেটে আর এক জনকে ধরবে। জলের মধ্যে সাঁতার কাটতে কাটতে তারা এমনি আরো অনেক নতুন নতুন খেলা খেলে। জুঁইয়ের লক্ষ্যই থাকে ডুব দিয়ে সে তিয়াষকে ধরবে, আবার তিয়াষও চেষ্টা করে ডুব দিয়ে জুঁইকে ধরতে। জুঁই তেমনি ডুব দিয়েছে কাউকে ধরার ভান করে, কিন্তু তিয়াষ জানে জুঁইয়ের লক্ষ্যই তিয়াষ। জুঁই জলে ডুব দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তিয়াষ সাঁতার কেটে একটু দূরে চলে যায়। জুঁইও জানে যে তিয়াষ তাকে লক্ষ করছে এবং তিয়াষ ওখানে থাকবে না। জুঁই সে ভাবেই ডুব দিয়ে চলে যায় তিয়াষের কাছে। আর ঠিক ঠিক তিয়াষের পা দুটি জড়িয়ে ধরে হুম করে জলের মধ্যে থেকে ডলফিনের মতো জেগে উঠে।

হাঁফাতে হাঁফাতে জুঁই বলবে — চালাকি করে ভেবেছ বাঁচবে, বাঁচতে পারলে? তিয়াষ জলের মধ্যেই জুঁইকে বুকে জড়িয়ে ধরে। মনে হয় একটি পদ্মফুল যেন আর একটি পদ্মফুলকে জড়িয়ে ধরেছে। উচ্ছল উদ্দাম জুঁই তিয়াষের বাহু বন্ধনে নিজেকে সঁপে দিয়ে অনুভব করে এক অনাস্বাদিত ভালোলাগা। সাঁতার কেটে দু'জনই পদ্মফুল আর পদ্মপাতার আড়ালে এমন একটি জায়গায় দাঁড়ায়, যেখানে পা মাটি স্পর্শ করে। তারপর দুজনই অনিমেষ

নয়নে দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। এই নির্নিমেষে চেয়ে থাকাকেই কবিরা বলেছেন অবলোকন। তিয়াষ ও জুঁই একে অপরকে হৃদয়ের আঁখি দিয়েই অবলোকন করে।

এর মধ্যে মাধুরী ও নন্দিতা — তিয়াষ আর জুঁইকে দেখতে না পেয়ে চারদিকে ডাকাডাকি শুরু করে। এরা যে আশ্বিনের এই সকালে ধনী সাগরের জলে দাফাদাফি করে বেড়াবে তা তারা বুঝতেই পারেনি। অনেকগুলি ছেলে - মেয়েকে ধনী সাগরের জলে সাঁতার কাটতে দেখে তাদেরও সন্দেহ হয় যে - তিয়াষ আর জুঁইও হয়তো জলে নেমেছে। দাঁত মাজতে মাজতে দু'জনই তাদের ডাকতে থাকে। কিন্তু তাদের দেখতে পায় না। তখন কিন্তু পদ্মফুল ও পদ্মপাতার আড়ালে দুটি শিশুমন এক অনন্য অনুভূতির জালে জড়িয়ে এক অপার্থিব অলকাপুরীর আস্বাদন অনুভব করছে, এই অমলিন স্নিগ্ধ পাট ভাঙ্গা সকালে তাদের চারদিকে যেন নীলাঞ্জন মাখা নীলাকাশ থেকে রাশি রাশি তারা জোনাকীর মতো ঝরে পড়ছে। পল-অনুপল যেন যুগ থেকে যুগান্তরের পানে মহাকালের পাল উড়িয়ে পাড়ি দিয়েছে। একদা যে জলে জীবনের সূত্রপাত ঘটেছিল - সেই অসীম জলরাশির স্নিগ্ধ পরশে দুটি শিশু ক্রমশঃ নর-নারীতে রূপান্তরিত হতে হতে পরিপূর্ণ মানব-মানবীতে পরিণত হয়ে উঠলো। আদিম মানব-মানবী আদম এবং ঈভের মতো তারা তখনো জ্ঞান বৃক্ষের ফল খায়নি বলে তাদের মধ্যে কামনার কোন জন্ম হলো না। কিন্তু এক অব্যক্ত লজ্জা রাশি ক্রমে ক্রমে তাদের অনুভূতির পরতে পরতে সঞ্চারিত হতে লাগলো। একী পদ্ম-মৃণালের বন্ধন ! না ভালোবাসার মায়া ডোর।

মায়ের ডাকে জুঁই ও তিয়াষের সম্বিৎ ফিরে আসে। লুপ্ত চেতনা বোধকে নাড়া দিয়ে যায়। তারা আচমকাই দু'জন দু'জনকে ছেড়ে দেয়। তারপর পদ্মপাতার ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে সাঁতরে ঘাটে এসে ওঠে। মায়ের ধমকে দু'জন আবার বাথরুমে ঢুকে সাবান - শ্যাম্পু দিয়ে শাওয়ারের জলে স্নান সেরে কাপড় বদলিয়ে হরলিক্স-বিস্কুট খেয়ে পড়তে বসে পড়ে। আজ দোসরা অক্টোবর, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। স্কুল, অফিস-কাছারী সহ সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানে ছুটির দিন।

মাধুরী ও নন্দিতা তাদের দুই ছেলে-মেয়েকে বকতে থাকে। সকাল বেলা জলে ডোবা? সর্দি কাশি হোক, তারপর ঘর থেকে বের করে দেব। বাবাও হয়েছে তেমনি। ছেলেকেও ডাকবে না, মেয়েকেও ডাকবে না। এ কেমন বাপ রে বাবা।

তিয়াষের অজানা ভালোবাসার পরশে জুঁইয়ের মনের সব মলিনতা দূর হয়ে যায়। গতদিনের নীতার কুটুক্তি, নীতার বাবার - জুঁইয়ের বাবাকে ডেকে নিয়ে অপমান, অপমানিত হিম্রাদ্রির জুঁইয়ের ওপর হাত তোলা, সারারাত অভিমান দগ্ধ নিশিযাপন ।

দু'টি পালক

সবই যেন আজকের এই নির্মল প্রত্যুষের স্নিগ্ধ আলোক ধারায় এবং ধনী সাগরের শতদল সিক্ত সলিলে স্নান - সাঁতারে ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে। দেহের সকল আবিলতা দূর হয়ে জুঁইয়ের দেহে-মনে এক অপার অনন্য তৃপ্তির আস্বাদ লেগে রয়েছে।

মাধুরী ও নন্দিতা দু'জনেই মেয়ে, নারী, দু'জনেই মা। মাধুরী জুঁইয়ের মা, নন্দিতা তিয়াষের। জুঁই এবং তিয়াষ ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠছে। তিয়াষ এবার সপ্তম শ্রেণীতে এবং জুঁই পঞ্চম শ্রেণীতে উঠবে। তিয়াষ বৈশাখে বার পার হয়ে গেছে, জুঁই অক্টোবরের বিশে দশ পূর্ণ কববে। নন্দিতার মনে তিয়াষ সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্ম নিতে থাকে।

পদ্মকুঁড়ির মতো দেখতে জুঁইকে যে নন্দিতা তার ছেলের 'বউ' করে নিতে চায়। মনের গোপন কোণে এই বাসনা যে বড় হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝেই উঁকি দিয়ে যায় যে এই ভাবনা। জুঁই সত্যিই ভালো মেয়ে। নাচ-গান-আবৃত্তি- খেলাধূলার পাশাপাশি পড়াশুনায়ও জুঁই খুবই ভালো। প্রতিবছরই পবীক্ষায় প্রথম। হিমাদ্রি আর মাধুরী দু'জনেই তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শৈশব যৌবনের সাথী যে তাবাও।

নন্দিতা ভাবে - তিয়াষের এই অবুঝ শিশুমনে প্রেম-ভালোবাসার কোন স্ফুলিঙ্গ এই বযসে খেলা করে কি ? কিংবা জুঁইয়েব মনে ? তিয়াষ আর জুঁই দুইজন দুইজনকে খুবই ভালোবাসে। শৈশব-কৈশোবের ভালোবাসায নাকি কোন পাপ থাকে না, একটা অমোঘ টান থাকে। অপবিণত বয়সেব সেই গভীব গোপন টানই একদিন পরিণত বয়সে এসে প্রেম-প্রণয়ে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। ইহাই তরু বল্লরীর চিরন্তন বন্ধন।

তিয়াষ ও জুঁইযেব নিবিড় সান্নিধ্য, নানা খুনসুটি, চপল দুরন্তপনা দুই মায়েবই খুব ভালো লাগে। জুঁই কিংবা তিয়াষ একজন একজনকে দেখতে না পেলে কেবলই খোঁজ নিতে থাকে।

মিষ্টি মাসী — তিযাযদা কই ? দেখতে পাচ্ছি না।

বাঙ্গা মাসী — জুঁই কি কোথাও গেছে ?

সাবাদিন নন্দিতা ও মাধুরীকে এই দুইজনের এই একই প্রশ্নের উত্তর অন্ততঃ শতবার দিতে হয়।

কখনো কপট রাগ দেখিয়ে মাধুরী হয়তো বলবে — জুঁইকে ওর মাসীর বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। তোর জ্বালার জুঁই আর এখানে থাকতে চায় না। জুঁইকে তার মাসী বাড়ি নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে দেব।

জুঁইয়ের বিয়ের কথা শুনে তিয়াষের মনটা অজানা আতঙ্কে কেঁপে ওঠে। বিষাদ

মাখা কণ্ঠে তিয়াষ অনুযোগের সুরে বলে - জুঁইতো ছোট। এত ছোট মেয়েকে আজকাল কেউ বিয়ে দেয় ? তুমি আমরা সঙ্গে মিছে কথা বলছ ।

মাধুরী কথা না বাড়িয়ে অন্য কাজে মন দেয়। তিয়াষ হয়তো চলে আসবে। ঠিক এই সময় জুঁই এসে উঁকি দিয়ে বলবে — কুক্। জুঁইয়ের সাড়া পেয়ে তিয়াষের মন পুলকিত হয়ে ওঠে। মুহূর্তে কোথায় যেন হারিয়ে যায় সব বিষাদ।

অন্য আরেকদিন হয়তো জুঁই গিয়ে নন্দিতাকে বলবে — মিষ্টি মাসী তিয়াষ দাকে যে সকাল থেকে দেখছিনা। দোকানে পাঠিয়েছ ? নন্দিতা জুঁইয়ের কথা শুনে উত্তর দেয় — বাপু, তোদের জ্বালায় আর বাঁচিনে। সারাদিন তিয়াষদা, তিয়াষদা। তিয়াষকে কি তোর জন্য বেঁধে রাখব? কোথায় যায়, না যায় সেকি আমাকে বলে যায় ? দ্যাখ্, হয়তো মৌদের বাড়ি গেছে। মৌ'র সাথে আজ নাটক দেখতে যাবে বলেছে।

মৌ, জুঁইয়ের এক ক্লাশ উপরে পড়ে। এবার পাশ করলে ক্লাশ সিক্স এ উঠবে। জুঁইদের কোয়ার্টারের পাশেই মৌদের বাড়ি। মৌ'র বাবা নেই। মা স্কুলে পড়ান। মৌ'র জন্মের এক বছরের মধ্যেই তার বাবা ক্যান্সারে মারা যায়। ওর বাবা ছিলেন স্কুলের শিক্ষক। মৌ'র বাবার মৃত্যুর পর মৌয়ের মা' কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুর জন্য বাবার চাকুরিটি পেয়ে যায়। মৌয়ের ঠাকুর্দা-ঠাকুমা এবং কাকারা অপয়া অপবাদ দিয়ে শ্বশুব বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। মৌ-এর মা ছোট্ট মৌ'কে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসে। মৌয়ের দাদুই মৌয়ের মাকে ছোট্ট এক টুকরো জায়গা উদয়পুরের ধনী সাগরের পারে কিনে দিয়েছিল। সেই জায়গায় মাটির দেওয়াল দেওয়া একটা ছোট টিনের ঘর তৈরী করে সেই ঘরে মৌ ও তার মা থাকে। নিরুপমা চিরন্তনী বাঙ্গালী বধূর আদি ছাঁচ। অদৃষ্টবাদী, শান্তিপ্রিয়, একান্ত ঘরোয়া, আট পোরে জীবনে অভ্যস্ত। কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধেও নিরুপমার কোন ক্ষোভ নেই। অনুযোগ নেই। নিরুপমা চাকুরী পাবার পর শ্বশুর বাড়ির লোকেরা মৌ ও তার মাকে নিতে এসেছিল। কিন্তু নিরুপমা আর কোন দিন শ্বশুরবাড়ি মুখো হয়নি। মৌয়ের কাকারা কালে-ভদ্রে এসে মা-মেয়ের খবর নিয়ে যায়। মাঝে মধ্যে এটা-ওটা দিয়েও যায়। শ্বশুর বাড়ির লোকজনেরা এলে নিরুপমা তাদের পরম আদরে রান্না-বান্না করে খাওয়ায়, পূজা পরবে কাপড়-চোপড় উপহার পাঠায়।

মৌ দেখতে একটু শ্যামলা। পাতলা লম্বা গড়ন। রোগাটে চেহারা। টিকলো নাক। জোড়া ভুরু। টানা টানা চোখ। হাসলে গালে টোপ পড়ে। মাথায় একরাশ কালো ঘন চুল। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। বিনুনি বাঁধতে অসুবিধা হয়। ফিতে দিয়ে মৌয়ের মা শক্ত করে চুলের গোড়া বেঁধে দেয়। পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়ে ঘন কালো চুল। যেন বিজ্ঞাপনের মডেল।

দু'টি পালক

চোখের তারা দুটি ভ্রমর কালো গভীর। এককথায় মৌকে দেখতে ভালোই লাগে। মৌ যেন সত্যিকারের শ্যামলা গাঁয়ের কাজলা মেয়ে। পড়াশুনায়ও মৌ যথেষ্ট ভালো। মোটামুটি ক্লাশের প্রথম দশজনের মধ্যেই তার নাম থাকে। উদয়পুর রবীন্দ্র পরিষদে নাচগান শেখে। মৌয়ের মা বেশ ক' বছর ধরেই ফিক্সড পেতে চাকুরী করছিলেন। একমাত্র মেয়েকে নিয়ে খুব একটা কষ্ট না হলেও সংসারে একটা চাপা অভাব ছিলই। মৌয়ের মা চাকুরী নেওয়ার শর্তে মৌয়ের বাবার প্রাপ্য শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে দিয়ে দিয়েছিল। বছর খানেক হলো মৌয়ের মায়ের চাকুরী নিয়মিত হয়েছে। এখন যা মাইনে পান, তা দিয়ে ভালোভাবেই তাদের সংসার চলে যায়। মৌয়ের মা উদয়পুর ত্রিপুরা সুন্দরী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের বিষয় শিক্ষিকা পদে বৃত। বাংলা সাহিত্যে এম.এ। দেখতে বেশ সুন্দরী। শোনা যায় মৌয়ের বাবা ছিলেন দেখতে কিছুটা কালো। মৌ নাকি বাবার গায়ের রঙ পেয়েছে।

তিয়াষ মৌদের বাড়ি গেছে শুনে জুঁইয়ের ভারী অভিমান হলো। মৌয়ের সঙ্গে তিয়াষের মেলা-মেশা জুঁই কিছুতেই পছন্দ করে না। তিয়াষকে মৌয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই জুঁই গাল ফুলিয়ে রাখে। সেদিন জুঁই আর কিছুতেই তিয়াষের সঙ্গে কথা বলবে না। ডাকলেও সাড়া দেয় না। এই সুযোগে তিয়াষ জুঁইকে দেখিয়ে দেখিয়ে চীপ্স খায়। ক্যাডবেরিস খায়। জুঁই আড়চোখে দেখে এবং আরো খেপে যায়। সেও তিয়াষকে দেখিয়ে দেখিয়ে পেয়ারা কিংবা চকোলেট খায়।

তিয়াষও জুঁইকে খেপানোর একটা সুযোগ পেয়ে ভাবী খুশী। জুঁই তিয়াষের সঙ্গে কথা না বললে তিয়াষও সকলকে শুনিয়ে জোরে জোরে মাকে বলবে — মা, আমি একটু মৌদের বাড়ি যাচ্ছি, একটু পরে চলে আসবো।

জুঁই শুনতে পেয়ে বাগ করে কখনো কেঁদে ফেলে। আবার কখনো বা শুনিয়ে শুনিয়ে ভেংচি কেটে উত্তর দেবে — 'মা, আমি একটু মৌদের বাড়ি যাচ্ছি - । দেশে যেন যাবার মতো আর কারো বাড়ি নেই। শুনিয়ে শুনিয়ে চিৎকার করে এসব বলার দরকার কি ? যাব যাবার সে যেখানে খুশী যাক্ না। মাকে বলা হচ্ছে — না সবাইকে শোনানো হচ্ছে?

তিয়াষ এমন প্রতিক্রিয়াই সাধারণতঃ আশা করে। তিয়াষ তখন মৌদের বাড়ি না গিয়ে জুঁইদের ঘরে যাবে। তিয়াষ মাধুরীর কাছে গিয়ে বলবে — রাঙ্গা মাসি, মা না কাল দুটো ক্যাডবেরিজ চকোলেট এনেছে। আমি একটা খেয়েছি , আর একটা তোমার জন্য এনেছি। এই নাও, তুমি এটা খাও।

ক্যাডবেরিজ চকোলেটের কথা শুনেই জুঁই এক দৌড়ে বেরিয়ে এসে খপ্ করে

দু'টি পালক

তিয়াষের হাত থেকে চকোলেটটা টেনে নিয়ে মুখে পুরে দেয়। এতক্ষণ কথা না বলা — বুকের মাঝে জমে থাকা সব অভিমান একলহমায় কোথায় যেন হারিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'জনের আবার ভাব হয়ে যায়। ছুটির দিনে বসে বসে দুজনে নিভৃতে সাপ লুডো বা লুডো খেলে। খেলতে খেলতেই পরস্পরের মধ্যে চলতে থাকে নানা খুনসুটি। জুঁইয়ের লুডোর গুটি দানে পড়লে সে একেবারে রেগে কাঁই হয়ে যায়। আবার তিয়াষের গুটি দানে পড়ে কাটা গেলে জুঁই আনন্দে নাচতে থাকে। আবার কখনো বা দু'জনের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায়। এমনি একদিন ঝগড়া করতে করতেই জুঁই তিয়াষের হাত কামড়ে দিয়েছিল। এমন জোরে কামড়টা বসিয়ে দিয়েছিল যে দাঁত বসে গিয়ে একেবারে রক্তারক্তি কান্ড। যন্ত্রণায় তিয়াষ আর্তনাদ করে ওঠে। মাধুরী দৌড়ে এসে কান্ড দেখে এবং সবশুনে একেবারে হতবাক। রেগে গিয়ে মাধুরী জুঁইয়ের গালে একটা জোর থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। ডেটল দিয়ে পরিষ্কার করে তাড়তাড়ি হাতটা বেঁধে দেয়। মাধুরী এর পরেও জুঁইকে অনেক বকাবকি করেছে। নিজের এই ব্যবহারে জুঁই নিজেও কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। তার যে কি করা উচিৎ তা সে নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। কয়েকমাত্রা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের গুণে দু'একদিনের মধ্যেই তিয়াষ সুস্থ হয়ে ওঠে। রাগে এবং অভিমানে তিয়াষ ক' দিন আর জুঁইয়ের সঙ্গে একটিও কথা বলেনি। জুঁইয়ের দিকে চোখ পড়লেই তিয়াষ তার মুখ ঘুরিয়ে নিত। হিমাদ্রিও জুঁইকে অনেক বকেছে। নন্দিতা কিম্বা তপোধীর বিষয়টাতে কোন গুরুত্বই দেয়নি। এনিয়ে কোনও কথাও বলেনি। তারা জানে তিয়াষ নিশ্চয়ই জুঁইকে এমন ভাবে খুঁচিয়েছে যে, রেগে গিয়ে নিজেকে সংযত করতে না পেরে একেবারে কামড়ে দিয়েছে।

জুঁই নিজের অপরাধের মাত্রা বুঝে লজ্জা ও অপমানে যেন মরমে মরমে মরে যায়। তিয়াষ কথা না বলায় জুঁইয়েরও যেন কিছুই আর ভালোলাগে না। তিয়াষের রাগ না কমায় জুঁই সুযোগ পেলেই নন্দিতার কাছে গিয়ে বেশী বেশী নিবিড় হয়ে বসে থাকে, যাতে তিয়াষ নন্দিতার কাছে বেশী ঘেঁষতে না পারে। জুঁই তিয়াষের সঙ্গে কথা বলতে চায়, কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। নিবিড় হতে চায়। কিন্তু তিয়াষ এড়িয়ে যায়। তিয়াষ যে দিক দিয়ে বেরুবে, জুঁই কিছু না বোঝার ভান করে অকারণেই পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকে। তবু তিয়াষ কোন কথা বলেনা।

জুঁই মাধুরীর কাছে নালিশ করে — মা, দেখছো, তিয়াষ দা আমায় সঙ্গে কথা বলে না।

মাধূরী — তিয়াষ ঠিক করেছে, ধিঙ্গি মেয়ে কোথাকার। তুই তিয়াষকে অমন ভাবে কামড়ে দিলি কেন ?

দু'টি পালক

জুঁই — কামড়ে দিয়েছি বেশ করেছি। সেদিন আমি খেলতে ডেকেছি, আমার সঙ্গে না খেলে তিনি মৌদির সঙ্গে খেলতে গেছেন। আমার মনে নেই ? আমি অত সহজে ভোলার পাত্র নই বাপু। ওই দিন খেলতে গিয়ে আমার নাক টেনে দিয়েছিল কেন তোমার ওই গুণধর বোন পুত ? সেটা জিজ্ঞেস করেছ ?

জুঁইয়ের কথা শুনে নন্দিতাও ঘরে হেসে ওঠে। মাধুরীও হাসতে থাকে। কেউ কোন কথা বলে না।

জুঁই মৌকে খুব ভালোবাসে। তাকে মৌ দি বলেই ডাকে। মৌ তিয়াষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইলে, কিম্বা দু'জনকে ঘনিষ্ঠ দেখলেই জুঁইয়ের কেন জানি বড় রাগ ধরে যায়। জুঁই তার নিজের মধ্যে যেন কিছু একটা হারানোর ব্যথায় ভেতরে ভেতরে বড়োই উদ্বেল হয়ে ওঠে। তিয়াষকে কেউ আদর করলে বা তার প্রতি একটু বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করলেই জুঁইয়ের তা যেন আর কিছুতেই সহ্য হয় না। জুঁই নিজে মৌ'দের বাড়ি গেলে কোন দোষ হয় না, কিন্তু তিয়াষ তাদের বাড়ি গেলেই জুঁই ক্ষেপে যাবেই।

আজ আবার মিষ্টি মাসী বলে বসেছে - - শুনেছিস জুঁই, তিয়াষ আজ মৌকে নিয়ে নাটক দেখতে যাবে। - একথা শোনার পর জুঁইয়েব মাথায় আগুন ধরে যায়।

সকাল বেলা তিয়াষ জুঁইকে বলেছিল - - নিরুমাসীর স্কুলে আজ একটা নাটক হবে, দেখতে যাবি ?

জুঁই তিয়াষকে বলে দিয়েছে — আমি যাব না। তুমি একা একা যাও।

অপমানিত তিয়াষ তাই ঠিক করেছে মৌয়ের সঙ্গে নাটক দেখতে যাবে। এখন সে কথা শোনার পর জুঁইয়ের আরো জিদ চেপে যায়। রেগে গিয়ে বলে - আমি যাবো না বলায় তিয়াষ দা মৌকে মিয়ে নাটক দেখতে যাবে ? তোমাকে আমি নাটক দেখাচ্ছি। এবার আমিও যাবো। এবার তোমার নাটক দেখার মজা বের করছি।

নন্দিতার কথা শোনার পর জুঁই রাগে গর গর করতে করতে কথাগুলি শুনিয়ে শুনিয়ে বলেই - ঘরে এসে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। দুপুর বেলা মাধুরী জুঁইকে খাবার জন্য ডাকলে জুঁই প্রথমে কোন উত্তর দেয় না। পরে বলে — না, আমি আজ ভাত খাবো না।

জুঁই কথাটা অনেকটা চীৎকারের সুরেই বলে যাতে তিয়াষেরও কানে যায়। জুঁই ভাত খাবে না, খাচ্ছে না, এ খবর তিয়াষের কানে গেলেও, সে আর এ বিষয়ে তেমন গা করছে না। আসলে তিয়াষের তো কোন দোষ নেই। সে তো জুঁইকে নাটক দেখতে যেতে বলেছিল। জুঁই যাবে না বলেছে। এতে কেউ যদি রাগ করে করুক, তাতে তিয়াষের কিছুই

আসে যায় না।

জুঁইয়ের মান ভাঙ্গাবার জন্য এবার নন্দিতা আসরে নামে। জুঁইয়ের কাছে এসে তার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে তাকে আদর করে দেয়। তারপর বলে - কিরে জুঁই, ভাত খাচ্ছিস না কেন? যা ভাত খা। মা, ভাত নিয়ে বসে আছে।

জুঁই আরো চিৎকার করে বলে ওঠে — না খাবো না। তোমার ছেলেকে বল আমার ভাত খেয়ে যেতে। আমাকে ফেলে আর একটি মেয়ের সঙ্গে ঢং ঢং করতে করতে তিনি নাটক দেখতে যাবেন। কত রঙ্গ দেখালি মা কলিকালে।

জুঁইয়ের কথা শুনে নন্দিতা ও মাধুরী এক সঙ্গে হো হো করে হেসে ওঠে। এরপর নন্দিতা বলে — মেয়ের দেখি বড্ডো রাগ হয়েছে। যা, যা, খেয়ে আয়। আমি তো ঢং করে তোকে কথাটা বলছি। তিয়াষ তোকে নিয়েই নাটক দেখতে যাবে।

এবার জুঁই বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে নন্দিতার গলা জড়িয়ে ধরে মুখে একটা চুমু খেয়ে বলে — সত্যি বলছ, মিষ্টি মাসি ? সত্যি ? নন্দিতা বলে — হ্যাঁরে, সত্যি বলছি। যা ভাত খেযে তৈরী হয়ে নে। তোর মেসোর অফিসের গাড়ীতে আমবা সবাই একসঙ্গে নাটক দেখতে যাব।

খুশী মনে খাবার খেতে যায় জুঁই। দুটি শিশুর মান-অভিমানেব যে নাটক সকাল থেকে চলছিল — এভাবেই তার অবসান ঘটলো। সুযোগ বুঝে জুঁইকে খেপানোর জন্য তিয়াষ ছড়া কেটে বললো,

'এক টুনটুনি টুনটুনাল,
খাব না বলে ভাত খেয়ে গেল।
নাটক দেখতে উড়ে গেল
নাক কেটে যাত্রা ভঙ্গ হোল।

ছড়া শুনে কোন কথা না বলে জুঁই সুযোগ খুঁজছিল তিয়াষকে জব্দ কবাব জন্য। তিয়াষ পোষাক পরবার জন্য গায়ের কাপড় খুলে তৈরী হচ্ছিল। জুঁই হঠাৎ এসে তাব মাথায় এক মগ জল ঢেলে দিল।

তারপর কিছুক্ষণ দু'জনে দৌড়াদোড়ি ও খুনসুটির পর শান্ত হোল। সন্ধ্যায় তারা সকলেই একসঙ্গে নাটক দেখতে গেল। তাদের সঙ্গে অবিশ্যি মৌও ছিল। তিয়াষেব একপাশে মৌ, অন্য পাশে জুঁই বসেছিল। তিয়াষের পাশে মৌকে বসতে দেখে জুঁইয়ের সেদিন নাটক দেখার সব আনন্দই হারিয়ে গিয়েছিল। যতক্ষণ না নাটক শেষ হচ্ছিল, জুঁই ততক্ষণ কারো সঙ্গে একটিও কথা বলেনি। সারাক্ষণ গাল ফুলিয়ে বসেছিল। তিয়াষ জুঁইকে চকোলেট

সেধেছিল। জুঁই কোন সাড়াই দেয়নি। তিয়াষ জুঁইয়ের রাগের কারণ বুঝতে পেরে নাটক দেখতে গিয়ে, আর কোন নতুন নাটক হোক, তা করতে দেয়নি।

শৈশবে বাবাকে হারিয়ে মৌ — এই বয়সেই অনেক পরিণত ও সংযত। বিশেষতঃ পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে কিছুটা অভাবের মধ্যে বড় হতে গিয়ে কেন যেন অন্য অনেকের মতোই সহজ হতে পারেনি সে। স্বামী হারা নিরুপমাও মৌকে সব সময় আগলে রাখতে চায়। নিরুপমা তার মেয়ের কোন অভাব রাখেনি। তেমনি প্রয়োজনের বাইরেও মৌকে চলতে দেয়নি। তাই মৌ স্বভাব লাজুক, কথা কম বলে, সব সময় নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চায়। জুঁইদের অবস্থা ভালো। তারা অনেক খোলামেলা। জুঁইয়ের সঙ্গে খেলাধূলা করলেও, মৌ কিন্তু একটু দূরত্ব বজায় রেখেই চলে। তিয়াষের সঙ্গে ভাব থাকলেও, তা.অভাবী পড়শীদের অবস্থান থেকে খুব একটা উচুঁতে নয়। তিয়াষের বাবা তপোধীর সরকারী বড় অফিসার। সকলেই তাঁকে সমীহ করে। এদিকে তিয়াষ সব বিষয়েই স্কুলের সেরা ছাত্র। তাই সে সকলেরই বড় প্রিয়। স্কুলের হেড স্যার থেকে সব মাষ্টার মশাই তিয়াষকে স্নেহ করে। ভালোও বাসে। তিয়াষ পড়াশুনোর পাশাপাশি গান-বাজনা, খেলাধূলা, ছবি আঁকা, অভিনয, শ্রেণী পরিচালনা সব ব্যাপারেই সমান্তরালভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। মৌ তিযাষকে যত দেখে, ততই বিস্মিত হয়। কাছে যেতে কেমন যেন তার সংকোচ বাধে, ভয়ও করে। অঙ্কে বিজ্ঞানে-সাহিত্যে তিয়াষের প্রতিদ্বন্ধী কেউ নেই। স্কুলের দেয়াল পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় তিয়াষেব গল্প, কবিতা বের হয় এবং তা সকলেরই প্রশংসা কুড়ায়।'রাজ্যের নানা পত্র-পত্রিকায তিয়াষের লেখা নিযমিত বের হয়। এক কথায় তিয়াষ সকলেরই চোখের মণি।

তিয়াষ দক্ষ শিক্ষকের মতোই অঙ্ক বুঝিয়ে দেয়। অন্যান্য বিষয়েও সাহায্য করে। মৌর সঙ্গে তিয়াষের যেন একটা ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক। তিয়াষ মৌয়ের সঙ্গে সহজভাবে মেলা-মেশা করতে চাইলেও, মৌ কিন্তু তিয়াষের সঙ্গে খুব একটা সহজ হতে পারে না। তিয়াষের সঙ্গে জুঁইয়ের সহজ গভীর হৃদয়ের সম্পর্ক, ভালোবাসার সাবলীল ছন্দে জড়ানো। জুঁই-তিয়াষের সম্পর্কের মধ্যে কোথায় যেন অদৃশ্য প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে। নানা খুনসুটি ও কৌতূহলের মধ্য দিয়েই কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ক্রমশঃ একটা অনুভব জাগ্রত হয়। এই তিন কিশোর-কিশোরীব মধ্যেও জন্ম নিয়েছে অব্যক্ত অনুরাগের নিবিড় মাধুর্য। রৌদ্র ছায়ার লুকোচুরি খেলা ওদের মনে ক্ষণে ক্ষণে ঝিলিক দিয়ে যায়। তিয়াষের জন্য মৌয়ের অন্তরেও একটা প্রতীক্ষা অপেক্ষা করে থাকে। এই অনন্ত প্রতীক্ষা অধরা মাধুরী মেশানো।

আজ রবিবার। ছুটির দিন। সকাল থেকেই জুঁই কেমন উদ্দাম, চঞ্চল। ঘরে ঘরে

দৌড়াদৌড়ি। নীতার সঙ্গে ঝগড়ার পর, জুঁই আর তার সঙ্গে কথা বলেনা। এক সঙ্গে যাওয়া-আসাও বন্ধ। হিমাদ্রি জুঁইকে আর জজসাহেবের মেয়ের সঙ্গে মিশতে দিতে চায় না। আবার যদি কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, তবে জজ্ সাহেব হয়তো হাইকোর্টের রেজিষ্টারকে বলে দূরে কোথাও বদলী করে দেবে। কোর্টের পেশকার হলেও, আসলে চাকরীটাতো কেরানীরই। কোর্টের চাকুরীতে জজ সাহেবদের সঙ্গে মানিয়ে চলতেই হয়। জজ সাহেবদের মেজাজ-মর্জির উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। এ ছাড়া পদেরও একটা সম্মান তো আছেই।

হিমাদ্রির পৈতৃক বাড়ি বিশালগড় মহকুমার অফিসটিলা এলাকায়। হিমাদ্রিবা দুই ভাই, দুই বোন। ছোট নীলাদ্রি। বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। নীলাদ্রি সকলেব ছোট। মাঝে দুই বোন। রীতা ও মিতা। ভাই-বোনদের পড়াশুনো, বোনদের বিয়ে - এসব করতে করতে — সোজা কথায় সংসারের ঘানি টানতে টানতে হিমাদ্রির আর নিজেব দিকে তাকানোর সময় নেই। সংসারের চাপে তড়িঘড়ি বিচারবিভাগের চাকুরীতে ঢুকে পড়ে, আর এরই মধ্যে একসময় বামপন্থী কর্মচারী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে হিমাদ্রি। দুর্দান্ত স্মার্ট, স্পষ্ট বক্তা, শাণিত বুদ্ধি, বক্তব্য বিষয় সুন্দর ভাবে গুছিয়ে বলতে পাবে। তখন এ রাজ্যে বামপন্থী ছাত্র-যুব কর্মচারী আন্দোলন তীব্র। সকলের দেখাদেখি হিমাদ্রিও কখন যে এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে তা আজ আর তেমন মনেই পড়ে না। প্রথমেই তার পোষ্টিং হয় উদয়পুর কোর্টে। সেই থেকে এখানেই রয়ে গেছে হিমাদ্রি।

হিমাদ্রি চাকুরী পাবার পর প্রথম কয়েক বছর বাড়ি থেকেই অফিসে আসা যাওয়া করতো। এই যাওয়া - আসার পথেই একদিন মাধুরীব সঙ্গে দেখা পরিচয়। সুদর্শন, প্রগতিশীল, উদারমনা হিমাদ্রিকে মাধুরীর ভালো লেগে যায়। সেই ভালোলাগা, ভালোবাসা - প্রেম, প্রণয়, বিরহ অনুরাগ, মান-অভিমানের সিঁড়ি পেরিয়ে বিবাহে পরিণতি লাভ করতে বেশ সময় লেগে যায়। দুই বোনকে পাত্রস্থ, ভাইয়ের একটা নিশ্চিত চাকুরীর ব্যবস্থা করেই হিমাদ্রি একটু বেশী বয়সেই মাধুরীকে বিয়ে কবে। তারপর একদিন দুর্গা পূজার বোধন সন্ধ্যায় মাধুরীর কোল আলো করে জন্ম নেয় জুঁই। হিমাদ্রি যখন মেয়ের দিকে তাকায়, তার মনে হয়, স্বয়ং মা দুর্গা বুঝি তার ঘর আলো করে জন্ম নিয়েছে। মেয়েকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে হিমাদ্রি। যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, ততক্ষণ কিছুতেই মেয়েকে চোখেব আড়াল হতে দিতে চায় না হিমাদ্রি।

সেদিন প্রথম জজ সাহেবের কথায় রেগে গিয়ে মেয়ের গায়ে হাত তুলেছিল হিমাদ্রি। পরে সব কথা শোনার পর প্রকৃত সত্য অনুধাবন করে বড়ো অনুশোচনায় ভুগেছে

বেচারা। না বুঝে রাগের মাথায় অকারণে মেয়েকে শাসন করে ঠিক করেনি হিমাদ্রি। এমন কোমল স্নিগ্ধ ফুলের পাপড়ির মতো তার আদরের মেয়েটিকে মেরে — সকলের আড়ালে — অগোচরে সারা রাত কেঁদেছে হিমাদ্রি। সে রাতে দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি। এমনিতেই হিমাদ্রির মন বড় নরম, খুবই অনুভূতি প্রবণ।

সময় তার অচিন পাল উড়িয়ে অজানার পানে পাড়ি দেয়। বিশ্ব প্রকৃতি আপন প্রসাধনে ঋতুতে ঋতুতে নিজের রঙে নিজেই সজ্জিত হয়, তার জন্য কারো কাছে হাত বাড়াতে হয়না। কারো থেকে কোন ধারও নিতে হয় না। প্রকৃতি চিরনবীন, চির যৌবনা। মা যেমন সন্তানকে আপন স্তনের সুধা ধারায় শুধু পুষ্টি দেয় না, স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা অঝোর ধারায় বর্ষিত করে, বিশ্ব প্রকৃতিও অনন্তকাল ধরে তার সৃষ্টির প্রতিপালনে তাই করে চলেছে।

হিমাদ্রি মাধুরীর মতো স্ত্রী পেয়ে নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করে। মাধুরী অসাধারণ সুন্দরী, অসামান্যা রূপসী। তেজস্বিনী, দৃঢ়চেতা। সংস্কার মুক্তা। সুগৃহিনী। সুজননীও। মাধুরী জুঁইকে পাঁচ-ছয় বছর পর্যন্ত বুকেব দুধ দিয়েছে। জুঁইয়ের আব কোন ভাই-বোন না জন্মানোয়, জুঁই বড় হয়েও মায়ের দুধ খেত । মাধুরীও সোহাগভরে নিজের আদরের দুলালীকে পরমযত্নে স্তন্য পান করাতো। মুখে বলতো— এত বড় হয়েছিস, স্কুলে যাচ্ছিস, এখন তোর দুধ খেতে লজ্জা করে না ? মায়েব শুকনো স্তনেব বোঁটা চুষতে চুষতে জুঁই হাসতো। মাধুবী মেয়ের চুলে আদর করে বিলি কেটে দিত।

মাধুরী বলতো— যে শিশু মাতৃস্তন্যপানে বঞ্চিত, সে সত্যিই হতভাগ্য। যে সকল শিশু জন্মাবধি দীর্ঘকাল মাতৃদুগ্ধ পান কবে তাবা পবম ভাগ্যবান। এ সকল শিশু বড়োই অনুভূতি প্রবণ এবং স্নেহশীল হয়। তাদের মধ্যে শৈশব থেকেই প্রেম-ভালোবাসা ও মমত্ববোধ জাগ্রত হয়। স্তন দুগ্ধ দান কালে মা সন্তানকে শুধু মাতৃস্তন্যই পান করান না, মা একই সঙ্গে অবিরত ধারায় শিশু সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত করেন স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা। মাতৃস্তন্য ধারা পান করে যে শিশু বড় হয়েছে, সে তার পরিণত জীবনে কখনো অমানবিক ও নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে না। ক্রোধান্বিত অবস্থায় কখনো সন্তানকে বুকের দুধ দিতে নেই।

মাধুরী এই কথাগুলি কোন এক মন্দিরে এক মহাত্মা সাধুজীর কাছে শুনেছিল। জুঁই সবেমাত্র পেটে এসেছে। সেই সময় ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানাতে গিয়েছিল মাধুরী। সাধুজী তখন মা যশোদার কথা বলছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে মা যশোদা গভীর স্নেহে স্তন্যপান করাতেন। স্বয়ং ভগবান শিশু রূপে দুগ্ধ পান করছেন। যশোদা কি সেদিন জানতেন তিনি ভগবানকে দুগ্ধ পান করাচ্ছেন ? জানতেন না। পাঁচ বছর পর্যন্ত সব শিশুর মধ্যেই

ভগবান থাকেন। প্রত্যেক মায়েরই উচিত আপন সন্তান হলেও প্রতিটি শিশুকেই দেবতা রূপেই লালন ও পালন করা। সাধুজী আরো বলেছিলেন— ক্রুদ্ধ অবস্থায় শিশুকে স্তন্যপান করানো কখনোই উচিৎ নয়। ক্রুদ্ধা জননীর স্তনদুগ্ধ বিষবৎ। তা খেয়ে শিশুর মৃত্যুও হতে পারে। আর যে সকল প্রসূতি আপন সৌন্দর্য রক্ষায় আত্মজকে বুকের দুধ দিতে চায় না, পরিণামে সেই সকল মায়ের শিশুদের অধিকাংশই অমানুষ হয়। প্রসূতির ক্যান্সার ছাড়াও নানা দুরারোগ্য ব্যাধি হতে পারে। সাধুজী যখন এই উপদেশ দিচ্ছিলেন, মন্দিরে তখন আরো অনেক পুরুষ-মহিলা সেখানে সাধুজীর উপদেশ বাণী শ্রবণ করছিল। সাধুজীর কথা শুনে মাধুরী কেমন যেন আপ্লুত হয়ে যায়। এরপরই দুর্গাপূজার বোধনেব দিন তাদের ঘরে এলো জুঁই। জুঁইকে বুকের দুধ দেবার সময় মাধুরীর কেবলই সাধুজীর কথা মনে পড়ে যায়। আর জুঁইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মাধুরী ভাবে যে, মা উমা কি সত্যিই তার মেয়ের রূপে বোধনের দিন জন্ম নিল। তা যদি হয়, ভাবতে ভাবতে গভীর আবেগে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরত মাধুরী।

ছোট্ট জুঁই মায়ের কোলেই ঘুমায়। পাঁচ-ছয় বছর বয়স অবধি জুঁই মায়ের বুকের দুধ খেয়েছে। মেয়েকে দুগ্ধ পানেব সময় মাধুরীর হৃদয়ে এক অপূর্ব স্বর্গীয় অনুভূতির সৃষ্টি হয়। স্নেহ-সুধা অবিরল ধারায় মেয়ের উপর বর্ষিত হয়। মা ছাড়া আব কারো এমন অনুভূতি হয় না।

হিমাদ্রি একদিন ঠাট্টাকরে মাধুরীকে বলেছিল — মেয়ে বড় হয়েছে, এখনো তাকে বুকের দুধ দাও ? আড়াই বছরের পর শিশুকে বুকের দুধ দিলে নাকি মায়ের স্বাস্থ্য খারাপ হয়।

হিমাদ্রির কথা শুনে মাধুরীর খুব রাগ হয়েছিল। অভিমানী মাধুরী হিমাদ্রিকে বলেছিল — আমি আমার সন্তানকে বুকের দুধ দিই। তাতে কার কি এলো গেলো ? সেদিন টিভিতে দ্যাখোনি, একটা বানরের বাচ্চা কুকুরের দুধ খেয়ে বড়ো হচ্ছে। আরো তো একদিন দ্যাখেছ যে এক মানব শিশুও কুকুরের দুধ খাচ্ছে। মা কুকুরী মাতৃস্নেহেই মানব শিশুকে নিজের বুকের দুধ খাইয়ে বড় করেছে।

প্রসঙ্গতঃ সেদিনই প্রথম মাধুরী হিমাদ্রিকে সাধুজীব উপদেশের কাহিনীটি শুনিয়েছিল। সত্যিই তো, আজকালকার নারীরা নিজেদের সন্তান পালনেও পুরোপুরি ব্যর্থ। অথচ কুকুরের দুধ খেয়ে বড় হয়ে ওঠার মধ্যে মানব শিশু ও বানর শিশুর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এই মহান বিশ্ব প্রকৃতির অনন্ত উৎসে কত সহস্র রহস্য ও বিষয় যে লুকিয়ে আছে তা বলার নয়।

দু'টি পালক

বামপন্থী চিন্তা-চেতনা এই রাজ্যে একসময় সংস্কার মুক্তি ও গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা প্রসারের ক্ষেত্রে জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। সেই জোয়ারে হিমাদ্রিও ভেসে যায়। কত স্বপ্ন - কত আশা। এ দেশে জনজাগরণ ঘটবে, বিপ্লব সংঘটিত হবে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শোষণ-অবিচারের ঘটবে পরিসমাপ্তি। অতিক্রান্ত সময়ে কর্মচারী সংগঠনের অবিসংবাদিত নেতা হিমাদ্রি বুঝতে পারে এই সবই ফাঁকা বুলি। এ শুধু শুধুই মানুষকে বিভ্রান্ত করা। ক্ষমতার কুর্সিতে আসীন হবার এক ছদ্ম অপকৌশল মাত্র। কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলে — এ দেশের তথাকথিত বামপন্থীরা তাদের আপন স্বার্থই কায়েম করেছে। তখ্‌ত্‌ ইন তাউজে আসীন এই সকল মুখোশধারী বিল্পবীরাও নয়া কায়েমী স্বার্থের শিকার। বামপন্থী মুক্ত আন্দোলন ধারা যে মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির জন্ম দেবে ভাবা গিয়েছিল, তার কিছুই বাস্তবে রূপায়িত হলো না। ক্ষমতার অন্ধগর্বে ও মাদকতায় তারা তাদের চারপাশে যে রঙিন জগৎ দেখতে পাচ্ছে, কালিদাসের যক্ষের মতোই কর্তব্যে অবহেলার জন্য তাদেরও যেন সাধের অলকাপুরী থেকে ভ্রষ্ট হতে না হয়। সমাজতন্ত্রের আদি-স্বর্গলোক যে আজ ছারখার। এখানেও সর্বত্র ভাঙ্গনের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই সমস্ত নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে আদর্শের ফাঁকা বুলি আউড়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার মরীয়া চেষ্টা। ইতিহাস বলে সন্ত্রাস-অত্যাচার কখনো শেষ কথা বলে না। মেকী বামপন্থীদের চোখে এখন ছানি পড়েছে। তাই তারা স্পষ্ট দেয়াল লিখনও পড়তে পরে না। ইতিহাসের নির্মম পরিণতির জন্য শুধুই প্রতীক্ষা। কংসের কারাগারেই যে কংস নিসূদনের জন্ম। মানুষ যখন তার সংযম ও আত্মবোধ হারায়, তখনই মৃত্যুদূত তার হাত বাড়িয়ে দেয়।

তরুণ তুর্কী হিমাদ্রি জীবন ভর কোনদিন কোন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেনি। কোনো সামাজিক পাপ কোনদিন তার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারেনি। সত্যিকারের চেতানা সমৃদ্ধ সৎ নেতা-নেতৃর বড়োই অভাব। বাক সর্বস্ব দেউলিয়া রাজনীতির অবক্ষয় ঠেকানো কোনদিন সম্ভব নয়। সব দলেরই রাজনৈতিক নেতা-নেতৃদের বৃহত্তর অংশই নানা পাপ পঙ্কে ডুবে থেকে আত্মকলহে লিপ্ত হয়েও নতুন নতুন স্বার্থ সিদ্ধির বাসনায় রসুনের মতো কক্ষ তৈরী করে বেঁচে রয়েছে। তারা সবাই জানে, এই জায়গা ছেড়ে গেলে নতুন করে আর কোথাও শিকড় বিস্তার করা সম্ভব নয়। তাই অনাচারের পাপকুন্ডে ক্রিমি কীটের মতো বেঁচে থাকাটাই তারা শ্রেয় মনে করে।

অদূরে পত্রহীন শিমূল তরু। তার দিকে চেয়ে বিষন্নতায় ভরে ওঠে হিমাদ্রির মন। একটা গভীর যন্ত্রণা নিরন্তর দগ্ধ করতে থাকে অন্তঃকরণ। নিজের প্রতিই একটা অসহনীয় ঘৃণা জেগে ওঠে। হিমাদ্রির জীবনে কি এই প্রত্যাশাই ছিল ? তার জীবনের উচ্চ নীতি-

দু'টি পালক

আদর্শ পত্রহীন শিমূল তরুর মতোই একান্ত অসহায়-আশাহীন। পালাবার কোন পথ নেই। পালিয়ে যাবে কোথায়? পালাবেই বা কেন ? তাই হিমাদ্রিও ওই অন্ধ ক্রিমি-কীটের মাঝে লাফিয়ে পড়ে, তাদের মতোই দলাপাকিয়ে ঘৃণ্য বর্জ্য খেয়ে উঠতে - নামতে থাকে। হিমাদ্রির এক সময় মনে হয়, বিরোধ না করে আপোষ করেই চলাই তো ভালো। অন্ততঃ তাদের দলে টিকে থাকলে এবং দলের জো হুজুরী নির্দেশ মেনে তাঁবেদারী করে চললে কখনো বদলীও হবে না — আর সকলের উপর খবরদারি করার সেক্রেটারী পদটাও বহাল থাকবে। আত্ম সান্ত্বনার নানা চেষ্টা করেও হিমাদ্রির অন্তরের জ্বালা কিছুতেই নির্জলিত হয় না। জীবনে একদা যে স্বপ্ন সম্ভাবনার বীজ তৈরী হয়েছিল, যা দেখে অন্য অনেকের মতোই মিছিলে পা মিলিয়েছিল, আজ এই মধ্যবয়সে এসে হিমাদ্রির কেবলই মনে হয়, সবই আবর্জনা আর জঞ্জাল। আর সেই আবর্জনার অধিকার নিয়েই ভোজবাড়ির উচ্ছিষ্ট অন্নের জন্য নর্দমার জঞ্জাল স্তূপে সারমেয় দল যেমন নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করে। এখানেও তেমনি অসংখ্য-অদ্ভুত সব প্রাণী নিজেদের মধ্যে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অবিরাম লড়াই করে চলেছে। আবার এই গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের মধ্যেও যদি বাইরের কেউ এসে নতুন-করে দখল নিতে চায়, তখন সবাই তেঁড়ে - ফুঁড়ে একযোগে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং আক্রান্ত হলে প্রতি আক্রমণে যায়।

হিমাদ্রি স্পষ্ট দেখতে পায় এক আবর্জনার স্তূপে অসংখ্য ক্রিমি-কীট হাবু-ডুবু খাচ্ছে। এর মধ্যে তার মুখঅলা একটা জীবও কেমন হাবু-ডুবু খাচ্ছে। হিমাদ্রির মুখঅলা জীবটি প্রাণপণে উপরে উঠে আসতে চাইছে, কিন্তু সে যাতে উঠে আসতে না পারে সেজন্য আরো কয়েকটি চেনা-জানা পরিচিত মুখঅলা জীব হঠাৎই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে অন্ধকার পঙ্কে ডুবিয়ে দিল। প্রাণপণ চেষ্টায় হিমাদ্রি মার্কা জীবটি উপরে উঠে আসতে চায়, তার সঙ্গী মার্কা জীবগুলি আরো অধিক জোরে তাকে নীচের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আজ তার চিরচেনা বামপন্থী দলের মধ্যেও কি এই অন্ধ ক্রিমি-কীটের মতোই অনৈতিক খেলা চলছে না?

হঠাৎ এক সময় কোথা থেকে জুঁই এসে ঝুপ করে হিমাদ্রির কোলে বসে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলে — বাবা, তুমি এখানে বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে কি সব ভাবছ? আমি আরো দু'তিন বার তোমায় এসে দেখে গিয়েছি। তুমি আমায় দেখতেই পাওনি। তোমার কি হয়েছে বাবা ? বলবে আমাকে ?

হিমাদ্রি তার এই ছোট্ট আদরের মেয়েটিকে কিই বা বলবে। কিছুই যে বলার নেই। না রে মা, তেমন কিছু ভাবছিনা। ভাবছি তুই কবে বড় হবি।

দু'টি পালক

জুঁই — কেন ? আমি এখন ছোট নাকি ? সব সময় আমাকে ছোট ছোট বলে না তো। আমার ভাল্লাগে না। আমি এবার তো ফাইভে উঠবো। আমিতো রোজই বড় হচ্ছি। আর যারা বড়, তারা তো রোজই ছোট হয়ে যাচ্ছে। ছোটরাতো ঠিকই বড় হয়। বড়দের কি হয় বাবা ? — কথা কটি বলেই জুঁই বাবার গালে একটা চুমু খেয়ে আবার লাফাতে লাফাতে হরিণ শিশুর মতো কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়।

চমকে দিয়ে যায় হিমাদ্রিকে। হিমাদ্রি কি তবে ছোট হয়ে যাচ্ছে ? বড়রাতো সত্যিই আর বড় হয় না। একটা সময়ের পর তো তাদের ক্ষয় হতেই থাকে।

জন্মের নিরিখে সময় গননা করলে জীবন তো এগিয়েই যায়। আর মৃত্যুর বিচারে । থমকে যায় হিমাদ্রির ভাবনা। - তবে কি মৃত্যু দিনের বিচারে এক একটি মুহূর্ত জীবন তরুব ডালা হতে ঝরে ঝরে পড়ছে। তার এই ছোট্ট মেয়েটি এই বয়সে এমন আশ্চর্য একটি দার্শনিক প্রজ্ঞা কি করে লাভ করলো। কোথায় পেল সে মানব-জীবনের এই চিরন্তন দর্শন ?

অনেকক্ষণ আগেই শরতের নীলাকাশে কালো চুল এলিয়ে দিয়ে সন্ধ্যা কেশবতী কন্যার মতো বসুন্ধরাকে ঘিরে ধরেছে। তপোধীর দা একবার হিমাদ্রিকে ডেকে বের হয়ে গেছে। হয়তো তাঁর কোন টি.সি.এস সহকর্মীর বাড়িতে গেছে। হিমাদ্রি কেমন যেন মন মরা। মাধুবীও হিমাদ্রিকে চা খাবাব জন্য দু'বার ডেকে গেছে, তবু হিমাদ্রির এই অদ্ভুত স্থবিরতা কাটে না। জানালা দিয়ে বাইবে তাকিয়ে থাকে। রিক্ত শিমুল শাখায় একটা লক্ষ্মী পেঁচা ডেকে ওঠে। আজ আবাব সন্ধ্যা থেকেই লোড শেডিং। মাধুরী ঘরে মোমবাতি জ্বেলেছে। ঠাকুরের আসনের সামনে ধূপ-ধুনো জ্বেলে দিয়ে হিমাদ্রিকে আবার ডাক দিল।

মাধুরী — কি গো, তোমার কি হলো ? আমি তো জানতাম শকুন্তলা দুষ্মন্তের ধ্যানে মগ্ন ছিল বলে দুর্বাশার শাপও শুনতে পায়নি। তুমি কি কোন শকুন্তলাব ধ্যানে মগ্ন হলে নাকি ?

মাধুরীর খোঁচা খেয়ে হিমাদ্রি জোব পূর্বক তার দিবাস্বপ্নের ডালি গুটিয়ে নিয়ে বাথরুমে চলে যায়। চোখে-মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়ে দেহ-মনের সকল আবিলতা দূর করে দিতে চায়। মাধুরী ইতিমধ্যে গরম গরম চা ও জল খাবার ডাইনিং টেবিলে সাজিয়ে দিয়েছে। হিমাদ্রি এসে বসেই এককাপ চা তুলে নিয়ে চুমুক দেয়। হিমাদ্রির পাশের চেয়ারে এসে বসে মাধুরী। মাধুরী ও তুলে নিল এক কাপ চা। জুঁই ঘরে নেই। সম্ভবতঃ সিঁড়িতে বসে তিয়াষের সঙ্গে গল্প করছে। এখন শেষরাতের দিকে চাঁদ ওঠে। সামনে মহালয়া। এবার দুর্গাপূজা ও

দু'টি পালক

ঈদ কাছাকাছি সময়ে পড়েছে। মহালয়ার আর মাত্র চার-পাঁচ দিন বাকী। এর কিছুদিন পরেই শুরু পূজোর ছুটি ।

মাধুরী হিমাদ্রিকে ফের বলে — হঠাৎ তোমার আজ কি হোল? এমন চুপচাপ বসে আছ কেন? কি অত ভাবছো ?

হিমাদ্রি এবার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে — জানো, মাধু, যে নীতি-আদর্শের জন্য এতকাল লড়াই - আন্দোলন করলাম, আজ সবই কেমন যেন তাল-গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বায়ণের নিদারুণ শূন্যতা, সর্বগ্রাসী সভ্যতা, নানা বুর্জোয়া ব্যাধি আমাদেরও কেমন যেন চারদিক থেকে আক্রমণের লক্ষ্যে এক অদৃশ্য ব্যূহ রচনা করে চলেছে। বিশ্বায়ণ একটা মস্তবড়ো ধাঁধাঁ। আমি বিশ্বের হলাম, বিশ্ব আমার হলো না।

মাধুরী - তা, তো বুঝলাম। কিন্তু তোমার এতসব ভাবনার কারণ আমার বোধগম্য নয়।

হিমাদ্রি - জানো, পার্টির উপর মহল থেকে গোপন নির্দেশ এসেছে, এবার মাতাবাড়ি কেন্দ্রে 'সত্যদাকে' মনোনয়ন দেওয়া হবে না। তাঁর পরিবর্তে আগরতলার কোন এক 'কলেজের অধ্যাপক' কৃপাসিন্ধু হালদারকে বিধান সভার সম্ভাব্য প্রার্থী করে পাঠানো হচ্ছে। তিনি আবার পশ্চিম বাংলার পার্টির কোন এক বড় নেতার আত্মীয়-টাত্মীয় বলে শোনা যাচ্ছে। সত্য দা এলাকার দীর্ঘদিনের পোড়খাওয়া নেতা। ঘরের মানুষ। সৎ, একনিষ্ঠ কর্মী। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। অকৃতদার। অথচ সত্যদার পক্ষে একটি কথাও বলা যাবে না। কোনও প্রতিবাদ করার উপায় নেই। কিছু বললেই বিনা দোষে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেবে। দলের অভ্যন্তরে এমনই প্রবল আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারী মানসিকতা তীব্র হয়ে উঠেছে। দাম্ভিকতা, লোলুপতা, আত্ম সর্বস্ব ভোগবাদ, ভ্রষ্টাচার, অর্থলুট, দলীয় তহবিলের তছরূপ, নারী ঘটিত কেলেঙ্কারী, শিষ্টাচারহীন বাক্ সর্বস্বতা - কি নেই এই দলে। রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা এই পার্টির অঙ্গে অঙ্গে। তাই ভাবছি আর আপোষ করতে পারবো না। ধীরে ধীরে সরে আসবো। কোনোরকম প্রতিবাদ বা বিরোধিতা করে লাভ নেই। নিজেকে গুটিয়ে নেওয়াই ভালো। বছরের পর বছর এই আত্ম প্রবঞ্চনা আর কিছুতেই ভালো লাগে না। মেকী আদর্শের আতসবাজির খেলার দিন ফুরিয়ে আসছে। জনমনের অধিকার হরণ করে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় — তবে চিরকাল তা সম্ভব নয়। জনরোষে একদিন সাধের প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়বেই। আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, সেদিন আর দূরে নয়।

মাধুরী — এমন হতাশ হচ্ছো কেন ? একটা আদর্শকে এতকাল আঁকড়ে তো

বেঁচে আছ। বেনোজলের মতো যারা দলে এসেছে, বেনোজলের মতোই তারা একদিন ভেসে যাবে। সত্যিকারের আদর্শের পতাকা যারা বহন করতে পারবে না, তারা দল ছেড়ে চলে যাবে। আর প্রকৃত আদর্শবান সংগ্রামী কর্মী তার আপন আদর্শের ধ্বজা সব কিছুর উর্দ্ধে তুলে ধরবেই। অপেক্ষা কর। আমরা সবাই একটা বাঁকে দাঁড়িয়ে আছি। বাঁকটা ঘুরে গেলেই আসল রাস্তাটা পেয়ে যাবে। তুমি না নিজেকে স্বপ্নের ফেরিওয়ালা বলে বেড়াও। স্বপ্ন দেখা মানুষের মনে তো কোনদিন হতাশা জন্ম নিতে পারে না। মনে রেখো - এখন ক্রান্তিকাল। এই ক্রান্তিকাল অতিক্রম করলেই সামনেই আসল পথের সন্ধান মিলবেই। তখন যেদিকে যেতে চাও, সেদিকেই যেতে পারবে।

হিমাদ্রি — বাঁধন না ছিঁড়লে যে যাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "বাঁধন ছেড়ার সাধন হবে/ ছেড়ে যাব তীর মাভৈ রবে।" রাজনীতি এখন আর কোন আদর্শ নয়। রাজনীতি হলো এখন ব্যবসায়। রাজনীতি ব্যক্তি স্বার্থ সিদ্ধি এবং অর্থ রোজগারের এক আদর্শ পেশা। তিনিই রাজনীতির সার্থক বঁড়শীয়াল, যিনি শুধু ঘোলা জলে নন, নোনা জলেও মাছ ধরতে দক্ষ। আমরা ঘোলাজলের মাছ শিকারীদের কথাই কেবল বলি। কিন্তু মিঠা জলের মাছ শিকারীদের বাদ দেওয়া ঠিক নয়। তারাই যে আসল বাজিকর। এখন রাজনীতির নতুন কৌশল হল — মানুষকে অবিরত বিভ্রান্ত করে যাও, যাতে সে সত্য-মিথ্যা বুঝতে না পারে। এটা কি কোন আদর্শ বলে বিবেচিত হতে পারে ? এর জন্যে এত লড়াই-সংগ্রাম?

একটু চুপ করে হিমাদ্রি ফের বলে — মাধু একটা গান গাও না। বহুদিন তো হারমোনিয়ামটা এমনিই পড়ে আছে । তুমিও তো অনেকদিন কোন রেওয়াজই করছ না। তুমিও কি ভিতরে ভিতরে বদলে যাচ্ছ-মাধু? নন্দিতা বৌদি আর তুমি গান গাও। আমি আর তপোধীরদা আবৃত্তি করবো। জুঁই আর তিয়াষ গাইবে। তুমি সব জোগাড় করে নাও, আমি সবাইকে ডেকে আনছি।

ইতিমধ্যে কারেন্টও এসে গেছে। ঘরের ও রাস্তার আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে। অনেকক্ষণ পরে হিমাদ্রির মনের অন্ধকারও কেটে গেছে । ধনী সাগরের অপর পারেও লাইট পোষ্টে আলো জ্বলে উঠেছে। হিমাদ্রির মনে হয় — সাগরপারের কোন লাইট হাউজের বাতি। হিমাদ্রির আশ-পাশের আঁধারও কেটে যায়। দেখতে পায় এক দীর্ঘ আলোর পথ । হিমাদ্রি ভাবে, এই আলোর পথ ধরেই সে এগিয়ে যাবে।

হিমাদ্রি সবাইকে ডেকে নিয়ে আসে ! রবিবারের সন্ধ্যায় ধনী সাগরের পারে সরকারী ছোট আবাসে অনেক দিন পর রাগ-রাগিনীর আসর বসে। নন্দিতা ও মাধুরী —

দু'জনেরই অসাধারণ গানের গলা। দু'জনেই নানা অনুষ্ঠানে নিয়মিত গান গেয়ে থাকে। দু'জনেই একের পর এক গান গাইতে থাকে। কখনো একক গলায়, আবার কখনো বা দ্বৈতকণ্ঠে। তপোধীর দা ভালো তবলা বাজায়। হিমাদ্রিও শখ করে একটা গীটার কিনেছে। তবে হাতটা পাকা নয়। হিমাদ্রি তাই শ্রোতার আসরে। মাঝে মাঝে জুঁই আর তিয়াষও গেয়েছে কয়েকটি গান। গানের মধ্যে রবীন্দ্র সঙ্গীতেরই প্রাধান্য বেশী। জুঁইয়ের সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করেছে তিয়াষ।

হঠাৎ সন্ধ্যার এই গানের আসরে পাশের কোয়ার্টার ও বাড়ি-ঘরের প্রায় সবাই এসে হাজির। এসেছে মৌ ও তার মা। ঘরে জায়গা দিতে না পেরে বাইরের অঙ্গনে চাদর পেতে দেওয়া হয়। রাত এগারটা পর্যন্ত চলে গানের মজলিস। তারপর একসময় আসর ভঙ্গ হলে যে যার ঘরে চলে যায়।

দু'টি পালক



শৈশবের স্মৃতি বড় মধুর হয়। কষ্টের স্মৃতিও পরবর্তী কালে কেমন যেন ভালো লাগতে থাকে। মানুষ যদি সারাজীবন তার দুঃখ যন্ত্রণা, লাঞ্ছণা, বঞ্চনা, যাতনা অপমান নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তবে সে মানুষ যে কখনো সুখ, শান্তি, আনন্দ, ভালোবাসা, সোহাগ-প্রীতি, রাগ-অনুরাগ, আবেগ, উচ্ছ্বাস কিছুই অনুভব করতে পারবে না। জীবন ঝর্ণার মতো চিরকালই উপল বাধা কাটিয়ে মোহনার পানে ধাবিত হয়। উৎস কোনদিনই জানতে পারে না মোহনা কতদূর। আর মোহনা জানতেই চায় না উৎস কি। জীবন ও ঠিক এমনিতরো। শৈশবের কান্না-হাসি ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদানা, মান-অভিমান শিউলি ফুলের কুঁড়ির মতো সন্ধ্যায় ফুটে। আবার প্রভাতেই ঝরে পড়ে। শিশুমনের রঙ ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। ক্ষণে হাসি ক্ষণে কান্না, এই আড়ি - এই ভাব, এমনি ধারাই চলতে থাকে।

এই বিশাল মহাবিশ্বে, আমাদের নিত্যদিনের মানব-সংসারে কোন কিছুই যে স্থায়ী নয়। মহাকালের পারাবারে জীবন-মৃত্যুর বুদ্ধুদের খেলা চলছে। সমুদ্রের ঢেউ এর মতো, একটা ঢেউ আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা পেছন থেকে এসে জোর ধাক্কা

দেয় — আর একটা, আবার আর একটা উদ্বেলিত জীবনও তো এমনিই। স্থবিরতা তো মৃত্যু, চলাই তো সৌন্দর্য। চলা মানে শুধু এগিয়ে যাওয়া নয়। সমস্ত স্থবিরতা ভেঙ্গে জীবনের আস্বাদন লাভ। গান গাওয়া, ছবি আঁকা, কবিতা লেখা, নৃত্য করা, খেলাধূলো, অর্থাৎ যা মানুষকে আনন্দ দেয়, হৃদয় স্পন্দিত করে — এ সবই চলার অঙ্গ। কেবলমাত্র পায়ে হাঁটাকেই চলা বলেনা। যে মহতী ভাবনায় হৃদয় মন সতত স্পন্দিত হয়, তাকেই চলা বলে। শুয়ে থাকা, ঘুমিয়ে থাকা কিম্বা আলস্যে নিমজ্জিত থাকা বা ডুবে থাকা — এ সবই স্থবিরতা, সত্তার বিলোপ সাধনের নিগূঢ় পথ — অপরিণামদর্শী মৃত্যুর প্রবেশ দ্বার।

এবারের পূজোটা আশ্বিনে না পড়ে কার্তিকে পড়েছে। দেবী এবার নৌকায় আসবেন — আর গজে যাবেন। দেবী পুরাণে বিধৃত রয়েছে, ''গজেচ জলদা দেবী শষ্যপূর্ণা বসুন্ধরা। নৌকায়াং শষ্যবৃদ্ধি স্তথা জলম।''

তপোধীর দা বলেন --- জানো হিমাদ্রি, আমাদের দেশের শাস্ত্র কিন্তু মীথ্ মাত্র নয়। এব একটা অবয়ব আছে, বাস্তবতা আছে। হাজার হাজার বছর ধরে মহাপ্রাণ মুনি-ঋষিগণ নানা অভিজ্ঞতার দীর্ঘস্তর পার করেই প্রণয়ন করেছেন এই সব শাস্ত্ররাশি। মিথ্যা, অবাস্তব বলে একে এককথায উড়িয়ে দেওযা যাযনা। শাস্ত্রমতে দেবী দুর্গার যে বছর নৌকায় আগমন ঘটে, সে বছব প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, ফলে বন্যা দেখা দেয়। এবছরও প্রবল বন্যায় প্রচুব মানুষ মরেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিটে ছাড়া হয়েছে। দেবী বাপের বাড়ি থেকে শুধু নিয়ে যান না, কন্যারূপী বিশ্বময়ীর আগমনে পবিপূর্ণ হয়ে ওঠে শষ্য ভান্ডার। বন্যা হলে পলি পড়ে, অনুর্বর জমিও জলধারায় সিক্ত হয়ে উর্বরা হয়ে ওঠে। সোনার ফসলে ভরে যায় মাঠ। গজ বা হস্তী যেমন নীরবে হেলে-দুলে চলে, প্রকৃতিও ধীরে ধীরে শষ্য-শ্যামলা হয়ে ওঠে। দেবীর গজে আগমনের তাৎপর্যও কম নয়। দেখবে, এই বছর দেশে ভালো ফসল হবে। অবিশ্যি আমাদের দেশের একশ্রেণীর এক চক্ষু বিশিষ্ট পন্ডিতস্মন্য স্তাবক উমেদার আছেন, যারা এসব বিশ্বাস করেন না। অথচ শাস্ত্রবর্ণিত প্রাপ্ত সুফল নিজেদের ঝোলায় ভরে পরম আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন। এ এক ধরনের আত্ম বঞ্চনা। এর প্রকৃতই কোন ক্ষমা নেই।

তপোধীরদা এক সময় রাজ্যের প্রগতিশীল ছাত্র-রাজনীতির অন্যতম পুরোধা ছিলেন। দীর্ঘকাল বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। আজ যারা এ রাজ্যের উঁচুস্তরের নেতা-নেতৃ তাদের অনেকেই তপোধীরদার হাত ধরেই বামপন্থী রাজনীতির অঙ্গনে পা রেখেছে । হিমাদ্রি কলেজ জীবনে তপোধীরদারই ছায়া সঙ্গী ছিল। তিনিই একসময় হিমাদ্রির বন্ধু, দার্শনিক ও পথ নিদের্শক ছিলেন। হিমাদ্রির বামপন্থী রাজনীতির প্রতি দুর্বলতা

থাকলেও ছাত্র-জীবনে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ কোনদিন করেনি। তপোধীরদা নিজে রাজনীতি করলেও জোর করে কাউকেও রাজনীতিতে সামিল করতেন না। তপোধীরদার অসাধারণ মেধা, গভীর প্রজ্ঞা ও মনীষা তাঁকে কলেজের অধ্যাপক মহলেও যথেষ্ট পরিচিতি দিতে সমর্থ হয়েছিল। অন্যদিকে কলেজের ছাত্র-ছাত্রী মহলে তাঁর সম্পর্কে সকলেরই গভীর আগ্রহ ও আকর্ষণ জেগেছিল। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে এ রাজ্যে বামপন্থী আন্দোলন ক্রমশঃ নতুন করে বিস্তার লাভ করছিল। তখন এ রাজ্যে মূল্যবোধ ও আদর্শের টানেই রাজনীতি চলত। রাজনীতিতে নৈরাজ্য, দখলদারি, পরমত অসহিষ্ণুতা, হিংসা-প্রতিহিংসা, ব্যক্তি হত্যা এসবের আমদানি হয়নি। ষাটের দশকের শেষদিকে এবং সত্তরের দশকের শুরুতে এ রাজ্যেও নক্সাল আন্দোলন, সাহিত্যে হাংরি জেনারেশনের প্রাদুর্ভাব ঘটে। আর দুটো আন্দোলনই সত্তরের দশকের মাঝামাঝি এসে একই সময়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। এ এক আশ্চর্য সমাপতন। সাতাত্তর সালের পরই এ রাজ্যে ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ক্ষয় সাধন শুরু হয়। মিথ্যাচারের হাত ধরে নির্দিষ্ট এলাকায় ভীতিও সন্ত্রাস এবং এক সময় আধাফ্যাসিস্ত শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়। দলতন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক দক্ষতা তলানীতে ঠেকে। গণতন্ত্রের পরিবর্তে আধা ফ্যাসিস্ত দলতন্ত্র রাজ্যের সর্বত্রই রাজনীতির এক দুষিত বাতাবরণ সৃষ্টি করে। দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে অদূরেই ভাঙ্গনের ভ্রূকুটি পর্দায় কাঁপান সৃষ্টি করেছে।

তপোধীরদা হিমাদ্রিকে মাঝে মাঝে শুধু একটি কথাই বলতেন — হিমাদ্রি বিপ্লবী হওয়া সহজ নয়। চে গুয়েভারা পৃথিবীতে একজনই জন্মায়। মনে রেখো রোমন্টিক না হলে বিপ্লবী হওয়া যায় না। আমার চারপাশের অনেক সহযোদ্ধার চোখে যে অন্যকিছু দেখি। তপোধীরদা সেই অন্যকিছুর ব্যাখ্যা স্পষ্ট করে দেননি। — আজকের ক্ষমতা লোভীদের কি তপোধীর দা সেদিনও দেখতে পেরেছিলেন? হয়তো তাই।

তপোধীরকে নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই সংগ্রাম করে একদা এগিয়ে যেতে হয়েছিল। তপোধীরদের পরিবারটা বেশ বড়োই। ওরা ভাই - বোন নয়জন। বাবা, মা, ঠাকুমা। সবমিলিয়ে বারজন। দেশ ভাগের পববর্তী ত্রিপুরা রাজ্য। বনে-পাহাড়ে উদ্বাস্তুদের ঢল নেমেছে। নোয়াখালির বর্বরতম বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নির্মম নৃশংসতা ভুলে রাজার রাজ্যে মানুষ সবেমাত্র থিতু হতে চাইছে। ফেণী নদী তখনো এতবড় হয়নি। বর্ষায় জল প্লাবনে ভেসে যেত এপারের সব গ্রাম-জনপদ। ফেনী নদীর চরে হাঁটু সমান পলি পড়ত, সার গোবর ছাড়াই সেই পলি মাটিতে ফলতো সোনার ফসল। সেই ফসলের জৌলুষেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল এখানকার বিস্তীর্ণ এলাকা। এই অঞ্চলের সমস্ত বসতি মূলতঃ চারটি গ্রামকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। ছোটখিল, সাব্রুম মহকুমার সমৃদ্ধতম জনপদ। এই মহল্লার

দু'টি পালক

এক প্রান্তে বিকাশমান মহকুমা সদর, আরেক প্রান্তে পাহাড়ী জনপদ মনুঘাট। উত্তরে জলেফা, দক্ষিণে সদ্য স্বাধীন নতুন দেশ পাকিস্তান। ফেনী সীমান্ত নদী। এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষদের সবচেয়ে বড় এবং একমাত্র ব্যবসায়িক কেন্দ্র ছিল মহকুমার সবচেয়ে সমৃদ্ধতম এবং প্রাচীনতম বানিজ্যিক কেন্দ্র, রানীগঞ্জ বাজার। শৈশবে এই বাজারটির অসাধারণ সমৃদ্ধি ও গরিমা তপোধীর দেখেছিল। আজ আর তার কিছুই নেই। একদা এই বাজারে নদী পথে চট্টগ্রাম ও ফেনী শহর থেকে বড় বড় স্ট্রীমারও আসা-যাওয়া করত। দেশ ভাগই দুইপাড়ের মানুষেরই জীবনে বয়ে এনেছে এক তীব্র অভিশাপ। বিধাতার রুদ্ররোষেই হারিয়ে গেল ফেনী নদীর নাব্যতা। স্ট্রীমার, পালতোলা নৌকা এখন আর চলতেই পারেনা। নদীতে এখন ডিঙ্গি নৌকাও আর আসে না। ছেড়ে দিলে বড় জোর কাগজের নৌকা ভেসে বেড়াতে পারে। বড় নৌকা এনদীতে আর কোন দিন দেখা যাবে না।

তপোধীর তখন ছোট। আট/নয় বছর বয়স। সে সময় এক ফাগুন রাতে বাজারে আগুন লাগে। তপোধীর সেদিন তার মামার বাড়িতে গিয়েছিল। মামার বাড়িও কাছাকাছি। সেদিন তার মামার বাড়িতে 'হরিরলুট' উৎসব চলছিল। এমন সময় বাজারে আগুন লাগার খবর আসে। কৌতুহল বশতঃ তপোধীর ও দৌড়ে আসে। এসে দেখে তাদের দোকানই জ্বলছে । তপোধীর চীৎকার করে কেঁদে কেঁদে উপস্থিত লোকজনদের আগুন নেভানোর জন্য অনুবোধ করেছিল। কেউ শোনেনি। এখানকার মতো তখনকার সময়ে ফায়ার ব্রিগেড ছিল না। দোকানের পাশেই ছিল একটা জলাশয়। ইচ্ছে করলে হয়তো আগুন নেভানো যেত। তপোধীরদের বাড় বাড়ন্তকে গ্রামের কিছু লোকজন ঈর্ষা করতো। তারা ভেবেছিল তাদের দোকান ঘর পুড়েই আগুন নিভে যাবে। কিন্তু অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিধাতা পুরুষ তখন মুচকি হাসছিলেন। তপোধীরদের দোকান ঘর না নেভানোর ফল স্বরূপ মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা সমস্ত বাজারকে গ্রাস করে ফেলে। সেই প্রলয়ংকরী বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে বাজারের কয়েকশত ছোটবড় দোকান ঘর বামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বাজারের একেবারে পশ্চিম সীমান্তে শুধু মাত্র ইব্রাহিম সদাগরের দোকান ঘরটি কোন মতে রক্ষা পায়। সেই রাতেই বিধাতা পুরুষের রুদ্ররোষে রানীগঞ্জ বাজারের পতন শুরু হয়। অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায় চৈতন্য সাধুর অভিশাপ ও ভবিষ্যৎ বাণী।

রাণীগঞ্জ বাজারে হঠাৎই কোথা থেকে উদয় হয় চৈতন্য সাধুর। মাথায় জটা, পরনে নেংটি। গাঁজা খায়। শিঙা ফুঁকে - বম্ বম্ - ভোলানাথ বলে রাতে-দিনে অন্ততঃ পঞ্চাশবার হাঁক পাড়ে। দোকানে দোকানে গিয়ে দু'পয়সা ভিখ্ মাগে। সব দোকানে যায় না। যেদিন যে দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, সেদিন সে দোকনে বিক্রি বেশী হয়। লাভও হয় দ্বিগুণ। ফলে চৈতন্য সাধুর ইজ্জত ও কদর বেড়ে যায়। বাজারের মধ্যেই আছে পূজামণ্ডপ।

দামোদর বাড়ি। পূজারী লোকেশ ঠাকুর। চৈতন্য সাধুর আগমনে দামোদর বাড়িতে ভীড় কমে যায়। দক্ষিণাও কম পড়তে থাকে। একদিন লোকেশ ঠাকুর এলাকার কয়েকজন দুর্বৃত্ত শ্রেণীর লোককে দিয়ে একদিন গভীর রাতে চৈতন্য সাধুকে প্রচন্ড মারধোর করে বাজার থেকে বের করে দেয় এবং সাধুর ছোট্ট আখড়ায় আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

সাধু বাজারে দাঁড়িয়ে শিঙাফুঁকে কমন্ডুলু থেকে জল নিয়ে তিনবার বম্ বম্ - ভোলানাথ বলে উচ্চারণ করেছিল কঠিনতম অভিশাপ বাণী। সাধু বলেছিল — আমি আজ অভিশাপ দিচ্ছি, যে ভাবে আগুন দিয়ে আমার ঘর তোরা পুড়ে দিয়েছিস — সাতদিনের মধ্যেই এই বাজারও তেমনি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। বাজার ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত আমি জলেফার শংকর টিলায় অবস্থান করবো। বলেই চৈতন্য সাধু চলে যান। পরদিন বাজারে এই নিয়ে জোর কানাগুঁসো চলতে থাকে। ইব্রাহিম সদাগর সহ কয়েকজন গ্রামবাসী সাধুকে আনার জন্য লোক পাঠিয়েছিল। সাধুজী আসেন নি। শোন যায়, যে তিন জন সাধুকে মারধোর করেছিল — বাজারে আগুন লাগার আগে তাদের বাড়িও পুড়ে যায়। বাজারে আগুন লাগার ফলে দামোদর বাড়ি এবং লোকেশ ঠাকুরের বাড়ি সহ আশপাশের ঘর-বাড়িও পুড়ে যায়। এই ঘটনার পর অত্রাঞ্চলে চৈতন্য সাধুকে আর কেউ কোনদিন দেখতে পায়নি।

শৈশবের কত কথাই না মনে পড়ে তপোধীরের। এখনকার কালের শিশুদের শৈশব বলে কিছুই নেই। শৈশবহীন জীবন মাত্রই এক নিরালম্ব শূন্যতা। বানীগঞ্জ বাজারে তখন অনেক গলি ছিল। প্রতিটি গলির দুই পাশে সারিবদ্ধ একের পর এক দোকান ঘর। এ বাজারকে বর্তমান উদয়পুর বা আগরতলা শহরের একটা মিনি সংস্করণ বলা যেতে পারে। এখানকার মতো নামী-দামী বৈচিত্র্যময় মিষ্টির তেমন প্রচলন ছিল না। তবে রসগোল্লা, জিলিপি, চমচম, লবঙ্গ, নিমকিব পাশাপাশি বিক্রি হতো - খাজা-গজা, মন্ডা, চিনি পাকানো মটর দানা, খড়ম বিস্কুট, মুড়ির মোয়া ইত্যাদি। শীতকালে পিঠা-পুলিও বিক্রি হতো। ছোলা ভাজা, বাদাম ভাজা, চিড়ের নাড়ু, নারকেলের নাড়ু, খেজুর নাড়ু, খেজুরের লালী সেদিনের গ্রামের মানুষের কাছে এসবেরই বড়ো কদর ছিল। বাবা সপ্তাহের বাজার দিনে একআনা পয়সা দিতো তপোধীরকে। এখানে সপ্তাহে দু'দিন হাট বার। সোম ও বৃহস্পতিবার, বাবার দেওয়া এক আনা পয়সা দিয়ে খাজা-গজা এ সবই কিনত তপোধীর। তারপর খেতে খেতে বাড়ি চলে যেত। অল্প কিছু থাকলে ছোট বোনকে দিত। তখনকার গ্রামীন জীবনে বাড়িতে তিনবেলা ভাত খাওয়ার চল ছিল। তার বাইরে বিশেষ কোন খাবার তৈরী হতো না। তবে সাংবাৎসরিক উৎসব যেমন চৈত্র সংক্রান্তি, মনসাপূজা, হান্নারব্রত, পৌষ পার্বণের মতো অনুষ্ঠানে চিড়া-মুড়ি, পিঠে-পুলি এসব তৈরী হোত। সে সব খেতে কত আনন্দ যে হতো

তা কিছুতেই ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। না পাওয়ার জগৎটা অবশ্যই বড়ো ছিল। কিন্তু না-পাওয়া জগৎ এবং না - দেখা জগতে তো কোন ফারাক নেই। পাওয়ার তালিকা ছিল একান্তই সীমিত। তবু এই স্বল্প প্রাপ্তির মধ্যে যে অপরিমেয় তৃপ্তি তার যেন আর কোন তুলনাই হয় না। মুড়ির মোয়া কিনে সেই হাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়া, ভাবাই যায় না আজকাল। চিরচেনা সেই জগৎটা হারিয়ে গেছে ঠিকই, তবু তার স্মৃতি যে এখনো তেমনি সতেজ, অমলিন। স্মৃতি শুধু দুঃখের নয়, আনন্দেরও। তবে বিষণ্ণতা স্মৃতির চিরন্তন স্বরূপ।

আশ্বিন মাসে পারুলদি, কানন, মল্লিকা, নিতাই, কেশব সহ তপোধীর ফুল কুড়াতে বহুদূর চলে যেত। সে সময় আশ্বিন মাস থেকেই জমিয়ে শীত পড়ত। তবে দুর্গা পূজার সময় শীতের একটা মিষ্টি আমেজ ছিল। সেই মিষ্টি শীতের কুয়াশা মোড়া শিশির ঝরা প্রত্যূষে ফুল কুড়ানোর আনন্দই যে আলাদা। মোটামুটি সারা বছরই তারা ক'জন ফুল কুড়াতে যেতো। সকলের বাড়িতেই গৃহ দেবতার পূজো হয়। সব বাড়িতেই দু'চারটে ফুল গাছ ছিল। তবে ঝরা শিউলিতে যখন সাজি ভরে যেত - এক বিমল আনন্দে মন পরিপূর্ণ হয় উঠত।

তিয়াষ, জুঁই, মৌ — মাঝে মাঝে ফুল কুড়াতে যায়। তারা যখন সাজি ভরে ফুল নিয়ে আসে, তা দেখে তপোধীরেব শৈশব স্মৃতি মনের কোণে উঁকি দিয়ে যায়। ফেলে আসা দিনের কথা ভেবে ভেবে অনেক সময় তপোধীর নস্টালজিক হয়ে ওঠে।

ব্রজেন্দ্রনগর স্কুল। প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এই স্কুলেই তপোধীর পড়াশুনা করেছে। সেই স্কুলকে ঘিরেই তপোধীরেব সামগ্রিক জীবনেব বিস্তার। তবে ভিত্তিভূমি এই স্কুলই তৈরী করে দিয়েছে । স্কুলের একটু পরেই নন্দী বাড়ি। এই নন্দী বাড়ির সামনেই তাদের নিজস্ব একটা সুন্দর ফুলের বাগান ছিল। সেই বাগানে বিশাল বিশাল ছাতার মত দু'টি টগর ফুলের গাছ। গাছ দুটিতে সারা বছরই অসংখ্য সাদা সাদা টগর ফুটে থাকত। নানা জাতের নানা রঙের জবা, কয়েক জাতের করবী, গোলাপ, কুন্দ, শিউলি ফুলের গাছ। সব ঋতুর ফুলই ছিল তাদের বাগানে। তবে তারা বাগানে কাউকে ঢুকতে দিত না। বললে তারা নিজেরাই দু'চারটে ফুল পেড়ে দিত। তাও সব সময় দিত না । তবে কর্তাদের বাগানেও তেমনি অসংখ্য জাতের ফুল গাছও ছিল। এখানে অধিকন্তু বড়ো বড়ো বেশ কয়েকটি বকুল, চাঁপা ও নাগকেশরের গাছও ছিল।

দুর্গা পূজাব সময় দৌলবাড়িতে জয়দেব মামাদের পুকুর থেকে পদ্মফুল আনতে যেতো তপোধীর। তাবা অবিশ্যি পদ্মফুল দিতে চাইতো না। ফুল থেকেও তাদের বেশী

লক্ষ্য ছিল পদ্মবীজ।ছোলা-বাদামের মতো পদ্ম ফুলের বীজ ভেজে খাওয়া যায়। তাই তারা পদ্মফুল ছিঁড়ত না। তবে তপোধীর গেলে দশ-বিশটা পদ্মফুল অনিচ্ছা সত্বেও তারা দিত। কয়েকবছর আগে তপোধীর একবার জয়দেব মামাদের বাড়ি গিয়েছিল। ততদিনে জয়দেব মামা গত হয়েছেন। জয়দেব মামা ভেকধারী বৈষ্ণব ছিলেন। সারাবছরই লালকাপড় পরতেন। তপোধীর গিয়ে দেখে তাদের সেই পদ্মফুলের দীঘিটি নেই। সেইটি ভবাট করে ধান জমি তৈরী করা হয়েছে। মানুষ বড়ো হিসেবী। সেজন্য পদ্মফুল খেয়ে বা পদ্মবীজ খেয়ে তারা বাঁচবে না। বেঁচে থাকার জন্য চাই ধান জমি। মানুষের সীমাহীন লোভেব কারণেই প্রকৃতি ক্রমশঃ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এই বিশ্ব প্রকৃতির উপর মানুষ তাব নিজের মতো করেই সর্বত্র প্রভুত্ব বিস্তার কবে চলেছে। মানুষ তার লোভাতুর কালো রোমশ হাত জল, স্থল, আকাশ, ভূগর্ভ সর্বত্রই বাড়িয়েই দিয়েছে। আর এই মহাবিশ্ব প্রকৃতি মানুষের একচেটিয়া প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ক্রমশঃ ক্রুদ্ধ নাগিনীব মতো ফোঁসে উঠছে । সর্বব্যপ্ত দুষণেব ফলে প্রকৃতির অন্তরে অন্তরে শুধুই অব্যক্ত যন্ত্রণা। মা যেমন আপন সন্তান হারানো বিয়োগ ব্যথায় আকুল, প্রকৃতিও তেমনি তাব বুকের ধন হারিয়ে ব্যথিত, ব্যাকুল। আততায়ী মাযের বুক থেকে তার সন্তানকে কেড়ে নিলে প্রতিশোধের জন্য মা যেমন মবীযা হয়ে ওঠে তেমনি মাতৃস্বরূপা বিশ্বজননীও ক্রোধে কম্পমান। সযত্নে লালিত সন্তান সম বত্ন ও খনিজ ভাণ্ডার আজ প্রায় নিঃশোষিত। বিশ্ব প্রকৃতির বুক আজ রিক্ত - শূন্য। স্তন্যধারা সম প্রাণধারণের সুপেয় জলধারাও ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। সভ্যতার বুকে নেমে আসছে প্রকৃতির নির্মম প্রতিশোধ। অসুর বিনাশিনী দেবী দুর্গার মতো প্রকৃতি জননীও সভ্যতাবিনাশী দানবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণা। লীলাময়ী প্রকৃতির প্রতিশোধ দুর্বার গতিতে নেমে আসছে, তাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বামনরূপী মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। জল, আলো, হাওয়া, ফল, ফুল, শষ্যকণা —- জীব জগতেব বাঁচার সব উপাদানই তো জননী বসুন্ধরার দান। এ যে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার, নিঃশেষ হয়না কোনদিন। কিন্তু মানুষ যে এত পেয়েও তৃপ্ত নয়। সীমাহীন লোভ তার অতৃপ্তিকে সহস্রগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রকৃতিব সুধাভান্ডার লুট করে মানুষ অমবত্ব লাভ কবতে চায়। বিশ্ব প্রকৃতিকে যেভাবে মন্থন করে চলছে একালের সুরা-সুরের দল, কালরূপী বাসুকি নাগের মতো প্রকৃতিও মহাক্রোধে অবিরত গরল উদ্গীরণ করে চলেছে। আজ কিন্তু সেই ভয়ংকর মহাকালকূট কণ্ঠে ধারণ করার মতো দেবাদিদেব নীলকণ্ঠ যে নেই।

বার্ষিক পরীক্ষা শেষে ফি বছরের মতো পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যাশা মতোই তিয়াষ রেকর্ড পরিমাণ মার্কস পেয়ে প্রথম হয়ে সপ্তম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। জুঁই ও যথারীতি পঞ্চম শ্রেণীতে। জুঁইও প্রথম হয়েছে। জজ সাহেবের মেয়ে নীতা পাশ করলেও

প্রথম দশজনের মধ্যে উঠে আসতে পারেনি। মৌ ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠেছে। সে অনেকটা এগিয়ে এবার তৃতীয় হয়েছে। মৌয়ের এই রেজাল্টের পুরো কৃতিত্বই কিন্তু তিয়াষের।

জজ সাহেব শশধর শিকদার মহোদয় তাঁর মেয়ের খারাপ ফল করার দায়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের উপর প্রচুর হম্বি-তম্বি করেন। ফলে স্কুলের মাষ্টার মশাইরা অপমানিত বোধ করেন এবং জজ সাহেবের এই রূপ ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উদয়পুরের শিক্ষক-কর্মচারী মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সারা শহর উত্তাল হয়ে ওঠে। প্রবল জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত জজ সাহেব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এর কিছুদিন পরই জজ সাহেবকে প্রত্যন্ত সাব্রুম মহকুমায় বদলী করে দেওয়া হয়। এরপর অবিশ্যি তিনি সপরিবারে সাব্রুম চলে যান। তাদের যাবার আগে নীতার সঙ্গে জুঁইয়ের আর দেখাও হয়নি, কথাও হয়নি। তবে জজ সাহেব যাবার আগে একদিন সস্ত্রীক হিমাদ্রিদের বাসায় আসেন। জুঁইয়ের জন্য মিষ্টি ও উপহার নিয়ে আসেন। নিজের মেয়ের আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

জুঁই এসে তাঁদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। তাঁরা দু'জনেই তাকে আশীর্বাদ করেন। জজ সাহেব পরে জেনেছিলেন যে হিমাদ্রি তাঁর তিরস্কার শুনে বাড়ি এসে মেয়েকে প্রহার করেছিলেন। প্রকৃত ঘটনা জেনে তাঁর অনুশোচনাও হয়। তিনি পরে জানেন যে তাঁর মেয়ে নীতারই অপরাধ বেশী ছিল। বিশেষতঃ ফল প্রকাশের পর জজ সাহেব জেনে যান যে জুঁই পড়াশুনোয় সত্যিই ভালো। জজ সাহেব সস্ত্রীক হিমাদ্রির বাড়ি এলেও সঙ্গে তাঁদের মেয়েকে নিয়ে তাঁরা আসেননি। নীতাও লজ্জায় আসতে চায়নি। বাবা-মায়ের ভুল শাসনে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে নানা অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দেয়। অনেক বিকৃতিও পরিলক্ষিত হয়। সুস্থ সমাজ বিকাশের স্বার্থে যা আদৌ কাম্য নয়। তাই শৈশবেই শিশুদের আদর্শ শিক্ষা দান করা উচিৎ এবং ত্রুটি বিচ্যুতি গুলি দেখিয়ে বুঝিয়ে সঠিক পথ চলা এবং শিষ্টাচার অর্জনে সহায়তা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

দু'টি পালক



সময় তার চেনা পাল উড়িয়ে তর তর করে সময় সাগর পার হয়ে যায়। হঠাৎ এরই মধ্যে তপোধীরকে সোনামুড়া মহকুমার এস.ডি.ও পদে বদলী করে দেওয়া হয়। সরকারী নির্দেশ নামা জারীর দশদিনের মধ্যেই তপোধীরকে তার নতুন পদে যোগ দিতে হয়।

তিয়াষ দেখতে খুবই সৌম্যদর্শন। গায়ের রঙ কালোও নয়, ফরসাও নয়। বেশী ফরসা কার্তিক মার্কা ছেলেদের দেখতে তেমন ভালো লাগেনা। মেয়েদেব ফরসা হলে দেখতে যেমন ভালো লাগে, ছেলেদের তেমনি আলো-ছায়ার মধ্যবর্তী আদলটাই মানায় ভালো। তিয়াষের বাবার মতোই তার লম্বাটে গড়ন। প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত চেহাবা। গভীর কালো আঁখির তারায় দূরতর প্রত্যাশা বিকশিত। তার চোখের সীমানায় এক রহস্যময় জগৎ নিত্য খেলা করে, আড়ালে-আবড়ালে তাকে যেন কোন রহস্যময়ী কিশোরীব মত হাতছানি দিয়ে ডাকে। সেই অস্ফুট জগৎ যে অধরা থেকে যায় তিয়াষের।

তিয়াষ স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক সকলেরই বড়ো প্রিয়। সবাই তাকে ভালোবাসে, স্নেহ করে। কারণে-অকারণে ডেকে নিয়ে আদর করে। মাষ্টাব মশাইবাও কখনো কখনো আদর করে তাদের বাড়িও ডেকে নিয়ে যায়। তিয়াষের গানের গলা ভারী মিষ্টি। অনেক মাষ্টার মশাই তাকে গান শোনার জন্য তাঁদের বাড়ি নিয়ে যায়। জগতে কিছু মানুষ-জন আছে, যাঁদের দেখলে হঠাৎই কেমন ভালো লেগে যায়। তিয়াষকে দেখেও তেমনি সকলেরই ভালো লাগে। জীবন বিজ্ঞানের মৌলি দিদিমণি ক্লাশে ঢুকেই একবার তিয়াষের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আদর কবে যাবে।

মৌলি দিদিমণির জীবনটা বড়ো ট্র্যাজিক। দিদিমণির হাজব্যান্ড ছিলেন একজন ডাক্তার। তাঁদের একমাত্র ছেলে ঋভু। আগরতলার শিশুবিহার স্কুলে পড়ত। অনেকটা তিয়াষের বয়সী। দারুন ট্যালেন্টেড ছেলে। নতুন গাড়ি কিনেছেন ডাঃ মনীশ মিত্র। স্ত্রী ও

ছেলে সহ নিজেই ড্রাইভ করে উদয়পুর আসছিলেন। শেখেরকোটের কাছে কমান্ডার জীপ ও অলটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে দিদিমণি তাঁর স্বামী ও একমাত্র পুত্রকে চিরদিনের জন্য হারান। দিদিমণিকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় জি.বি. হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনদিন পর জ্ঞান ফেরে। কিছুটা সুস্থ হবার পর এক সময় নিজের দুরাদৃষ্টের কথা তিনি জানতে পারেন। মৃতের পরিবারের উত্তরাধিকারী রূপে স্বামীর চাকুরী পেয়ে যান। সেই থেকে এখানেই চাকুরী করছেন। দিদিমণি টুকটুকে ফরসা। সব সময় তিনি নিজেকে সাদা পোষাকে আবৃত রাখতে ভালোবাসেন। বৈধব্যের যন্ত্রণাকে আভরণহীন আবরণে ঢেকে রাখতে কোন সংকোচ নেই তাঁর। কোন ছদ্ম বৈরাগ্য নয়, শ্বেত-শুভ্র পোষাক পরেই যেন তিনি বিশ্ব বিধাতার বিরুদ্ধে সারাক্ষণই নীরব প্রতিবাদ করে চলেছেন। দিদিমণিকে দেখলে তিয়াষের মনে হয়, স্বর্গের কোন দেবী বুঝি শাপভ্রষ্টা হয়ে মর্ত্যধামে জন্ম নিয়েছেন।

তিযাষকে দেখার পরই তাঁর মধ্যে বহুদিন পর আবার অপত্য স্নেহ জেগে ওঠে। তিনি তিয়াষের মধ্যে যেন ঋভুকে খুঁজে পান। প্রথম ক্লাশে ঢুকেই সব ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে দিদিমণি পরিচিত হন। ক্লাশ শেষে তিনি তিয়াষকে ডেকে নেন। তাকে বলেন — তোমরা কোথায় থাক ? বাবা কি করেন? মা কি করেন?

তিয়াষ দিদিমণিব সব প্রশ্নেব উত্তব দেয। সেই থেকে দিদিমণি স্কুলে এসেই একবার তিয়াষকে দেখতে চায। দিদিমণিব পড়ানোব স্টাইল খুবই সুন্দর। স্কুলের সব ছাত্র-ছাত্রীই দিদিমণিকে যেমন শ্রদ্ধা কবে, তেমনি ভালোও বাসে। তিয়াষ কোন কারণে স্কুলে না এলে তিনি তিয়াষদের বাড়ি চলে আসেন। তিযাষদের বাড়িতে যাবাব সময় দিদিমণি তিয়াষের জন্য একটা না একটা কিছু নেবেনই।

একদিন তপোধীর দিদিমণিকে বললেন -- ম্যাডাম, কোন কিছু না দিলেই নয়? সব সময় দেওয়া ঠিক নয়।

দিদিমণি তপোধীরের কথার কোন প্রতিবাদ না করে, একেবারে কেঁদেই ফেললেন। অপ্রতিভ তপোধীর এরপর আর কোনদিন দিদিমণিকে বারণ করেন নি। নিজে মনে মনে বেশ লজ্জিতও হয় তপোধীর। অপত্য স্নেহ যে বিশ্বজনীন। পরিপূর্ণ মাতৃ স্নেহ ধারায় স্নাত যে রমণী, তিনিই সত্যিকারের ধাত্রী-জননী। তপোধীর দিদিমণির মনোবেদনা হৃদয়াঙ্গম করতে পেরেছিল। এরপর সে আর কোনদিন এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেনি। নন্দিতাকেও এই ব্যাপারে কোন কথা বলতে বারণ করে দেওয়া হয়েছিল। মৌলি দিদিমণিও একদিন ধীরে ধীরে তাদের সংসারের একজন হয়ে উঠেছিলেন।

বিদ্যালয়ের ইংরেজী শিক্ষক শৈলেশ বাবু কড়া ধাচের মানুষ। সব ছাত্র-ছাত্রীই

খুবই ভয় করে শৈলেশ বাবুকে। পারতপক্ষে কোন ছাত্র-ছাত্রীই শৈলেশ বাবুর ছায়াও মাড়াতে চায়না। সেই শৈলেশ বাবুও কিন্তু তিয়াষকে খুবই স্নেহ করে। তাঁদের বাড়িতে তিয়াষের অবাধ যাতায়াত। শৈলেশ বাবুর দুই মেয়ে— মিলি ও লিলি। বড় মেয়ে লিলি কলেজে পড়ে, ছোট মেয়ে মিলি নবম শ্রেণীর ছাত্রী। তিয়াষকে তারা দু'বোন খুব ভালবাসে। তবে তিয়াষ লক্ষ্য করেছে মিলিদি তার চোখ দিয়ে যেন তাকে কিছু একটা বলতে চায়। তার চাউনি কেমন যেন অন্যরকম। তিয়াষ মিলিদের বাড়ি গেলে মিলিদি একেবারে তিয়াষের কাছে ঘেঁষে বসবে। তিয়াষ মিলিদির এই আচরণকে ভালো চোখে দেখেনা। বড়ো অস্বস্তি হয় তিয়াষের। বাড়ির লোকজন দেখেও কিছু বলেনা বলে তিয়াষের অস্বস্তি আরো বেড়ে যায়। এটা লক্ষ্য করেই তিয়াষ মিলিদের বাড়ি যাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। গেলেও মিলির মায়ের সঙ্গে দু'চারটা কথা বলে তাড়াতাড়িই ফিরে আসে। মিলি টের পেলে তিয়াষের পথ আগলে রাখে। জোর করে ঘরে নিয়ে যায়। এটা ওটা এনে খেতে দেয়।

মিলিদি শাড়ী পরে স্কুলে যায়। বেশ সাজ-গোজ করে থাকতে ভালোবাসে। চোখে সুন্দর করে কাজল টানে। কপালে ছোট টিপ। হাঁটু সমান লম্বা চুল। লাল ফিতে দিয়ে জোড়া বেনী দুলিয়ে যখন চলে, বেশ ভালোই লাগে মিলিদিকে দেখতে। মিলিদির মুখটা গোল। ঈষৎ মোটা, বেঁটে গড়ন। চোখের তাবা দুটি গভীর কালো। মিলিদি স্কুলে গিয়েও দুই-তিনবার তিয়াষের খোঁজ করবেই।

কয়েকদিন তাদের বাড়ি না গেলেই মিলি তিয়াষকে বলবে - এই তিয়াষ, অনেকদিন আমাদের বাড়ি যাস্‌নি কেন রে ? মা তোকে আজ একবার অবশ্যই যেতে বলেছে। বিকেলে একবার অবশ্যই আসবি। না হলে মা' খুবই বাগ করবে।

মিলির মাকে তিয়াষ জেঠিমণি বলেই ডাকে। তিয়াষ জানে এটা জেঠিমণিব অনুরোধ নয়। এটা মিলিদির নিজেবই কথা। তিযাষ মিলিদেব বাড়ি গেলে মিলি তিয়াষেব সঙ্গে সারাক্ষণ নানা খুনসুটি করবে। তিযাষকে নানাভাবে উত্যক্ত করাই মিলিব আসল উদ্দেশ্য। মিলি তিয়াষের সামনে বসেই একবার চুল খোঁপা করে বাঁধবে, আবার সমস্ত চুল এলিয়ে দেবে। কি এক অস্বাভাবিক অস্থিরতা দেখা দেয় মিলিদির মধ্যে। কখনো কখনো আড়চোখে তিয়াষের দিকে চায়, আবার একেবারে কাছে ঘেঁসে বসে। একবার শাড়ী পরে এলো তো, পরক্ষণেই পরনে শালোয়ার কামিজ বা চুড়িদার। তিয়াষ কিছুতেই মিলিদির এই অবাক করা ভাবান্তরের মানে বুঝে উঠতে পারে না। তবে মিলিদির এই অস্বাভাবিক আচরণ তিয়াষের যে কিছুতেই ভালো লাগেনা। একবার প্রায় একমাস তিয়াষ মিলিদের বাড়িমুখো আর হয়নি। অনেকদিন পর মিলি তাই তিয়াষকে চেপে ধরলো - আজ কিন্তু

যাবি তিয়াষ, মা আমায় বার বার বলে দিয়েছে। না গেলে মা খুবই রাগ করবে কিন্তু।

শেষে অস্থির হয়ে তিয়াষ বলে - জেঠিমাকে বলো, আমার জন্য পায়েষ করে রাখতে। আজ সন্ধ্যায় যাবো। - বলেই তিয়াষ বন্ধুদের সঙ্গে চলে যায়।

বদলী হয়ে যাবার পর, তিয়াষের পড়াশুনায় যাতে কোন বিঘ্ন না হয়, তাই তপোধীর ঠিক করেছে, তিয়াষ নাইনে না ওঠা পর্যন্ত উদয়পুর ছাড়বে না। নিয়ম অনুযায়ী তিনমাসের মধ্যেই সরকারী আবাস ছেড়ে তারা স্কুলের কাছেই একটা ভাড়া বাড়িতে উঠেযায়। সরকারী কোয়ার্টার ছাড়ার সময় তিয়াষের খুবই কষ্ট হয়েছিল। বিশেষতঃ জুঁই আর ধনী সাগরের গভীর টান যে ভোলার নয়। ধনী সাগরের টলটলে জলে ভাসমান পদ্মফুলের কথা মনে পড়লেই তিয়াষের মন বিষাদে ভরে যায়।

ভাড়াবাড়িতে চলে যাবার পর জুঁই এবং মৌয়ের সঙ্গে তিয়াষের মনের দূরত্ব ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। মাঝে মাঝে হিমাদ্রি ও মাধুরী তিয়াষদের ভাড়া বাড়িতে বেড়াতে আসে, কখনো কখনো জুঁইকেও সঙ্গে নিয়ে আসে। সুযোগ পেলে নন্দিতাও হিমাদ্রিদের সরকারী আবাসে যায়। তুলনামূলক তিয়াষ খুবই কম যাওয়া আসা করে।

কোয়ার্টার ছাড়ার পর জুঁইকে কেমন পর পর মনে হতে থাকে তিয়াষের। স্থান - কাল - সময় মানুষে মানুষে দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়। সত্যিই কি তাই ? না এরমধ্যে এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। সংঘাত, সংঘর্ষ - দ্বন্দ্ব ছাড়া তো কোন প্রকৃত সংশ্লেষণ হয় না। দ্বন্দ্ব যে সমাজ অগ্রগতিব অমোঘ গতি নিয়ন্ত্রক শক্তি। দ্বন্দ্ব যে জড়ে , জীবনে, মহাকাশে, মহাসমুদ্রে নিত্যদিন চলছে। মননের দ্বন্দ্বই তো মহৎ সৃষ্টির প্রেরণা। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, চিত্রকর, সুরকার সকলেব ভেতরেই অবিরাম দ্বন্দ্ব চলছে। মৃত্যুতেও যে দ্বন্দ্বের অবসান হয় না। মিলনের অনিবার্য পরিণতিও যে ঘটে সেই দ্বন্দ্বেই।

তিয়াষ এবং জুঁই দুইজন দুই স্কুলে। ফলে দেখাশোনা বড় একটা হয় না। এরই মধ্যে একদিন তিয়াষের সঙ্গে জুঁইয়ের দেখা হয়। জুঁই কেমন যেন রোগা হয়ে গেছে। গায়ের রঙও যেন একটু মজে গেছে। তিয়াষকে দেখেই জুঁই অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তিয়াষ দ্রুত পায়ে জুঁইয়ের পাশে এসে দাঁড়ায় এবং ডাকে - জুঁই, কেমন আছিস রে ?

জুঁই চুপ করে থাকে। কোন জবাব দেয়না।

তিয়াষ — কিরে তুই রেগে আছিস ? আমার সঙ্গে কথা বলবি না ?

রাস্তার মধ্যেই জুঁই কেঁদে ফেলে। বলে — তিয়াষদা , তুমি আমায় ভুলে থাকতে পারলে ? একবারও আমার কথা মনে হয়না।

দু'টি পালক

অপ্রস্তুত তিয়াষ, জুঁইকে আর কোন কথাই বলতে পারে না। তার মনেও যে একটা অজানা উথাল পাথাল চলছে। নিজের কানেই যেন নিজের হৃদযের শব্দ শুনতে পায় তিয়াষ।

তারপর দু'জনেই চলতে থাকে। কিন্তু সারাপথ কেউই আর কোন কথাই বলতে পারলো না। জুঁইকে কোয়ার্টার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে তিয়াষ বাসায় ফিরে আসে।

বাবাকে বড় মিস করে তিয়াষ। বাবা যে তার সমস্ত সত্তায় মিশে রয়েছে। বাবাই যে তিয়াষের ভালো বন্ধু। বাবার অনুপস্থিতিতে তিয়াষ মাঝে মাঝে কেমন যেন উন্মনা হয়ে যায়। বাবার জন্য কখনো কখনো তিয়াষের বড় কষ্ট হয়, তিয়াষ তখন একা একা কাঁদে। নন্দিতা বুঝতে পারে যে তপোধীর চলে যাবার পর তিয়াষের মধ্যে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। নন্দিতা তাই সব সময় তপোধীরের অনুপস্থিতিটা নানাভাবে পুষিয়ে দিতে চায়। ক্লাশে তার দুইজন ভালো বন্ধু রয়েছে। একজন পলাশ, অপরজন সোহম। তিয়াষ, পলাশ আর সোহম। তিনজনই ক্লাশের সেরা ছাত্র। ছুটির দিনে তিনবন্ধু সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বিকেলে স্কুল মাঠে গিয়ে সকলের সঙ্গে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলে। সোহম প্রতিশ্রুতিবান ফুটবল খেলোয়াড়। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র কৌশিক বিদ্যালয়ের সেবা গোলকিপার। সকলেরই বিশ্বাস কৌশিক বড় হয়ে একদিন ইস্টবেঙ্গল - মোহনবাগানের মতো টীমেও খেলার জন্য ডাক পেতে পারে। উপযুক্ত কোচের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ পেলে সে আরো উন্নতি কববে।

তিয়াষ ভালো ব্যাটিং করলেও, রাজুদার মতো ভালো ক্রিকেট খেলা কেউ খেলতে পারে না। ক্রিকেটের প্রতি বিশেষ নজর দিতে গিয়ে রাজুদা দু'বাব মাধ্যমিক পবীক্ষায় ফেল করে বসে আছে। তবে বাজুদা ছেলে হিসেবে খুবই ভালো। ভালো ক্রিকেট খেলার সুবাদে মরশুমের বড় বড় ক্রিকেট দলে রাজুদার ডাক পড়ে। কিন্তু রাজুদা নিজে পড়াশুনোয় ভালো না হলেও অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের প্রতি বিশেষ নজর রাখে বাজুদা। কোন বাড়ির ছেলে-মেয়ে অকারণে পথে-ঘাটে আড্ডা দিলে এবং তা যদি একবাব বাজুদাব চোখে পড়ে, তবে কিন্তু তাদের রেহাই নেই। গাল-মন্দ থেকে দু'চারটে থাপড় চোপড় জুটে যেতে পারে। রাজুদা পাড়ার ক্লাবের সেক্রেটারী। উদয়পুর ক্রিকেট টীমের ক্যাপ্টেন রাজুদা ছয়ফুটের কাছাকাছি লম্বা, সুদর্শন, সকলের প্রিয়, ভদ্র এবং বিনয়ী। বাবা উদয়পুর শহরের প্রথম শ্রেনীর কন্ট্রাকটার, ইট ভাঁটার মালিক। বিরাট পয়সাওয়ালার ছেলে বলে রাজুদার মধ্যে কোন অহংকার নেই। মানুষের বিপদে-আপদে রাজুদা সব সময় ঝাঁপিয়ে পড়বেই! কাউকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, মরা পোড়ানো, জলে ডোবা ছেলেকে উদ্ধার করা - সবেতেই

রাজুদা হাজির। এ কারণে রাজুদা প্রায় সকলেরই প্রিয়।

এই রাজুদা কিন্তু রাজনীতির নামও শুনতে পারে না। রাজনৈতিক দলগুলো রাজুদাকে তাদের দলে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। রাজুদা কোন দলকেই পাত্তা দেয়না।

রাজুদা বলে — বুঝলি গাবলু, রাজনৈতিক দলে ভিড়লে নিজের বিবেক বিলিয়ে দিতে হয়, আর স্বেচ্ছায় যে শিকল পায়ে পরবি, তা সারাজীবন পায়ে জড়িয়ে থাকবে। লাভ কি বল ? তার চাইতে বেশ ভালো আছি।

একবার দুই রাজনৈতিক দলের মিছিলকে কেন্দ্র করে রমেশ চৌমুহনীতে ভয়ংকর মার-পিট লেগে যায়। পুলিশ লাঠি চার্জ করেও অবস্থা সামাল দিতে পারছিল না। খবর পেয়ে রাজুদা, তার বন্ধু গাবলুকে নিয়ে মোটর বাইকে চেপে সেখানে হাজির হয়। দু'জনের হাতেই দুটো ক্রিকেট ব্যাট। দু'জনেই কোথায় যেন নেট প্র্যাক্টিস করছিল। খবর পেয়েই যুদ্ধ ক্ষেত্রে। তারপর দু'দলের লোকদের রামধোলাই দিয়ে পনর মিনিটের মধ্যে এলাকা শান্ত করে দিয়েছিলেন। সেইদিন রাজুদা না এলে হয়তো কয়েকটি ছেলের প্রাণও যেতে পারত।

রাজুদা তিয়াষকে খুব ভালোবাসে। তিয়াস রাজুদার ক্রিকেটের অন্ধ ভক্ত। রবিবার আর ছুটির দিন ছাড়া রাজুদা তিয়াষকে খেলার মাঠে আসতেই দেয় না। রাজুদা নিজে পড়াশুনোয় ভালো করতে পারেনি ঠিকই। যাবা পড়াশুনোয় ভালো, তারা যেন আরো ভালো করতে পারে তার জন্য অবিরাম চেষ্টা করে যায়।

তিয়াষকে দেখলেই রাজুদা বলবে — তিয়াষ বাবু, কি খবর? ভালো তো ? পড়াশুনো কেমন চলছে ? তিয়াষ রাজুদার সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়ায়। বলে — ভালো আছি। তুমি কেমন আছ রাজুদা ? তুমি সেদিন আমাদের বাড়ি আসবে বলেছিলে। এলেনা কেন ?

রাজু — যাবো রে যাবো। সময় পাই না রে। পরশু অবশ্যই যাবো।

তিয়াষের মা স্কুলে, বাবা সোনামুড়ায়। এমনি একদিন তিয়াষ হঠাৎ স্কুলে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। কে বা কারা রাজুকে খবর পাঠায়। রাজু মুহূর্তেই অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে হাজির। দ্রুত তিয়াষকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর দেওয়া হয় নন্দিতাকে। তিয়াষের মা নন্দিতা সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। নন্দিতা এসে তপোধীরকেও খবর পাঠায়। তপোধীরও দ্রুত সোনামুড়া থেকে এসে পড়ে। অবিশ্যি কিছুক্ষণের মধ্যে তিয়াষ বেশ সুস্থ বোধ করে। তবু হাসপাতালের ডাক্তার বাবু তিয়াষকে একরাত্রি অবজারভেশনে রেখে দেন। তিয়াষের অসুস্থতার খবর পেয়ে অনেকেই তিয়াষকে দেখতে আসে। মৌলি দিদিমণি

দু'টি পালক

প্রথম থেকেই তিয়াষের কাছে ছিল, সঙ্গে সোহম ও পলাশ। মৌও তার মাকে নিয়ে হাসপাতালে তিয়াষকে দেখতে আসে। কিন্তু সমস্ত ঝক্কি সামাল দিয়েছে রাজুদা ও তার বন্ধু গাবলু। তপোধীর ও নন্দিতা আসার পর সবাই একটু স্বস্তি পায়। তিয়াষ সুস্থ জেনে যে যার ঘরে ফিরে যায়।

নন্দিতা ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে — এখন কেমন আছিস বাবা ? ভালো বোধ করছিস ?

তিয়াষ আবেগে মায়ের কোলে দু'হাত রেখে পাশ ফিরে শোয়। বাবাকে দেখে তিয়াষের মুখ প্রসন্নতায় ভরে ওঠে। খবর পেয়ে হিমাদ্রি আর মাধুরীও আসে। জুঁইও স্কুলেই খবরটা পায়। ছুটি নিয়ে সেও হাসপাতালে চলে আসে। কিন্তু অভিমানী জুঁই চুপচাপ দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। সকলে চলে গেলেও মাধুরী ও হিমাদ্রি থেকেই গেছে। তপোধীর আসার পর তিয়াষকে কেবিনে নিয়ে নেওয়া হয়। তিয়াষ ঘুমোচ্ছে দেখে সবাই বাইরে আম গাছের নীচে গোল করে বাঁধানো বেদীতে গিয়ে বসে। হাসপাতাল থেকে ভিজিটারদের ভীড়ও প্রায় শেষ। সন্ধ্যা হয় হয়। হাসপাতালের চারদিকের গাছের ডালে ডালে নীড়ফেরা পাখিদের কলকাকলি। এমন সময় তিয়াষ হঠাৎ অনুভব করে একটি ছোট্ট নরম হাতের পরশ। তিয়াষ বুঝতে পারে জুঁই তার কপালে হাত রেখেছে। তিযাষও একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে চোখ বোঝা অবস্থাতেই তার ডান হাত জুঁইয়ের হাতের উপর রাখে। তারপর কপাল থেকে হাতটা সরিয়ে বুকের ওপর রাখে। জুঁই কোন কথা বলে না। কিছুক্ষণ সময় স্তব্ধ করা নীরবতা।

হঠাৎ জুঁই তিয়াষের বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। অপ্রস্তুত তিয়াষ এবার চোখ মেলে জুঁইয়ের রাশি রাশি ভ্রমর কালো চুলের ওপর হাত বোলাতে থাকে।

তিয়াষ ও জুঁইয়ের বাবা-মা সবাই সব কিছু বোঝে, জানে। কিন্তু কেউই কাউকে কোনদিন কোন কথা না বললেও বাবা-মাদের মনেও যে একটা সুপ্ত বাসনা অহর্নিশ খেলা করে। জুঁই তিয়াষের মতো - নন্দিতা-মাধুরীরাও স্বপ্ন দেখে —রঙিন দিনের স্বপ্ন। জুঁই-তিয়াষের হৃদয়ের মধ্যে বিধাতপুরুষ আপনিই রোপন করে দিয়েছে ভালোবাসার বীজ। যে বীজ একদিন অমর অঙ্কুরে, উঠিবে অম্বর পানে। সেই মিষ্টি দিনের প্রতীক্ষাই যে ওরা করে চলেছে।

জুঁই তিয়াষের বুক থেকে তার মুখ সরায় না। তিয়াষও কোন কথা বলে না। তিয়াষের ইচ্ছে করে হাসপাতালের এই কেবিনের দরজা যেন কেউ কোনদিন না খোলে। আর এখান থেকে তাদের চলে যাবার ডাক যেন আর কোনদিন না আসে। অনন্তকাল

তারা দু'জন এই কেবিনেই থেকে যেতে চায়। চৌদ্দ ওয়াটের বিদ্যুতের মিষ্টি আলোয় তিয়াষের মনে হয়, হাজার হাজার জোনাকী যেন চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে। ছাদ ফুঁড়ে যেন আকাশ থেকে একটির পর একটি নীল তারা তাদের উপর খসে পড়ছে।

একসময় তিয়াষ তার দু হাত দিয়ে জোর করে জুঁইয়ের মুখটা তুলে ধরে তার চোখের দিকে তাকায়। এতক্ষণে জুঁইয়ের মুখে দুষ্টুমি ভরা হাসি ফুটে ওঠে।

জুঁই বিষণ্নতা মাখানো মুখে হেসে উঠে তিয়াষের বুকের উপর আলতো ভাবে মাথা রেখে বলে — তোমার যদি আজ কিছু একটা হয়ে যেত, আমি তবে সারাজীবন কি নিয়ে থাকতাম ?

তিয়াষ — কেন আমার কি হয়েছে?

জুঁই তিয়াষের কথার পুনরুক্তি করে ভেংচি কেটে বলে — কেন, আমার কি হয়েছে ? - তারপর আবার বলে — নিজে যেন কিছুই জানে না। কোন কিছু না হলে হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছ কেন ?

দরজা ঠেলে এমন সময় ডাক্তার বাবু কেবিনে ঢুকে। সঙ্গে নার্স। পেছন পেছন - নন্দিতা, তপোধীর, মাধুরী ও হিমাদ্রি। তাদের সকলের মুখে বিষণ্নতা ও দুশ্চিন্তার ছাপ।

ডাক্তার বাবু তিয়াষের বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে স্টেথোস্কোপ দিয়ে বুক. পেট ভালো করে পবীক্ষা করেন। তারপর তিয়াষকে প্রশ্নের সুরে জিজ্ঞেস করলেন — এখন কেমন বোধ করছ ?

ডাক্তার বাবুর কথা শুনে তিয়াষ উত্তর দেয় — এখন ভালো।

তখন ডাক্তারবাবু তপোধীরের দিকে ফিরে বললেন — মিঃ দেবনাথ, ভয়ের কিছু নেই। আমি দেখেছি। বদ হজম এবং পেটে গ্যাস থেকেই এমনটা হয়েছে। তবে রাতটা এখানে থেকে যাক। কাল ছেড়ে দেব।

তারপর ডাক্তার বাবু নার্সের দিকে ফিরে বললেন — সিস্টার, আমি লিখে দিচ্ছি, রাত্রে এই ওষুধ কটা পাবে। রাত্রে হাল্কা খাবার খাবে। ঘুমোবার আগে একটা ট্র্যাঙ্কুলাইজার খাইয়ে দেবেন। কারো থাকার দরকার নেই। তবে ইচ্ছে করলে একজন থেকে যেতে পারেন। তপোধীর রাত্রে ছেলের কাছে থেকে যায়।

এককাপ হরলিকস্ ও দুটো বিস্কুট খায় তিয়াষ। সে হাসপাতালের বেডে এখন একা। সবাই চলে গেছে। বাবা একটু পরে এসে যাবে। শুয়ে শুয়ে সে ভাবছে — কি হয়েছিল তার। সব কথা মনে করার চেষ্টা করে তিয়াষ। বিজন বাবু ক্লাশে অংক করাচ্ছিলেন।

তিনি তিয়াষকে কি একটা প্রশ্ন করেছিলেন। তিয়াষ সবেমাত্র দাঁড়িয়ে উত্তরটা দিতে যাচ্ছিল। হঠাৎই মাথাটা ঘুরে যায়। চোখ দুটো অন্ধকার হয়ে যায়। জ্ঞান হারায়। জেগেই দেখে হাসপাতালের বেডে।

কেবিনের বিছানায় একা একা শুয়ে থাকতে থাকতে নানা রাজ্যের ভাবনা তিয়াষের মনে ভীড় করে আসে। মনে পড়ে জুঁইয়ের কথাটা — 'তোমার যদি আজ কিছু একটা হয়ে যেত, আমি সাবাজীবন কি নিয়ে থাকতাম।''

জুঁইয়ের কথায় যে গভীর ইঙ্গিত রয়েছে। সে ইঙ্গিত কি তিয়াষ বুঝতে পারে? জুঁই তো এখনো বড়ো হয়নি। তবু তার মধ্যে বড়দের মতো এমন অনুভব কোথা হতে আসে? অবাক হয় তিয়াষ। তিয়াষের মধ্যেও যে একটা গভীর অনুরাগ জন্ম নেয়। জুঁইকে তার ভালো লাগে। তার এই ভালো লাগা যে অন্যরকম। ঠিক মা-বাবাকে ভালো লাগার মতো নয়। জুঁইকে না দেখলে তার হৃদয়ের মধ্যে যে একটা শূন্যতা বোধ কাজ করে। একটা হারাই হারাই ভাব। জুঁই তার একটি কথায় যে অনেক কথা বলে দিয়েছে। তিয়াষের সমগ্র চেতনার মর্মমূলে দিয়েছে গভীর নাড়া। পত্র-পত্রিকা সিনেমা, টি.ভি সিরিয়াল, জীবন বিজ্ঞানের পাঠক্রম, এইডসের বিজ্ঞাপন— ইত্যাদি থেকে নারী পুরুষের সম্পর্ক বিষয়ে একটা অস্পষ্ট ধারণা মনের মধ্যে গড়ে ওঠে। তিয়াষও যে সকলেব মতোই পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবীর ভালোবাসার মতোই দেহ-মনকে উদ্বেলিত করার বয়সের দিকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যায়। জুঁইও কি তার মত ভাবতে পারে? তিয়াষ শুনেছে — মেয়েরা নাকি অল্প বয়স থেকেই দেহ-মন সম্পর্কে ভীষণ কৌতূহলী হয়ে ওঠে। বিশ্বস্রষ্ঠা মেয়েদের মধ্যে জীবনের সমস্ত রকম বোধ, বুদ্ধি, চেতনা এককথায় দেহমনের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য অদরকাবী তৎপরতা দেখিয়েছে। একটি পুরুষ শিশুর তুলনায় একটি নারী শিশু বয়সের অনুপাতে আপনা থেকেই অনেক বেশী আত্মসচেতন। স্কুলের মেয়েদের দেখে তিয়াষের এই কথাটা প্রায় সব সময়ই মনে পড়ে।

কৈশোর অতিক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল। প্রকৃতির নিয়মেই মাতৃত্বের সমস্ত লক্ষণই অতি অল্প বয়সেই নারীদের মধ্যে প্রকটিত হয়। আজকের সমাজ অনেক অগ্রসর। যৌন শিক্ষা প্রচলন ছাড়াও বয়ঃ বৃদ্ধির কারনেই ছাত্র-ছাত্রী বালক-বালিকাদের মধ্যে নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিষয়ে আলো-ছায়ার গূঢ় রহস্যের মতোই একটা অস্পষ্ট ধারণা তৈরী হয়। তিয়াষ এই সম্পর্কটা ঠিক বুঝে। শুধু তাই নয়, মেয়েদের প্রতি অন্য একটা আকর্ষণও অনুভব করে। মেয়েদের চুল, মুখ এবং চোখের চাউনির মধ্যে একটা রহস্যময়তার গন্ধ পায় তিয়াষ।

দু'টি পালক

স্কুলের মেয়েরা এমনিতেই তিয়াষের সম্পর্কে খুবই কৌতূহলী। সব মেয়েই প্রায় যেচে যেচেই তার সঙ্গে কথা বলে। বিশেষত তার নিজের এবং নীচের ক্লাশের মেয়েরাই তার দিকে সব সময় কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকায়। আর উপরের ক্লাশের মেয়েরা, তিয়াষ যাদের দিদি ডাকে, তারাও তিয়াষকে ডেকে নিয়ে আদর করে, তার গান শুনতে চায়। তিয়াষের মধ্যে লজ্জা লজ্জা ভাব তাকে নিঃসঙ্গ করে রাখতে চায়। ইচ্ছে করেই মেয়েদের সঙ্গ এড়িয়েই চলতে চায়।

ছেলের চিকিৎসার জন্য তপোধীর একমাসের ছুটি নিল। আগরতলা নিয়ে গিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ডাক্তারী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। বদহজম, গ্যাস ও শারীরিক দুর্বলতা ছাড়া আর কোন অসুখের লক্ষণ পাওয়া যায়নি।

সময়ের কোন অতীত নেই। সময় মানেই অনন্ত বর্তমান। সময়ের কোন ভবিষ্যৎও নেই। কাল আর সময় এক নয়। বহুমাত্রিক কালের ধারণায় অস্পষ্ট অতীত রচনা করে চলে ঘটে যাওয়া ঘটনা পঞ্জীর বিপুল পাণ্ডুলিপি, তার কোনটা দৃশ্যমান, কোনটা অজ্ঞাত। ভবিষ্যৎ চির অধরা দৃশ্যের অন্তরালে ঢাকা পড়ে থাকা অঘটিত ঘটনার এক অদৃশ্য মায়াজাল। যে ঘটনা ঘটাব জন্য তৈরী, তাইতো ভবিষ্যৎ। অথচ আশ্চর্য, মানুষ শুধু বর্তমানেই বেঁচে থাকে। বর্তমান যেমন ভাসমান অতীত, তেমনি যবনিকায় ঢাকা পড়ে থাকা ভবিষ্যৎও।

দুরন্ত গতি সম্পন্ন সময় তুরঙ্গম সতত ধাবমান। শৈশব এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণে গ্রন্থিরস ক্ষরণের ফলে দেহে যেমন যৌবনের লক্ষণগুলি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হতে থাকে, দেহের ভেতরে যে মন তাও অলোড়িত হয় ক্ষণে ক্ষণে। বসন্ত আগমনে প্রকৃতির ভেতর যে পরিবর্তনের সূচনা ঘটে, এও যেন তেমনি।

জুঁই-তিয়াষ, দু'জনেই দু'জনের বয়ঃ সন্ধিকালে। আর দু'জনেরই দু'জনের প্রতি তৈরী হয়েছে এক অমোঘ টানা, গভীর নির্ভার এক চিরন্তন আকর্ষণ। বাসা বদলের ফলে সাময়িক দূরত্ব তৈরী হয়েছে, তা দু'জনের মনেই জন্ম দিয়েছে বিরহ-বেদনার। আর এই বিরহই তাদের মনের নৈকট্য যেন অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। দু'জনের অন্তরেই না-বলা কথাগুলি প্রতিনিয়ত বুদ্বুদের মতো অবিরল ভাঙছে আর গড়ছে। এমন কথা অনন্তকাল ধরে সকলের মনেই জাগে, কিন্তু সেকথা এ বয়সে না যায় বলা, না যায় প্রকাশ করা। জীবনে তো না বলা কথাই বেশী। মানুষ তো কখনো ঝরাকুঁড়ির খোঁজ করে না।

মাধুরী ও নন্দিতা প্রতিবছরই শিবচতুর্দশী ব্রত পালন করে। গত ক' বছর তারা একসঙ্গেই ব্রত উদ্‌যাপন করতো। এ বছরই তারা একটু দূরে চলে গেছে। তবু ঠিক হয়েছে মাধুরীদের কোয়ার্টারেই এবারও তারা শিব চতুর্দশীর ব্রত পালন করবে। স্কুল-অফিস ছুটি।

তপোধীর আসেনি। হিমাদ্রি-পূজার প্রয়োজনীয় উপকরণ এনে দিয়েছে। তিয়াষ এখন অনেক বড়ো হয়েছে। তার মধ্যে বয়ঃ সন্ধিকালের আত্ম সম্মান বোধ বেশ জাগ্রত। একটা স্বাধীনচেতা ও বেপোরোয়া মানসিকতাও মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছে। শিব পূজায় বেলপাতা, আকন্দ, ধুতুরাফুল ও নীল অপরাজিতা অগ্রগণ্য। তিয়াষ বন্ধুদের নিয়ে বন বাদাড় ভেঙ্গে সব যোগাড় করে এনেছে। গোয়াল পাড়া গিয়ে গরুর দুধ এবং বাজার থেকে নারিকেল ও যোগাড় করে এনেছে। তিয়াষ জেনেছে জুঁইও নাকি এবার শিব-চতুর্দশীর ব্রত পালন করবে।

মা তো অনেক বছর ধরেই শিব চতুর্দশী ব্রত করে আসছে। তিয়াষ তো এমন উৎসাহ নিয়ে আর কোনোবার শিব পূজার জন্য উপরকণ যোগাড়ের চেষ্টা করেনি। আসলে এসব কি সে জুঁইয়ের জন্য করছে, না সত্যিই মায়ের জন্য।

তিয়াষ বাড়িতে একা। মায়ের সঙ্গে জুঁইদেব বাসায় যায়নি। দুপুরের দিকে যাবে। সোহম এবং পলাশের সঙ্গে মাঠে গিয়ে একপ্রস্থ ক্রিকেট খেলে এসেছে। তিয়াষ আসেনি দেখে জুঁইয়ের খুবই মন খারাপ।

জুঁই মাকে জিজ্ঞেস করেছিল — মা, মেয়েরা শিব চতুর্দশীব ব্রত পালন কবে কেন ?

মাধুরী স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর দিয়েছিল — শিব চতুর্দশীর ব্রত পালন কবলে মেয়েদের শিবের মতো স্বামী হয়।

বিয়ের আগে তুমি শিব চতুর্দশীর ব্রত করতে ? - জুঁইয়ের প্রশ্ন।

হ্যাঁ করতাম — মাধুরীর উত্তর।

তুমি শিবের মতো স্বামী পেয়েছ ? — জুঁই বলে।

মাধুরী এবার কৌতুকের সুরে বলে — তোর বাবাকে জিজ্ঞেস কব পেয়েছি কিনা ?

হিমাদ্রি কাছেই ছিল। মা ও মেয়ের কথা শুনে সে তখন হাসছিল।

জুঁই — মা, বাবা কি সত্যিই শিবের মতো।

মাধুরী হিমাদ্রিকে উদ্দেশ্য করে কথায় ফোড়ন দিয়ে বলে — চেয়েছিলাম তো শিবের মতো স্বামী, জুটেছে শিবের চেলা।

মাধুরীর কথার রেশধরে হিমাদ্রি যোগ করে — ভাগ্যিস শিব ঠাকুরের ষাঁড়টা তোমার কপালে জুটেনি। জুটলে তবে বুঝতে। শিবের চেলা পেয়েছ বলেই — আসল

ঠ্যালা বুঝতে পারছ না।

জুঁই এবার শিব চতুর্দশীর ব্রত করবে বলে ধুর্নভাঙ্গা পণ করে আছে। মাধুরী জুঁইকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে - শিব ঠাকুরের পুজোতে ফাঁকি দেওয়া চলে না। শিব যে অন্তর্যামী। আর এই অল্প বয়সে উপোষ করে কষ্ট পাবি। তোর উপোস থাকতে হবে না। আমি তো এখন ব্রত পালন করি, আমার ছোট্ট জুঁইয়ের জন্য।

মেয়ের গালে চুমু খেয়ে মেয়েকে আদর করে দেয় মাধুরী। এবার জুঁই নন্দিতাকে ধরে বসে। — মাসী, মা বলেছে, মা আমার জন্য উপোস করে। - তুমি কার জন্য উপোস কর মিষ্টি মাসী।

নন্দিতা হাসতে হাসতে বলে — আমি উপোস করি, আমার ছেলের জন্য গৌরীর মতো বৌ চাইতে। — নন্দিতা আবার বলে - জানিস মামণি, শিব ঠাকুর ন'বছরের গৌরীকে বিয়ে করেছিলেন। আর এক সময়ে আমাদের দেশে গৌরীদান করার নিয়ম ছিল। সে সময় ন'বছরের মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল আমাদের দেশে।

নন্দিতার কথা শুনে জুঁইয়ের সে কী আনন্দ। মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে জুঁই বলে — আগের দিন হলে তো তা হলে কবেই আমার বিয়ে দিয়ে দিতে তাই না মা? সেদিনের হিসেবে তো এতদিনে আমি ঠাকুমা হয়ে যেতাম। মাধুরী নন্দিতাকে উদ্দেশ্য করে বলে — শুনেছিস নন্দিতা, মেয়ের কথা শুনেছিস?

জুঁই - মা, তুমি যতোই বারণ কর না কেন, আমি এবার ব্রত পালন করবই। আমাদের ক্লাশের সব মেয়েরাই শিব চতুর্দশীর ব্রত পালন করে। তা হলে আমায় বারণ করছ কেন ? শিব ঠাকুরের মাথায় দুধ, নারকেল জল বেলপাতা দেবো। শিব লিঙ্গের মাথায় পবাবো নীল অপরাজিতার মালা। নীল অপরাজিতার মালা তো আমি গেঁথেই ফেলেছি।

শিব ঠাকুরের পুজো দিতে শাড়ী পরে যেতে হয়। - মাধুরী বলে। বাবাকে বল আমার জন্য শাড়ী নিয়ে আসতে - বলে জুঁই।

জুঁইকে বোঝানো যায়নি। শিব চতুর্দশীর ব্রত থেকে তাকে বিরত করা যায়নি। মেয়ের আব্দার ও কান্নায় হিমাদ্রি মেয়ের জন্য আট হাত লম্বা একটা লাল পেড়ে শাড়ী নিয়ে এলো। সবাই ভেবেছিল উপোষে জুঁই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। বিকেলের দিকে নন্দিতা ও মাধুরী উপোসের প্রভাবে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়লেও, জুঁই কিন্তু যথেষ্ট সপ্রতিভ। উপোসের কোন ছাপই পড়েনি তার দেহে-মনে।

একটু আগে তিয়াষ এসেছে। সে জুঁইয়ের সঙ্গে আগের মতোই খুনসটি করছে

এবং জুঁইকে খেপাচ্ছে।

তিয়াষ জুঁইকে উদ্দেশ্য করে বলে — সব মেয়েরাই তো শিবের মতো বর চায়। এই বুড়ো বয়সে শিব ঠাকুর আর কটিই বা বিয়ে করতে পারবে। তুই বরং শিব ঠাকুরের মাথায় দুধ, জল ও বেলপাতা দিয়ে বলবি, - হে শিব ঠাকুর, আমার যেন বাঁদরের মতো একটা বর হয়।

জুঁই নন্দিতাকে উদ্দেশ্য করে বলে — মিষ্টি মাসী শুনছ, তোমার ছেলে আমাকে কি বলছে। নিজে একটা বাঁদার তো, তাই বাঁদরের মত বর চাইতে বলছে। তুমি ওকে বারণ কর, না হলে সেবারের মতো কামড়ে দেব।

তিয়াষ — আমিও স্কুলে গিয়ে সবাইকে বলবো, আমাদের ওখানে একটা ডগি আছে। সুযোগ পেলেই কামড়ে দেয়। সাবধানে থাকিস। তা হলে ভালো হবে? সেবার বলিনি, এবার আমার সঙ্গে লাগলে কিন্তু ঠিকই বলে দেবো।

জুঁই - তুমি সেবার আমার চুল টেনেছিলে কেন। আমি তো তোমায় বারণ করেছিলাম। তুমি আমার চুল টানবে না। আমার চুল ধবলে আমাব খুব রাগ হয়। তুমি আমার চুল টেনে ধবেছিলে বলেই, আমি তোমার হাত কামড়ে দিয়েছিলাম। আবাব কোনদিন চুল ধরলে, আবারও কামড়ে দেবো।

তিয়াষ দৌড়ে গিয়ে জুঁইয়ের চুল ধরতে যায। জুঁইও এ ঘর থেকে ও ঘরে পালিয়ে বেড়ায। এক সময জুঁই লাফ দিয়ে খাটেব উপর উঠে যায। তিয়াষও লাফিয়ে খাটে ওঠে। সে সময় নন্দিতা ও মাধুরী ঠাকুব ঘরে পূজার উপকবণ সাজাচ্ছিল। হিমাদ্রিও সে সময ঘরে ছিলনা। হঠাৎই জুঁই তিয়াষের গলা জুড়িয়ে ধরে মুখটা তিয়াষের বুকে লুকায়। তিয়াষও হঠাৎ গভীর আবেগে জুঁইকে বুকে জড়িয়ে ধরে। তারপর অতর্কিতে জুঁইয়ের গালে চুমু খায়। লজ্জায় জুঁইয়ের গাল দুটো লাল হয়ে ওঠে। তিযাষের দিকে লজ্জিত চোখ তুলে তাকায়। তারপর আলতো ভাবে ধাক্কা দিয়ে তিয়াষের বুক থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয জুঁই।

মুখ নিচু করে বলে — অসভ্য। বলেই এক দৌড়ে পূজার ঘরে চলে যায়।

তিয়াষ নির্বোধের মতো চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। একসময় ঘর থেকে বেরিয়ে হৃদয় আলোড়ন করা এক অজানা নবীন আনন্দে ভাসতে ভাসতে দীর্ঘকালের পরিচিত ধনী সাগরের সেই চেনা ঘাটের উপর এসে দাঁড়ায়। তখনো ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকের মতো তিয়াষের সারা শরীর বার বার শিহরিত হচ্ছিল। মনের মধ্যে একটা অজানা

ভয় তিয়াষকে কেমন তাড়া দিচ্ছে। তার হঠাৎ মনে হলো — ক্ষণিকের এক ছোট্ট ঘটনায় সে যেন সাবালক হয়ে উঠেছে। এ ভাবেই একজন কিশোর একদিন পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠে। তিয়াষের অঙ্গে অঙ্গে তারই অনুরণন। একদিকে একটা পুলক শিহরণ, যুগপৎ দ্বিধা, সংশয়, ভয়, লজ্জা, সংকোচ অস্থির করে তুলছে তিয়াষকে। জুঁই যদি কথাটা কাউকে বলে দেয়, রাঙ্গা মাসী কিংবা মা যদি জেনে যায়, তিয়াষতো আর কখনো মুখ দেখাতে পারবে না। একী করলো তিয়াষ। তিয়ায কি এমন একটা কাজ করার জন্যই জুঁইদের বাসায় এসেছে ? একি করলো তিয়াষ ? জুঁইয়ের সামনেও তো আর কখনো দাঁড়াতে পারবে না। কাউকে কিছু না বলে তিয়াষ এলোমেলো ভাবনায় তাড়িত হয়ে বাসায় চলে এলো। বাসায় এসেও স্থির থাকতে পারছে না তিয়াষ। একটা অজানা ভয়ে বার বার তিয়াষের সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে। একসময় কম্প দিয়ে তার জ্বর এসে যায়।

নন্দিতা তিয়াষকে দেখতে না পেয়ে একটু অবাকই হয়ে যায়। সেও বুঝতে পারেনি যে তিযাষ বাড়ি চলে যেতে পারে। নন্দিতা ও মাধুরী ঠাকুরকে পুজো দিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ কোয়ার্টারে ফিরে এল। তাঁদের সঙ্গে জুঁইও ভক্তি ভরে শিবের মাথায় দুধ, নারকেল জল ও বিল্বপত্র অর্পণ করেছে। দেবাদিদেব শিবেব কাছে আকুলভাবে মনের বাসনা জানিয়ে বর প্রার্থনা করেছে ।

বাড়ি এসে মাধুরী মেয়েকে বলে   মামণি, তুই ঠাকুরের কাছে কি বর চাইলি রে ?

মায়ের কথায় একমুহূর্ত অপ্রস্তুত হয়। সত্যি কথা তো মাকে বলতে পারবে না। ঠাকুরেব কাছে বর চেয়ে তো মিথ্যেও বলা যায় না। দ্বিধা কাটিয়ে জুঁই মাকে প্রতি প্রশ্ন করে --- মা তোমার তো বিয়ে হয়ে গেছে, তুমি কি বর চাইলে বল না।

মাধুরী মেয়ের কথায় হেসে ওঠে। তারপর বলে — পাগ্‌লী মেয়ে। আমি কি আমার জন্য কিছু চাইতে গেছি নাকি । আমি যে ঠাকুরের কাছে সকলের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেছি আর আমার দুষ্টু মেয়েটার জন্য শিব ঠাকুরের মতো একটা বর চেয়ে এসেছি।

মায়ের কথা শুনে জুঁইয়েব মুখ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। ঝুপ করে মায়ের বুকে মুখ লুকায় জুঁই। মেয়েকে আদর করে দিয়ে দুই গালে দুটো চুমো খায়। মা তার গালে চুমু খেতেই তিয়াষের চুমু খাওয়ার কথা তার মনে পড়ে যায়। নিজের অজান্তেই জুঁই তিয়াষ যে গালে চুমু খেয়েছিল — সেখানে হাত বুলিয়ে দেয়। সারা শরীরে একটা শিহরণ বয়ে যায় জুঁইয়ের। তার মধ্যেও যে একটা অজানা শিহরণ জাগছে। এক অপূর্ব অনাস্বাদিত

পুলকানুভূতি। জুঁই মাঝে মাঝে তার কম্পিত হৃদয়ের শব্দ শুনতে পায়। মা চুমু খেলে তো জুঁইয়ের অমন অনুভূতি হয় না। তিয়াষ চুমু খাওয়ায় তার অমন লাগছে কেন। যতই ভাবছে, ততই একটা উত্তেজনা যে জাগছে।

অনুভূতির এই শিহরিত অবস্থা থেকে নিজেকে বের করে নিয়ে আসতে চায় জুঁই। দুষ্টু দুষ্টু হাসি হাসি মুখে সে নন্দিতাকে বলে — মিষ্টি মাসী, তোমার তো মেয়ে নেই। তুমি কি বর চাইলে।

নন্দিতা — কেন? তোকে সকালে একবার বললাম না। আমি আমার ছেলের জন্য গৌরীর মতো একটা টুকটুকে বৌ চেয়ে এসেছি। এবার বুঝলি ?

নন্দিতার কথার মধ্যে কোথাও যেন একটা অদৃশ্য ইঙ্গিতও ছিল। সেটা জুঁই বুঝতে পেরেই নন্দিতাকে বলে — গৌরীর মতো কনে পেতে হলে, তোমার ছেলেকে বলো , সেও যেন সত্যি সত্যিই শিবের মতো হয়।

নন্দিতা এই একটুকু মেয়ের মুখে এমন ইঙ্গিতপূর্ণ কথার এমন বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর শুনে ক্ষণকালের জন্য কেমন হতবাক হয়ে যায়। মাধুরীর এই ছোট্ট মেয়েটির মধ্যে এই এত অল্প বয়সেই এমন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের উন্মেষ দেখে নন্দিতা মনে মনে খুবই খুশী হয়। আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। নন্দিতা জুঁইকে আশীর্বাদ করে বলে — জুঁই, তুই অনেক বড় হবি রে, মা, তুই অনেক বড় হবি, আশীর্বাদ করি। তুই সত্যিই বড় হও।

মাধুরী এসে জুঁইয়ের কপালে মাথায় ঠাকুরের প্রসাদী ফুল স্পর্শ করায়। ঠাকুরের প্রসাদ মুখে দিয়ে তারা সকলেই সারাদিনের উপোস ভঙ্গ করে। ইতিমধ্যে হিমাদ্রিও বাসায় ফিরে এসেছে। হিমাদ্রি তিয়াষকে না দেখে জিজ্ঞেস করে - তিয়াষ কোথায়? তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

মাধুরী — তোমার সঙ্গে যায়নি ? আমরা তো ভেবেছি তোমার সঙ্গেই সে গিয়েছে। - আমরা তো ঠাকুরবাড়ি গিয়েছিলাম, তখনও তো তিয়াষ ছিল না।

জুঁই বুঝতে পারে, তিয়াষ ভয় এবং লজ্জায় চলে গেছে। হয়তো জুঁইয়ের মুখোমুখি হবার সাহস হারিয়ে ফেলেছে। জুঁই এবার নিজের থেকেই বলে — দ্যাখো, হয়তো বাসায় চলে গেছে।

মাধুরী — নিশ্চয়ই তুই তাকে কিছু বলেছিস্ ।

জুঁই — আমি কেন বলতে যাবো ? আমি কখনো বলেছি নাকি ?

মাধুরী — না হলে তুই বুঝলি কি করে যে তিয়াষ বাড়ি চলে গেছে ?

জুঁই — তোমাদের গুণধর ছেলে বাবার সঙ্গেও যায়নি, ঘরেও নেই, পুকুর পারেও নেই, তবে কোথায় যেতে পারে ? এ ভর সন্ধ্যা রাতে তো আর ঘোড়ার ঘাস কাটতে যায়নি নিশ্চয়ই। তাতে আবার ভূতের ভয় আছে না?

মাধুরী মেয়েকে চেপে ধরে। তারপর বলে — তুই নিশ্চয়ই সেবারের মতো তাকে কামড়ে দিয়েছিস।

জুঁই — মা, আজ যে উপোস ছিলাম গো, কামড়াই নি। তবে অসভ্যটাকে কামড়ে দিলে ভালো হতো।

এমন ভয়ংকর সত্য কথাটা যে বলা যায় না। মিথ্যেও বলতে পারছিল না জুঁই। ইঙ্গিত পূর্ণ ভঙ্গীতে বলে — আমার সঙ্গে খুনসুটি করে কেন ? আমি রেগে বকে দিয়েছি। তাই আমার উপর রাগ করে চলে গেছে। এরপর জুঁইকে কেউই আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না। সবাই জানে যে দু'জনই সারাক্ষণ খুনসুটি করে, ঝগড়া করে, আড়ি দেয়— আবার একজন আর এক জনকে না দেখলে থাকতেও পারে না।

নন্দিতা এবার বলে — মাধু, আমি যাইরে। আমায় কি দিবি দিয়ে দে। ছেলেটা অনেকক্ষণ একা একা।

মাধুরীই হিমাদ্রিকে বলে — দ্যাখ না টেলিফোন করে, ছেলেটা বাড়ি গেল কিনা?

মাধুরীর কথায় হিমাদ্রি তিয়াষকে ডায়াল করে। ওই প্রান্ত থেকে তিয়াষ রিসিভার তুলে বলে — হ্যালো, কে বলছেন?

হিমাদ্রি বলে — আমি কাকু বলছি রে। কে ? তিয়াষ? তুই চলে গেলি কেন ? হিমাদ্রির গলার আওয়াজ শুনেই প্রথমতঃ থমকে গিয়েছিল তিয়াষ। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে — না, কাকু, এমনিই চলে এলাম। শরীরটা ভালো লাগছিল না। মাকে বল না, তাড়াতাড়ি চলে আসতে, একা একা যে আমার ভালো লাগছেনা।

এই প্রান্ত থেকে হিমাদ্রি — তোর মা এক্ষুণি আসছে। ঠিক আছে। রাখছি।

দু'টি পালক



নন্দিতা ঘরে এসে দেখে তিয়াষ বিছানায় শুয়ে আছে। সারা শরীর গরম। জ্বরও আছে একটু। ছেলেকে শুয়ে থাকতে দেখে গায়ে হাত দেয় নন্দিতা। তারপর বলে — তোর জ্বর এসেছে, সারাদিন বলিস নি কেন? ওষুধ খেয়েছিস্? মাথা ভার বোধ, চোখ ছল ছল করছে। সারা শরীরে একটা অবসাদ জেগে আছে। ঘরে হোমিওপ্যাথি ওষুধ ছিল। লক্ষণ মিলিয়ে তিয়াষকে একমাত্রা জেলাসিমিয়াম-২০০ খাইয়ে দিল।

মাধুরী গরম গরম খিচুঁড়ি দিয়েছিল মা-ছেলের জন্য। নন্দিতা ছেলেকে বলে — আয় মাথাটা ধুয়ে দিই। হাত মুখ ধুয়ে গরম গরম খিচুঁড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়। কাল স্কুলে যাবার দরকার নেই। একদিন বিশ্রাম নিলেই শরীরটা ঠিক হয়ে যাবে।

মা-ছেলে একসঙ্গে খিঁচুড়ি খেয়ে নিল। খেতে বসে নন্দিতা তিয়াষকে বলে — তুই আজও বুঝি জুঁইয়ের সাথে খুনসুটি করেছিস। জুঁই বলছিল —

কথাটা শুনেই তিয়াষের বুকটা কেঁপে ওঠে। বিষম খায় তিয়াষ। শ্বাসনালীতে খাবার আটকে কাসতে থাকে তিয়াষ। নন্দিতা উঠে গিয়ে ছেলের মাথায় চাপড় দিয়ে ষাট ষাট বলে উঠল। মা জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলে — নে জল খা।

তিয়াষ জল খেয়ে নিলে। তারপর চুপচাপ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। নন্দিতাও উপোসী ক্লান্ত দেহ নিয়ে একসময় বিছানার আশ্রয়ে চলে যায়। তারপর গভীর নিদ্রায় ডুবে যায়।

তিয়াষ শুয়ে আছে। কিন্তু চোখে ঘুম আসেনা। জুঁই কি তবে সব কথা মাকে বলে দিয়েছে? কে জানে ? তাহলে তো আর স্কুলে যাওয়াই হবে না। কি লজ্জা - কি লজ্জা ! তিয়াষ একী কাজ করলো। ক্ষণকালের আবেগের বশে তিয়াষ যে সত্যিই একটা ভুল করে ফেলেছে। এমন করা তো শোভন হয়নি। জুঁই যদি সত্যিই কথাটা বলে দেয়। বিছানায় শুয়ে অস্থির হয় তিয়াষ — কেবলই এপাশ ওপাশ করতে থাকে। ভাবতে ভাবতেই একসময় নিদ্রা এসে তিয়াষের দেহ-মনের অস্থিরতার উপর শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে যায়। ঘুমের ঘোরে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে তিয়াষ।

দু'টি পালক

সোহম, পলাশ ও তিয়াষ খেলতে খেলতে শুক সাগর জলার কাছে চলে যায়। হঠাৎ অঝোরে বৃষ্টি নামে । হু হু করে জল বেড়ে যায়। জলের প্রবল তোড়ে তারা তিন বন্ধুই ভেসে যেতে থাকে। পরস্পর পরস্পরের দিকে হাত বাড়ায়। কেউই কারো হাতের নাগাল পায় না। জল স্রোতে ভেসে চলে তিনজনই। প্রাণপনে সাঁতার কেটে ডাঙার কাছে আসতে চায়। কিন্তু পারে না, দেখতে দেখতে জল আরো বেড়ে যায়। একসময় দেখে যে সমস্ত উদয়পুর শহর একেবারে জলের তলায়। কোথাও কোন ঘরবাড়ি নেই। বন্যার জল আর গোমতীর জল মিলে-মিশে একাকার। তিয়াষ সোহম আর পলাশকে দেখতে পায় না। তারা জলের তোড়ে কোথায় যেন ভেসে গেছে। আকাশে বিজলী খেলছে। বৃষ্টি ঝরছে না। বৃষ্টির বদলে আকাশ থেকে জোনাকীর মতো এখন কেবল তারা ঝরে পড়ছে। জল নেই । তিয়াষ দেখে ভাসতে ভাসতে সে এক সম্পূর্ণ নতুন দেশে এসে হাজির। তিয়াষের দেহে রাজপুত্রের পোষাক। একটা নির্জন পথ। পথের দু'পাশে সারি সারি বিচিত্র সব ফুলের গাছ। তিয়াষ পথ দিয়ে এগিয়ে চলে। তিয়াষ যতই এগুতে থাকে , ততই দুই পাশের বৃক্ষরাজি থেকে রাশি রাশি ফুল পথের উপর ঝরে পড়ছে। ফুলের ওপর পা ফেলে ফেলে তিয়াষ এগিয়ে যায়। কিছুদুর এগিয়ে যাবার পর তিয়াষ দেখে শিঙা, ভেরী সহ নানা বাদ্যযন্ত্র সহ একদল লোক গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে। রাজকীয় পোষাকে সজ্জিত সব লোকজন। রাজকীয় ভেরী-তুরী সহ নানা বাদ্যযন্ত্রের শব্দে অসংখ্য লোক রাস্তায় বেরিয়ে আসে। ভেরী বাদকের সামনে একটা সুসজ্জিত হাতী শুঁড় দুলিয়ে এগিয়ে আসছে। হাতীটিকে আসতে দেখে তিয়াষ রাস্তার পাশে সরে যায়। হঠাৎ হাতীটি তিয়াষের সামনে এসে তাকে শুঁড়ে ঝুলিয়ে পিঠের ওপর রাজকীয় হাওদায় তুলে নেয়। তারপর এগিয়ে যায়। দেখে সামনে এক বিশাল রাজ প্রাসাদ। চারদিকে মণি-মানিক্যের গাছ। গাছে লাল-নীল-হলুদ-কমলা-সবুজ মেরুন রঙ বেরঙের আলো জ্বলছে— নিভছে। হাতী সোজা রাজ প্রাসাদের ভেতর ঢুকে যায়। রাজসভা বসেছে। সিংহাসনে মহারাণী বসে আছেন। হাতীটি সভায় ঢুকে তিয়াষকে হাওদা থেকে নামিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসে শুঁড় তুলে মহারানীকে অভিবাদন জানিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়। সভা নিস্তব্ধ। সভার প্রতিটি আসনে একই রকম পোষাক পরিহিত একই চেহারার বেশ কিছু লোক বসে রয়েছে। এঁরা সকলেই পাত্র- মিত্র-অমাত্য-মন্ত্রী সভাষদ। মহারাণীকে দুইজন পরিচারিকা দুই দিকে দাঁড়িয়ে চামর ব্যজন করে চলেছে। একজন মাথার উপর ধরে আছে রাজছত্র, আর একজনের হাতে রাজদন্ড। মহারানী হাত দিয়ে অদ্ভুত একটা ইশারা করলেন। আর এক মুহূর্তেই সমস্ত রাজসভা ফাঁকা হয়ে গেল। তিয়াষ দেখে সিংহাসনে মহারাণী একা বসে আছে। আর তার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে । মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে সিংহাসনে জুঁই বসে আছে। তিয়াষের দিকে চেয়ে

এবার বলে — মেয়েদের গালে আর কোনদিন চুমু খাবে ? এই কে আছিস — এই অসভ্য বদমাশটাকে বন্দী কর। এর বুকে পাথর চাপা দিয়ে একে কারাগারে রেখে দে।

ঠিক তক্ষুণি কোথা থেকে একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া সেখানে নামে। ঘোড়ার পিঠে তার বাবা। বাবাকে দেখে আশ্বস্ত হয় তিয়াষ।

বাবা তিয়াষকে বলে — শিগগির ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়। দেরী করিস না।

তিয়াষ একলাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসতেই পক্ষীরাজ ঘোড়াটি মহাশূন্যে উড়ে চলে। এমন সময় তিয়াষ শুনতে পায় — ওরে, বদমাশটা পালিয়ে যাচ্ছে — ধর্ — ধর্ ।

তিয়াষ ঘোড়ার পিঠে বাবার পেছনে বসে আছে। দুইহাত দিয়ে শক্ত করে বাবার কোমরটা ধরে থাকে তিয়াষ। পেছনে অসংখ্য লোকজনের কোলাহল শুনতে পায়। কৌতুহল বশে একবার পেছনে তাকায় তিয়াষ। ঠিক এই সময় পক্ষীরাজ ঘোড়াটি একটি মেঘের পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে মোড় নিতে যায়। ঠিক তখুনি তিয়াষের দুইটি হাত শিথিল হয়ে পড়ে, আর মুহূর্তেই ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে যায়। মহাশূন্য থেকে তীব্র গতিতে নীচের দিকে নামতে থাকে তিয়াষ। পক্ষীরাজ ঘোড়া নিয়ে বাবাও পেছন পেছন তিয়াষকে ধরতে আসে। দেখে সামনে অতল অন্ধকার। ভয়ে সারা শবীব বিবর্ণ নীল হয়ে যায় তিয়াষের। শ্বাস আটকে যায়। আর্ত চীৎকার করে ওঠে — বাবা —।

ঘুমের মধ্যে তিয়াষের ভয়ার্ত চীৎকারে নন্দিতাব ঘুম ভেঙ্গে যায়। বেড সুইচ জ্বেলে দেয়। তিয়াষ কোঁকাচ্ছে। নন্দিতা ছেলের বিছানার কাছে আসে।

এসেই তিয়াষকে ধাক্কা দিয়ে ডাকতে থাকে — বাবু — এই বাবু — কি হয়েছে তোর ? কি হয়েছে ?

নন্দিতা বুঝতে পারে ছেলে কোন স্বপ্ন দেখছে। মায়ের ডাকে তিয়াষের ঘুম ভেঙ্গে যায়। হকচকিয়ে বিছানায় উঠে বসে। সমস্ত গলাই শুকিয়ে কাঠ । মা বুঝতে পেরেই তাড়াতাড়ি জলের গ্লাস এগিয়ে দেয় তিয়াষের দিকে। তিয়াষ ঢক্ ঢক্ করে সব জল খেয়ে নে। তারপর দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে কিছুটা ধাতস্থ হয়।

তারপর বলে — মা, আমি একটি বিশ্রি স্বপ্ন দেখেছি। আমার ভয় করছে। আমি তোমার কাছে ঘুমাবো মা।

রাতও প্রায় শেষের পথে। নন্দিতা ছেলেকে নিজের বিছানায় নিয়ে আসে। মায়ের বুকে মুখ রাখে। মায়ের গলা জড়িয়ে শুয়ে পড়ে। নন্দিতাও ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

ছেলের মাথায় পিঠে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দেয়। ভাবে, ছেলে দেখতে দেখতে এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। সেদিনের সেই ছোট্ট তিয়াষটি এখন আর নেই। আগের মতো এখন আর ছেলেকে আদরও করতে পারে না। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সন্তানই কেমন যেন দূরের হয়ে যায়।

ছয়-সাত বছর পর্যন্ত তিয়াষ মায়ের বুকে ঘুমাতো। মায়ের বুকে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নন্দিতার শুষ্ক স্তন চুষতো। নন্দিতা বকলেও তিয়াষ শুনতো না। অফুরন্ত মাতৃস্নেহে নন্দিতার সারা বুক ছেলের জন্য ভরে যেত। তিয়াষ শৈশব থেকেই যে মায়ের বড় নেউটা। মা ছাড়া কিছুই বোঝেনা তিয়াষ। বড়ো হয়েও এখনো দিনে দু'তিন বার মায়ের গায়ে গড়াগড়ি না দিলে ভালো লাগেনা তিয়াষের।

সেই দুঃস্বপ্নের রাতেও মায়ের পাশে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নন্দিতার চুলের মিষ্টি গন্ধ অনুভব করে। হঠাৎ তিয়াষ মাকে এক অদ্ভুত অনুরোধ করে বসে। — মা, তোমার দুধ খাই, আজ কেমন যেন তোমার ছোট্ট তিয়াষ হতে মন চাইছে। তোমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে ছোট বেলায় যেমন দুধ খেতাম, তেমন খেতে ইচ্ছে করছে, ইচ্ছে করছে আগের ছোট্টটি হয়ে তোমার স্নেহ আদর পেতে।

ছেলের অনুরোধে নন্দিতার অন্তঃকরণেও জেগে ওঠে অপত্যস্নেহ। কোন প্রতিবাদ না করেই ব্লাউজ খুলে তিয়াষের মুখে শুকনো স্তন ভরে দেয় নন্দিতা। এক অনাবিল মাতৃ-স্নেহ ধারা চাঁদের সুধার মতো অন্তর থেকে অবিরল ধারায় উৎসারিত হতে থাকে। তিয়াষও যেন সেই ছোট্ট শিশুটির মতো মায়ের শুকনো স্তন মুখে পুরে টানতে থাকে। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখে নন্দিতা। এক সময় ফাগুনের ভোরের মিষ্টি হাওয়ায় মা ও ছেলের চোখে ঘুম নেমে আসে।

ঠিকে ঝি এসে দরজা ধাক্কা দেয়। — দিদি — ও দিদি — দরজা খোল —। মানদাটাও বড্ডো জ্বালায়। — ঘুমের মধ্যেই বলে ওঠে নন্দিতা। — তারপর বিছানা থেকেই উত্তর দেয় — দাঁড়া না বাপু, দাঁড়া। দরজাটা খুলছি। তোদের বাপু কিছুতেই তর সয় না।

বিছানা থেকে নেমে ঘরের দরজা খুলে দেয় নন্দিতা। তারপর ফের বিছানার পাশে ফিরে আসে। ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে নন্দিতা। ছেলের গায়ে হাত দিয়ে দেখে জ্বর নেই। নির্ভার মনে ঘুমুচ্ছে তিয়াষ। মশারীটা গুঁজে দিয়ে বাথরুমে চলে যায়।

অনেক বেলায় তিয়াষের ঘুম ভাঙ্গে। মা তাকে গরম জল করে দিয়ে বলে —যা

স্নান করে ফেল। আজ আর স্কুলে যেতে হবেনা। পুরো দিনটা বিশ্রাম নেয়। শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

স্নান সেরে নেয় তিয়াষ। সত্যিই বেশ ফ্রেশ লাগছে। মানদা মাসী রান্না সেরে রেখেছে। অবিশ্যি ভালো-মন্দ হলে নন্দিতা নিজেই রান্না করে। সকালে আজ আর তিয়াষের ব্রেকফাস্ট হয়নি। মাকে তিয়াষ বলেছে — মা, আজ আর ব্রেকফাস্ট করবো না। তোমার সঙ্গে একেবারেই খেয়ে নেব।

খাওয়া-দাওয়া সেরে নন্দিতা স্কুলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। মা চলে যাবার পর তিয়াষ ক্লাশের পড়া নিয়ে বসে। স্কুলের পড়ার পর গল্পের বই নিয়ে পড়তে বসে তিয়াষ। দুটো গল্প পড়েই রেখে দেয়। ভালো লাগেনা। স্কুলে না গেলে ভালোই লাগে না তিয়াষের। আজ সারাটা দুপুর যে কি ভাবে কাটাবে ভেবে পায় না তিয়াষ। আর তাছাড়া মা পই পই করে বারণ করেছে যেন ঘর থেকে বের না হয়।

নন্দিতা ছেলেকে স্কুলে যাবার সময় বলে যায় — বাবু, আজ বিশ্রাম নিবি। ঘর থেকে বেরোবার দরকার নেই। দুপুরে খেয়ে নিবি। তোর জন্য খাবার আলাদা করে ঢাকা দেওয়া আছে। স্কুল থেকে এসে বিকেলে ম্যাগী করে দেবো।

তিয়াষ তার পাঠ্যবইয়ের বাইরে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, রম্যরচনা পড়তে বড়ো ভালোবাসে। ইতিমধ্যেই তিয়াষ শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি উপন্যাস পড়ে নিয়েছে। রামের সুমতি, মেঝদি, বড়দি, পল্লী সমাজ, শ্রীকান্ত। বিভূতি ভূষণের আরণ্যক, পথের পাঁচালী। পথের পাঁচালীর অপু ও দুর্গাকে বড়ো ভালো লাগে তিয়াষের। বইটি এ পর্যন্ত বার কয়েক পড়েছে। সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী সিনেমাও দেখেছে কয়েকবার। তিয়াষের ডিটেকটিভ বই পড়তে খুবই ভালো লাগে। তার প্রিয় চরিত্র শার্লক হোমস, ব্যোমক্যাশ ও ফেলুদা। জিম করবেটের শিকার কাহিনীও তার বেশ ভালো লাগে। ব্যোমকেশ ও ফেলুদা পড়ে শেষ করে ফেলেছে। শার্লক হোমস পড়া শেষ। কিছুক্ষণ এ ঘর ও ঘর ঘুরে বেড়ায় তিয়াষ। আবার পড়ার টেবিলে বসে কয়েকটা অঙ্ক করে ফেলে।

অন্যমনস্কের সঙ্গেই এক সময় বাবার বইয়ের রেকের সামনে দাঁড়ায়। এটা ওটা খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "শেষের কবিতা"। উপন্যাসটি বাবা ও মাকে পড়তে দেখেছে তিয়াষ। বাবা কখনো বই পড়তে তিয়াষকে বারণ করে না। বই পড়ার অদম্য আকর্ষণ রয়েছে তিয়াষের মধ্যে। তিয়াষ ঠিক করেছে আজ দুপুরে খাবারের পর শেষের কবিতা পড়তে বসবে। একসময় টি.ভি দেখতে ভালো লাগলেও, এখন আর টি.ভি তেমন তিয়াষকে আগের মতো আকর্ষণ করে না। টিভির সামনে বসলে পড়ার যে

বেশ ক্ষতি হয়। তপোধীর কিম্বা নন্দিতা কেউই কোনদিন তিয়াষকে টিভি দেখতে বারণ করতো না। ছোট্ট বেলায় কার্টুন ভালো লাগতো। টম এন্ড জেরী তার প্রিয় কার্টুন সিরিয়াল। এখন একটি বা দুটি টিভি সিরিয়াল দেখে। একবছর - দু বছর ধরে চলা সিরিয়াল আর ভালোই লাগে না তিয়াষের।

খবরটা রেডিওতে শোনাই — তিয়াষের পছন্দ। রেডিওতে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনতেও ভালো লাগে। ডিস্কে একটানা গান শুনতে কেমন বোর লাগে তিয়াষের। চার চাইতে ক্যাসেটে গান শুনতে অনেক বেশী স্বচ্ছন্দ বোধ করে তিয়াষ।

দুপুবের খাবার খেয়ে টি.ভিতে ডিসকোভারী চ্যানেলটা খুলে বসে তিয়াষ। স্টিভ আরউইনের দুঃসাহসিক কুমীর ধরার এপিসোড দেখছিল। এমন সময় বাইরে কলিং বেলটা বেজে ওঠে।

তিয়াষ এগিয়ে এসে দরজা খুলে দেখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জুঁই। পিঠে স্কুল ব্যাগ। পরনে স্কুল ইউনিফর্ম।

আপ্যায়নের অপেক্ষা না করেই খোলা দরজা দিয়ে জুঁই ঘরে ঢুকে পড়ার টেবিলের উপর বইয়ের ব্যাগটা ছুঁড়ে রেখে দিয়েই তিয়াষেব দিকে তাকিয়ে কোন ভনিতা না করেই বলে — শেষ পর্যন্ত আমাকে আনলে তো !

তিয়াষ জুঁইকে দেখে কেমন হকচকিয়ে যায়। কোন কথাই বলতে পারে না। স্বাভাবিক হতে একটু সময় নেয়। কাল রাতের স্বপ্নের কথাটাও মনে পড়ে যায়। গতকালের আচরণের জন্য জুঁইয়ের কাছে নিজেকে বড্ডো ছোট মনে হয় তিয়াষের।

জুঁই সরাসরি তিয়াষের দিকে তাকিয়ে কোমরে দুটো হাত রেখে গম্ভীর গলায় স্কুলের দিদিমণির মতো বলে ওঠে — আজ স্কুলে যাওনি কেন? মিষ্টি মাসী সকাল বেলা ফোন করে বলেছিল তোমার নাকি জ্বর হয়েছে। দেখি জ্বর আছে কিনা ? — বলেই তিয়াষের কপালে হাত দিয়ে দেখে শরীরে জ্বর নেই।

তারপর ভেংচি কেটে বলে — গা তো দেখি সাপের গায়ের থেকেও ঠান্ডা। বলি, এত ঢং করার কি ছিল? মেয়েদের গালে চুমু খেলে কি হয় বুঝতে পেরেছ তো ?

বলেই খিল খিল করে পাগলা ঝর্ণার মতো হেসে ওঠে জুঁই। হাসলে জুঁইকে অপূর্ব সুন্দর দেখায়। তারপর বলে — কালকের কথা কাউকে বলিনি। তোমার অত ভয় পাবার কিছু নেই। আমাকে অত বোকা ভেবো না।

তারপর স্বগোতক্তির মতো আবার বলে ওঠে — আমিই তো তোমার গলা

জড়িয়ে আদর পেতে চেয়েছিলাম। তুমি আমায় আদর করে চুমু খেলে। আমার যে কী ভালো লেগেছিল। জান, আমি সারারাত ঘুমুতে পারিনি। কেমন একটা মিষ্টি শিহরন জেগেছে মনে। তোমার অমন হয়নি?

আবার সিরিয়াস হয় জুঁই। একটু কৌতুকের সুরে বলে — এমন ভীতু হলে চলবে কেমন করে? এক চুমু খেয়ে যদি এমন জ্বর এসে যায়, তবে সারা জীবন কি তুমি জ্বরে জ্বরে ভুগে ভুগে মরবে নাকি? কত মেয়ে যে তোমাকে গাল পেতে দেবে চুমু খেতে। তোমার ভালো লাগলে খেয়ে নিও। কিন্তু অন্য মেয়ের গালে চুমু খেয়ে আমাকে কখনো বলবে না। আমি তোমাকে সাবধান করে দিলেম বাপু। তা হলে কিন্তু আমার গালে আর কোনদিন চুমু খেতে দেব না।

একটানা! অনেকক্ষণ বকে এবার থামে জুঁই।

তিয়াষ এবার ধাতস্থ হয়। বলে — বাড়িতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। তোকে এখানে একা আসতে কে বলেছে ? যা শিগগির বাড়ি যা। না হলে রাঙ্গা মাসীকে বলে দেব।

জুঁই — আমার সঙ্গে বেশী পাকামি করবে না। এখানে একা-দোকার কি ব্যাপার হলো? বেশী বেশী করতে যেও না। তাহলে কালকের কথাটা ঠিক ঠিক মাকে বলে দেবো। আমাকে চিনতে তো তোমার বাকী নেই নিশ্চয়ই। তারপর কি হবে বুঝতে পারছ?

তিয়াষ — তুই সত্যিই বলে দিবি ?

জুঁই — আমার সঙ্গে পাকামি করলে তো সত্যিই বলে দেবো।

তিয়াষ — তুই এখানে থেকে কি করবি ?

জুঁই — আমার যা খুশী তাই করবো।

তিয়াষ — তোদের স্কুল ছুটি হয়ে গেছে?

জুঁই — না, বড় দিদিমণিব কাছে মাথা ধরেছে বলে ছুটি নিয়ে এসেছি।

তিয়াষ — মিথ্যা বলে ছুটি নিলি?

জুঁই — ও আমার ধম্মপুত্র যুধিষ্ঠির দেখছি। তোমার জন্যে মিথ্যে বললে আমার পাপ হবে না।

তিয়াষ — ক্লাস না করে ছুটি নিয়েছিস?

জুঁই — আমি তো জানি মাসী স্কুলে চলে গেছে। তুমি বাড়িতে একা। আমি না এলে তোমাকে দেখবেটা কে ?

দু'টি পালক

তিয়াষ — খুব বড় বড় ভাব দেখাচ্ছিস যে ? ও যেন আমার ঠাকুমা এলেন আর কি ? তুই কি আমার চেয়েও বড় হয়েছিস্ নাকি ?

জুঁই — আমি তো আর এখন ছোটও নই। জান, এখন আমি ভাল ভাত রাঁধতে পারি। চা করতেও জানি। বাবাকে আমিই এখন চা করে দিই। চা খাবে তিয়াষদা। আমিও খাবো। দু'কাপ করে নিয়ে আসি।

তিয়াষ — এটা কোন রান্না হলো। চাল ধুয়ে ডেকচিতে চাপিয়ে দিয়ে গ্যাস জ্বালিয়ে দিলেই ভাত হয়ে যায়। ভাত রান্নার জন্য ইঞ্জিনীয়ার হতে হয় না। — এই জুঁই, তোর এত বড় বড় ভাব আমার ভালো লাগে না।

জুঁই — ভালো না লাগলে চুমু খেতে গিয়েছিলে কেন ? চুমু খেলে পেট ভরে ?

তিয়াষ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে — নারে জুঁই, কাল কেমন জানি হয়ে গিয়েছিলুম। আব কোনদিন এমন হবে না। জানিস কাল স্বপ্নেও আমি তোকে দেখেছি।

তাবপব তিয়াষ এক এক করে গতরাতে দেখা পুরো স্বপ্নের কাহিনী জুঁইকে বলে।

জুঁই পুরো গল্প শুনে হাসতে হাসতে বলে — কী বীরপুরুষ তুমি ! ভাগ্যিস কাকাবাবু তোমাকে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে উদ্ধার করে এনেছিল। না হলে তো তোমাকে বুকে পাথর চাপা অবস্থায় সারা জীবনই কারাগারে কাটাতে হতো। সত্যি সত্যি — এমন হলে ভারী মজা হয, তাই না।

— বলেই আবার খিল খিল করে হেসে ওঠে জুঁই। — জুঁই হাসলে রূপকথার রাজকন্যার মতো তার মুখ দিয়ে সত্যি সত্যিই যেন মুক্তা ঝরে পড়বে।

একটু চুপ করে থেকে জুঁই আবার দুষ্টুমির সঙ্গে বলে — তোমায় একটা কথা বলবো তিয়াষদা।

তিয়াষ — এতক্ষণ যেন কোন কথাই বলিসনি মনে হয়। মাঝে মাঝে এমন ভাব দেখাস না, সত্যিই মেজাজটা বিগড়ে যায়।

জুঁই — একটা গোপন কথা বলবো ?

তিয়াষ — কোন গোপন কথা বলতে হবে না। এখানে কেউই নেই। ফলে আর কারো শোনারই সম্ভাবনা নেই। যা বলবি সবই গোপন কথাই বলা হবে। কি বলবার, তাড়াতাড়ি বল।

দুষ্টি পালক

মুখ ভার করে জুঁই এবার বলে — না, তোমাক কোন কথাই বলব না। তোমার ন্যাকামো না আমার একদম ভালো লাগে না। — বলেই ভেংচি কাটে জুঁই — । তারপর আবার বলে — এখানে কেউ নেই, সবই গোপন কথা। গোপন কথা কেউ না থাকলেও চুপে - চুপেই বলতে হয়, জানো ? তিয়াষ এবার কপট রাগ দেখায়। তারপর বলে '—এই জুঁই, তুই আমাকে ভেংচি কেটে কোন কথা বলবি না, বলে দিলাম।

জুঁই — তোমার সঙ্গে আমার আড়ি। আর কোন কথা নেই। আমার এখানে আসা — বড্ডো গাঁট হয়েছে । আমি চললাম।

বলেই বইয়ের ব্যাগটা পিঠে চাপিয়ে জুঁই এবার বের হতে যায়। তিয়াষ পথ আগলে দাঁড়ায়। তারপর বলে — মহারাণীর রাগ দ্যাখোনা। এবার কিন্তু মহারাণীকে বেঁধে রাখবার ব্যবস্থা করবো।

রাগের ভান করে জুঁই বলে — কেউ আমার পথ আটকে রাখুক এ আমার একেবারেই পছন্দ নয়। যে আমাকে দেখতে পারে না, তার পথ আটকানোর কোনই অধিকার নেই।

তিয়াষ এবার নরম হয়ে বলে — তোর গোপন কথা কি আছে বল। জুঁই এবার হেসে ওঠে। রাগ তরল হয়। বলে — কেন, যাবার কথা শুনে পথ আটকাচ্ছিলে কেন ? ঢং। আমায় না দেখে থাকতে পারো না, মহারাজ আবার মেজাজ দেখায়। আমি তোমার মনের কথা বুঝিনা ভাবছ ? সবই বুঝি। তুমি আমায় আর ছোট ভাববে না। বলে রাখলাম। মনে রেখো।

তিয়াষ — জুঁই, সত্যিই তুই সব বুঝতে পারিস্ ? কেমন করে বুঝিস বল্ তো। আমি আসলেই বোকা রে, আমি অনুমান করতে পারি, তোদের - মেয়েদের কিছুতেই বুঝতে পারি না। তোরা — মেয়েরা জানি কেমন।

জুঁই — তুমি জাননা বুঝি ? সব মেয়েরাই এসব বেশ ভালো বোঝে। মেয়েরা অল্প বয়সেই গিন্নিপনা শিখে ফেলে। জান, আমার ক্লাশে রুমা নামে একটি মেয়ে আছে। সে একদিন আমায় খুবই একটা খারাপ কথা বলেছিল।

তিয়াষ — কি বলেছিল ?

জুঁই — যা, তোমাকে সে কথা বলতে পারব নাকি ? মেয়েটির বাবা তার মাকে ছেড়ে দিয়ে আবার একটি বিয়ে করেছে। ওদের কথা শোন না। ওরা ভালো মেয়ে নয়। আমি মেয়েটিকে এখন এড়িয়ে চলি। দেখলে কম কথা বলি। তোমাকে বলতে না পারলেও মাকে বাড়ি গিয়ে সব কথা বলে দিয়েছি। মা আমায় সাবধান করে দিয়ে বলেছে —

মামণি, ওর সঙ্গে আর কোনদিন মিশবিনা। সেই থেকে রুমাকে আমি এড়িয়ে চলি।

তিয়াষ বুঝতে পারে যে খুবই একটা খারাপ ব্যাপার। তাই সে আর শোনার আগ্রহ দেখাল না। তারপর একটু চুপ থেকে জুঁইকে বলে — তোর গোপন কথা এবার বল। শুনি।

জুঁই — তুমি খাটের উপর বস। আমি তোমার কানে কানে বলব।

তিয়াষ — দেরী করবি না কিন্তু। তাড়াতাড়ি বলবি। এই আমি খাটে বসলুম।

জুঁই — শোন, বলেই তিয়াষের কানের কাছে মুখ নিয়ে হঠাৎ তিয়াষকে জড়িয়ে ধরে - তার দুই গালে দুটো চুমু দেয় জুঁই।

তিয়াষ বড়োই অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

জুঁই এবার তিয়াষকে ছেড়ে দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠে বলে — কালকের প্রতিশোধ। কাল তুমি আমার এক গালে চুমু খেয়েছিলে। তাই আজ তোমার দুই গালে চুমু খেলাম। — বুঝলে কিছু।

তিয়াষ — জুঁই, তুই বড্ডো পাকা আর দুষ্টু হয়েছিস্ রে। হ্যাঁরে জুঁই, কাল শিব ঠাকুরের ব্রত করতে গিয়ে - ঠাকুরকে দুধ, বেলপাতা দিয়ে কি বর চাইলি, তা বললি না তো।

জুঁই — তোমাকে বলতে আমার বয়েই গেছে। তুমি আমার কে যে তোমাকে আমার গোপন প্রার্থনার কথা বলবো।

তিয়াষ — আমি বুঝি তোর কেউ নই ?

জুঁই এবার তিযাষের দিকে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলে — তুমিই বল না, আমি তোমার সত্যিকারের কে হই?

তিয়াষ এবার জুঁইয়ের কথায় হকচকিয়ে যায়। সত্যিই তো, জুঁই তিয়াষের তো আসলে কেউই নয়। এক কাল্পনিক সম্পর্কের সুক্ষ্ম সুতোর মধ্যে এই দুইটি অবুঝ প্রাণ ঝুলছে। মনে মনে তারা দু'জনেই একটা সম্পর্ক হয়তো তৈরী করে নিয়েছে। কিন্তু কি যে সেই সম্পর্ক কাউকে বলার কোন উপায় নেই। কাল্পনিক সেই সম্পর্কেব কোন সামাজিক বা পারিবারিক স্বীকৃতি নেই। নিকট ভবিষ্যতে সেই সম্পর্কের কোন পরিণতিরও সম্ভাবনা নেই। তাদের বাইরে একটা সম্পর্কে, হৃদয়ে আর একটা। জুঁই, তিয়াষকে তিয়াষদা বলে। তাদের ব্যবহারিক যে সম্পর্ক, তা তো ভাই-বোনের সম্পর্কের মতোই। কিন্তু তারা যে

ভাবে নিজেদের ভাবনার জগৎকে ভরিয়ে তুলতে চাইছে, সেখানে যাবার পথ দুর্গম না হলেও সহজ নয়।

জুঁই একটু পরে বলে — বলতে পারলে না তো। আমিও জানি তুমি বলতে পারবে না। কাল ঠাকুরের কাছে কি বর চেয়েছি, শুনবে?

তিয়াষ — তুই, সত্যিই বলবি?

জুঁই — হ্যাঁ গো। হ্যাঁ। সত্যি বলবো। শোন —। কাল ঠাকুরের কাছে বলেছি — দূর, আমার লজ্জা করছে। বলতে পারব না।

তিয়াষ — ঠাকুরের কাছে বর চাইতে তোর লজ্জা হলো না। অথচ আমার কাছে বলতে তোর লজ্জা হচ্ছে?

জুঁই — মেয়েদের গোপন কথা শোনার জন্য তোমার এমন আগ্রহ কেন বাপু।

তিয়াষ — মেয়েদেব গোপন কথা কোথায় ? আমি তো তোর কথা শুনতে চাইছি।

জুঁই — আমি বুঝি মেয়ে নই ?

তিয়াষ — তুই তো, অন্য মেয়েদের মতো নয়। তুই তো আমার জুঁই।

জুঁই — তোমার জুঁই হলাম কবে ?

তিয়াষ — যেদিন তুই আমাকে তোদের কোয়ার্টারে টেনে একেবারে ঘরে নিয়ে গিয়েছিলি। সেদিন থেকেই তুই আমার জুঁই।

জুঁই — আমার মনে নেই।

তিয়াষ — তোর মনে না থাকলেও চলবে।

জুঁই — আমি কখনো তোমার হতে চাই না। আমি তোমার কেনা নাকি ?

তিয়াষ — কিনলে কেউ আপন হয় না রে। না কিনে আপন করলেই সেইই সত্যিকারের আপনজন। যে আমার চিরকালের, তাকে কিনে ছোট করবো কেন ?

জুঁই — তুমি আমাকে গায়ের জোরে নেবে নাকি ?

তিয়াষ — গায়ের জোরে নেওয়া আর কিনে নেওয়া এক কথাই রে। তোকে কিনেও নেবো না, গায়ের জোরেও নেবনা। তোকে এমন জোরে নেব, যা কেউ কোনদিন দেখতে পায় না।

দু'টি পালক

জুঁই — তোমার এমন ভারী ভারী কথা আমি বুঝিনা। বাবা বলে, এমন কথা নাকি জ্ঞানী-গুনী বড় বড় দার্শনিকরা বলে। তুমি তো তাদের মতো হওনি। নিশ্চয়ই বইটই পড়ে বলছ।

তিয়াষ — তুই এত কথা কেমন করে যে বুঝিস, তা সত্যিই আমি বুঝতে পারিনা। অনেক কথা তো হলো। এখন কাল ঠাকুরের কাছে কি বলেছিস, তা তাড়াতাড়ি বলে ফেল। চোখ বুঝে বললে লজ্জা করবে না। আমিও চোখ বুঝেই শুনব। মা চলে এলে আর শুনতে পাবো না। তোরও বলা হবে না। পরে বাড়ি গিয়ে রাজা মশায়ের টুনটুনির মতো অবস্থা হবে।

জুঁই — চোখ বুজে থাকলে কি লজ্জা করবে না ?

তিয়াষ — লজ্জা তো সত্যিই চোখের। চোখ না থাকলে লজ্জা কিসের ?

জুঁই ঠাকুরকে দুই হাত জোড় করে প্রণতি জানায়। তারপর হাত দুটো চোখের উপর চাপা দিয়ে বলে — আমি ঠাকুরকে বলেছি । হে ঠাকুর, আমি যেন তিয়াষদাকে আমার স্বামী হিসাবে পাই। আমার এই মনোবাসনা তুমি পূর্ণ করো ঠাকুর।

এরপর চোখের উপর থেকে দুই হাত সরিয়ে টুক করে তিয়াষকে একটা প্রণাম করে জুঁই। তারপর বলে — জানো তিয়াষদা, কাল তোমাকে প্রণাম করার বড্ডো ইচ্ছে ছিল। তুমি তো চলে এলে। আমার যে কী খারাপ লেগেছিল, তা বলার নয়। আমি তো কাল আসলে তোমার জন্যই উপোষ করেছিলাম। আর কালই তুমি প্রথম আমার গালে চুমু খেলে। কালই আমার প্রথম মনে হয়েছে — এবার আমি সত্যিই বড় হয়েছি। কালই যেন আমার মধ্যে একটা নারীর জন্ম হল।

জুঁইয়ের কথা শুনতে শুনতে তিয়াষের মন কেমন যেন ব্যথাতুর হয়ে ওঠে। অন্তরের মাঝে সমুদ্রের মতো একটা উথাল-পাথাল তোলপাড় শুরু হয়। একটা নিশ্চেষ্ট অবসাদ অনেকক্ষণ তিয়াষকে অবশ করে রাখে। অ্যানেসথেসিয়া করলে যেমন হয়। এও যেন তেমনি একটা অবস্থা। কোন রকম ভাষা বা আকৃতি দিয়ে এই অবস্থার প্রকাশ যে সম্ভব নয়। তিয়াষ বুঝতে পারে এ এক অনতিক্রম্য ভবিতব্যতা। এখন শুধু অপেক্ষা আর প্রতীক্ষা। মানব জীবন তো গাছের ডালে জেগে ওঠা ফুল কুঁড়ি নয় যে দেখতে দেখতেই ফুটে ফুল হয়ে ঝরে পড়বে। তাদের চলার পথ যে অনেক দীর্ঘ। তিয়াষ তাদের দু'জনের সম্পর্ক বুঝে গেছে। কাউকে বলার কিছুই নয়। বলার যে কোন প্রয়োজনও নেই। এখন থেকে যে অতীব সতর্ক হয়ে চলতে হবে তাদের দু'জনকে। জুঁই এখনো ছোটই। তবে বেশ

পরিণত।

এতদিন তারা যে প্রতিনিয়ত খুনসুটি করে এসেছে, তিয়াষ বুঝতে পারে যে তাদের শৈশব-কৈশোরের খেলা-বেলার খুনসুটি করার এবার যে অবসান ঘটলো। জীবনের বাকী পথ যে তাদের দু'জনকে অতীব সতর্কতার সঙ্গে পাড়ি দিতে হবে। তাদের দু'জনের সম্পর্ক আজ আর কোন অস্পষ্ট কুয়াশার মায়াজাল নয়। এক অতি স্পষ্ট অনাগত সুদুর বাস্তব। আজ থেকে জুঁই এক পূর্ণ নারী, তিয়াষ এক পূর্ণ পুরুষ। এই ভাবনা নিয়েই তাদের এখন স্বপ্নের পথ পাড়ি দেবার জন্য তৈরী হতে হবে। কয়েক ঘন্টা আগেও তিয়াষ মায়ের বুকে - মাকে জড়িয়ে ধরে ছোট্ট শিশুটির মতো ঘুমিয়েছিল। শুধু তাই নয়, নির্দ্ধিধায় মায়ের শুকনো স্তন চুষেছে। নন্দিতাও তিয়াসকে তার ছোট্ট সোনামণি ভেবেই আদর করেছে। ছেলে বড়ো হয়েছে জেনে বুঝেও সন্তানের মুখে অসংকোচে স্তন দিয়েছে। ছেলের আব্দার রেখেছে। নন্দিতার একবারও তিয়াষকে পুরুষ মনে হয়নি, তার খোকাই মনে হয়েছে।

আজ থেকে যে মায়ের সঙ্গেও একটা দুরত্ব তৈরী হবে। মায়ের কোল ঘেঁষে বসতেও যে এবার তার সংকোচ করবে। তিয়াষ যে আর মায়ের কাছেও স্বাভাবিক হতে পারবে না। কেননা, তিয়াষের পাশে যে অন্য এক নারীর অভ্যুদয় ঘটেছে। শিশুরা তাদের শৈশব এবং কৈশোর অতিক্রম করে একসময় নারী-পুরুষ হয়ে ওঠে। সেই সময় মা-বাবার সঙ্গেও যে তাদের একটা দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠতে থাকে। সেই ব্যবধান মননের, সেই ব্যবধান জৈবিক, সেই ব্যবধান ব্যবহারিক, তাকে অস্বীকার করা যায় না। মেয়েদের মাতৃত্ব প্রকাশ পেলে তারা বাবা, দাদা, ভাইদের সঙ্গেও একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতে চায় বা চলে। ছেলেরাও তেমনি, মা, দিদি, বোঁনদের সঙ্গে তেমনি একটা সীমারেখা বা লক্ষ্মণরেখা মান্য করে চলে। সেই গন্ডী ভাঙ্গে না।

নারী যে চিরকাল পুরুষের সম্পত্তি । মাকেও তো তিয়াষ বাবার সম্পত্তিই মনে করে। মায়ের উপর যে বাবার পূর্ণ অধিকার। এতকাল তো তিয়াষ মাকে নারী রূপে কখনো দেখেও নি, ভাবেও নি। এখন যে তার মাও জুঁইয়ের মতোই এক নারী। অল্প কয়েক ঘন্টার ঘটনা পরস্পরায় তিয়াষের মনঃ স্তরে এক আশ্চর্য রসায়ন সংগঠিত হয়েছে। এই মুহূর্তে তিয়াষ বুঝতে পারে জগতের সব মাতৃ জাতিই নারী। তারা কোন না কোন পুরুষের অধিকারে নিজেদের সমর্পিত করে তৃপ্ত হতে চায়। পুরুষও নারীকে বীরভোগ্যা বলে নিজের মতোই ভোগ করে যায়। পুরুষও নারী ভাগ্যে নিজেকে ভাগ্যবান ভাবে।

তিয়াষ বলে —জুঁই, মা এসে যাবার সময়ে হয়েছে রে। চল্, আমরা গান গাইতে বসে যাই।

দু'টি পালক

জুঁই বেপোরোয়া, নাছোড়বান্দা। সে বলে — আমি যে তোমায় প্রণাম করলাম তিয়াষদা, তুমি আমায় আশীর্বাদ করবে না?

তিয়াষ —আমার কি কাউকে আশীর্বাদ করার বয়স হয়েছে, না কোন অধিকার জন্মেছে ? গুরুজনরাই যে ছোটদের আশীর্বাদ করে। আমি কি পারি ?

জুঁই —তুমি আমার বড় । শাস্ত্রে বলে - পতি পরমগুরু। সেই নিরিখে তুমি আমার গুরুজন। আমাকে আশীর্বাদ করার অধিকার তোমার আছে ।

তিয়াষ — তোকে কি আশীর্বাদ করবো বল্‌তো।

জুঁই — আশীর্বাদের কথা কি কেউ কাউকে বলে দেয় ? আমি যদি তোমাকে বলি — তুমি আমায় এই কথা বলে আশীর্বাদ কর। সে তো আমার কথা হবে, তোমার আশীর্বাদ হবে না।

তিয়াষ — সত্যি রে জুঁই। তুই আমার থেকে অনেক বেশী বুঝিস রে। তোর মতো আমার বোঝার বুদ্ধি এখনো হয়নি। তোকে আশীর্বাদ করি, তুই পরিপূর্ণা মানবী রূপে চিরকাল আমারই থাকবি।

জুঁই — তিয়াষদা, আমি যে চিরকাল তোমারই থাকতে চাই যে।

তিয়াষ — তাই থাকবি। - একটু থেমে ফের বলে - ফ্রীজে খাবার আছে। তোর যা ভালো লাগে খেয়ে নে। তারপর গান গাই চল। আমি তবলা আর হারমোনিয়াম আনছি। তুই রেডি হয়ে নে।

জুঁই হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরে। তিয়াষ তবলায় সহযোগিতা করে। জুঁই গাইতে থাকে " খেলা ঘর বাঁধতে লেগেছি আমার মনের ভিতরে।" আপন মনে সুরের আবেশে ডুবে যায় তিয়াষ ও জুঁই। সুরের মায়াজালে সমস্ত ঘরই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এরই মধ্যে নন্দিতা স্কুল থেকে ঘরে ফিরে এসেছে। তাদের দু'জনকে গান গাইতে দেখে নন্দিতা বাথরুমে চলে যায়। হাত মুখ ধুয়ে পোশাক বদল করে, তাদের পাশে এসে বসে। ততক্ষণে জুঁই গানের শেষ চরণে, 'যে আমার নতুন খেলার জন তার এই খেলার সিংহাসন...

ভাঙারে জোড়া দেবে সে কিসের মন্তরে।"

গান শেষ হলেও অনেকক্ষণ সুরের রেশ সারা ঘরময় ছড়িয়ে থাকে। জুঁই এবার নন্দিতাকে

বলে - মিষ্টি মাসি, তুমি এবার একটা গান গাও না। নন্দিতা কোন ভণিতা না করেই দরাজ গলায় গান ধরে,

"আমার মল্লিকা বনে ...

... যখন প্রথম ধরেছে কলি।"

গান শেষ করে উঠে পড়ে সবাই। শেষ ফাগুনের বিদায় বেলা। দিবা অবসান। ধনী সাগরের পার ছেড়ে তারা এখন জগন্নাথ দীঘির পারে। অস্ত সূর্যের রশ্মি আভা খোলা জানালার দ্বার পথে ঘরে ঢুকেছে। মনের অতল বিস্তারে কিম্বদন্তী প্রতীকের নানা ওঠা-পড়া।

নন্দিতা শুধায় — জুঁই কখন এলোরে ?

তিয়াষ — তুমি তোমার মেয়েকে জিগ্যেস কর না। উনি এখন কর্ত্রী হয়ে উঠেছেন। দুই ঘন্টা ক্লাশ করে ছুটি নিয়ে চলে এসেছেন। আমার জ্বর হয়েছে। তাই তিনি স্বঘোষিত সেবিকার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে সেবা করতে এসেছেন।

নন্দিতা কিছু বলবার আগেই জুঁই তার গলা জড়িয়ে ধরে বলে — তুমি সত্যি করে বলতো, তুমি আমার মা, না মাসি।

নন্দিতা জুঁইয়ের মিষ্টি গালে আঙুলের টোকা দিয়ে ছোট্ট চুমু খেয়ে বলে — আমিও তোর মা। আগে তোর এক মা ছিল, এখন দুই মা হল। তুই খুশী তো।

নন্দিতার গলা ছেড়ে দিয়ে জুঁই ঘরের মধ্যে আনন্দে লাফাতে লাফাতে তিয়াষকে উদ্দেশ্যা করে বলে -- তোমার ভাগে এবার ভাগ বসালুম তো। মা এখন অর্দ্ধেক তোমার, বাকী অর্দ্ধেক আমার। জুঁইয়ের কথা শুনে তিয়াষ মাকে জড়িয়ে ধরে বলে -- মা, আমার। তুই আমার সব নিয়ে যা। কিন্তু মা পাবি না। আমি সব দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু মা দিতে পারব না।

কিছুক্ষণ দু'জনেই মা নিয়ে খুনসুটি করতে থাকে। এ বলে আমার মা, ও বলে আমার মা। শেষে নন্দিতা দুইজনকে দুই পাশে বসিয়ে আদর করে দিয়ে বলে — মা দুর্গা তো সকলেরই মা। মা তো সব সন্তানেরই মা। মা দুর্গাকে সবাই যখন 'মা' বলে ডাকে কার্তিক আর গণেশ কি তখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে ? তারা তো খুশীই হয়।

তিয়াষ — তোমার এই মেয়ে বড় পাকা হয়েছে। তুমি ওকে সামাল দাও। আমাদের বাড়ি যেন আর কক্ষনো না আসে।

জুঁই — আমার কি বাড়ির মালিক রে। আমি তোমার বাড়ি আসি নাকি? আমি

আমার মাসীর বাড়ি আসি। তুমি রোজগার করলে তবে আমায় আসতে বারণ করো। এখন তোমার বারণ শুনতে আমার বয়ে গেছে। একটু থেমে ফের বলে — তোমার যদি একটা ছুঁছোর মতো বৌ আসে, খুব ভালো হয়। তখন টের পাবে। কত ধানে কত চাল।

এ সময় হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে ওঠে। নন্দিতা রিসিভার তুলে বলে — হ্যালো। ওপারে মাধুরীর গলা। - কে নন্দিতা। হ্যাঁরে, জুঁই কি তোদের বাড়ি ? স্কুল ছুটি হয়েছে অনেকক্ষণ। মেয়ে এখনো বাড়ি আসেনি। স্কুলে ফোন করলাম। বলল দ্বিতীয় ঘন্টার পরই ছুটি নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

নন্দিতা বলে — হ্যাঁরে। জুঁই তো আমাদের ঘরেই। তোকে কিছু জানায় নি? হিমাদ্রিদাকে বলে দিস, অফিস থেকে ফেরার পথে জুঁইকে নিয়ে নিতে। - বলেই রিসিভার রেখে দে নন্দিতা। তারপর জুঁইকে বলে — জুঁই, তুই তো এখন বড় হচ্ছিস। বাড়িতে মাকে বলিস নি কেন? এ ঠিক করিস নি। এরপর যখনই কোথাও যাবি, মাকে জানিয়ে যাবি। মেয়ে বড় হলে যে মায়েদের দুশ্চিন্তা বাড়ে রে।

জুঁই – বড় হচ্ছি, বড় হচ্ছি বলছ কেন ? আমি তো বড় হয়েই গেছি । বড় হয়েছি বলেই বলিনি। বাড়ি গিয়ে তো বলতামই যে তোমাদের এখানে এসেছি। এনিয়ে বাড়ি মাথায় করাব কি আছে।

নন্দিতা - তুই বড্ড কাট কাট কথা বলতে শিখেছিস্।

জুঁই — না হলে তো চলবে না মাসী। না হলে যে দজ্জাল শ্বাশুড়ীদের টিট্ কবা যাবে না।

নন্দিতা জুঁইয়ের কথায় হেসে ওঠে। তারপর বলে — তুই খুবই দুষ্টু হয়েছিস্। সব শ্বাশুড়ী দজ্জাল হয় না রে। সবাই একরকম হলে কি সংসার চলতো। চলতো না।

অফিস থেকে ফেরার পথে হিমাদ্রি তিয়াষদের বাসা থেকে জুঁইকে নিয়ে যায়।

দু'টি পালক



গ্রীষ্মের ছুটি পড়ে গেছে। নন্দিতা, তিয়াষকে নিয়ে সোনামুড়া চলে যায়। পুরো ছুটি সোনামুড়া কাটাবে। অফিসের খুব কাছেই মহকুমা শাসকের সরকারী কোয়ার্টার। প্রচুর ফুল-ফলের গাছ। সবজী ক্ষেত করার বড়ো শখ তপোধীরের। অফিসেও কাজের চাপ বেশী। ভোর থেকে রাত পর্যন্তই কাজ থাকে। সোনামুড়া মহকুমার বিস্তীর্ণ সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে মুস্লিম সম্প্রদায়ের বাস। ওপারে বাংলাদেশ। পাচার বানিজ্যই এখানকার বড় শিল্প। এই অবৈধ কাজে অত্র অঞ্চলের দুই পারেরই এক শ্রেণীর লোক জড়িত। এইসব নিয়ে হামেশাই বি.এস.এফের সঙ্গে ঝামেলা হয়। চুরি, ডাকাতি, খুন-জখম সহ নানা অসামাজিক কাজ কর্ম চলে। ফলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজেও তপোধীরকে সবিশেষ ব্যস্ত থাকতে হয়। বৌ-ছেলে এলেও তপোধীর অফিসের কাজে বেশী ব্যস্ত থাকায় সংসারের জন্য বেশী সময় দিতে পারে না। এদিকে অপরিচিত জায়গায় এসে মা-ছেলেব মনের অবস্থা খুব ভালো নয়। নন্দিতা স্বামীর উপর রেগেই রয়েছে বলা যায়। মা-ছেলের কোন কাজকর্মই নেই। অখন্ড অবসর। তিয়াষ পড়ার সময় পড়াশুনো করে, বাকী সময় মা ও ছেলে কখনো টি.ভি দেখে আবার কখনো বা লুডো খেলে কাটিয়ে দিচ্ছে।

নন্দিতা আনকোরা নতুন এখানে। তাতে আবার এস.ডি.ও সাহেবের বৌ। সকলের ম্যাডাম। সম্মান ও সমীহর ঠ্যালায় কেউই কাছে ঘেঁষে না। রাস্তায় দাঁড়ায়। পথ চলতি লোকজন ম্যাডামকে দেখে মাথা নিচু করে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। নন্দিতার বড়ই অস্বস্তি হয়। নন্দিতা তো এস.ডি.ও নয়। সে নিজে যে একজন শিক্ষিকা। স্বামীর পদ মর্যাদার জোরে অহেতুক এই বাড়তি সম্মানকে সে নিজে বোঝাই মনে করে। বরং সকলের সঙ্গে মিশতে পারলেই যেন অনেক স্বস্তি পেত নন্দিতা। কিন্তু নন্দিতা চাইলেও যে সাধারণ মানুষ কিছুতেই তার সঙ্গে মিশতে চায় না। অন্যান্য অফিসার যাঁরা আছেন, তাদের কারোরই ফ্যামিলি এখানে থাকে না। সপ্তাহান্তে সকলেই যার যার বাড়ি চলে যায়। ফলে কিছুতেই নন্দিতার নিঃসঙ্গতা আর কাটে না।

তিয়াষ ছেলে মানুষ। বন্ধুরা কেউই এখানে নেই। কাউকে চেনেও না। তাদের

দু'টি পালক

কোয়ার্টারের মাঠে বিকেলে ছেলেরা ফুটবল খেলে। তিয়াষ খেলার সময় মাঠে গিয়ে দাঁড়ায়। তার সঙ্গেও কেউই স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে চায় না। শেষে তিয়াষ একদিন নিজেই খেলার মাঠে নেমে যায়। ফলে দু'একদিনের মধ্যেই বেশ বন্ধুও জুটে যায়। খেলাধুলায় ও কথাবার্তায় একটি ছেলেকেই তিয়াষের বেশী পছন্দ। ছেলেটি ভদ্র, বিনয়ী - এক কথায় বেশ ভালো। নাম তার আব্দুল রহিম গাজী। সে নিজে ভালো ফুটবল খেলে। সোনামুড়ায় আবার ক্রিকেটের চেয়ে ফুটবলের কদর বেশী। মুসলমান হলেও তার মাঝে কোন সঙ্কীর্ণতা বা গোঁড়ামি নেই। বাবা সোনামুড়া আদালতে ওকালতি করে। তিয়াষ পরে জেনেছে যে আব্দুলের মা আয়েষা বেগম, আসলে হিন্দু ঘরের মেয়ে। বিয়ের পূর্বে নাম ছিল অলকা বর্মণ। নাম পাল্টালেও, তার মা হিন্দু-রমণীদের মতো শাঁখা-সিঁদুর পরে। বাড়িতে শিবঠাকুরের পুজো করে। গাজী পরিবার বহুকাল আগে থেকেই সংস্কার মুক্ত। আব্দুলের ঠাকুর দাদা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেল খেটেছেন। ফলে তাদের বাড়িতে হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেনীর মানুষের অবাধ যাতায়াত। বহুদিন আগে থেকেই তাদের বাড়ির মেয়েদের পর্দানশীন করে রাখার রেওয়াজ তুলে দেওয়া হয়েছে। আব্দুলের বাবা লতিফ আহমেদ গাজী খুবই প্রগতিশীল ও উদার মনের মানুষ। তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ এবং অন্যধর্মের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। তাই সোনামুড়ার সকলের কাছেই লতিফ সাহেবের আলাদা একটা সম্মান আছে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। তিনি নীতিহীন রাজনীতির কুট-কাচালি একেবারেই পছন্দ করেন না।

নগর পঞ্চায়েত এলাকায় শহরের একপাশে লতিফ সাহেবদের সাবেকী আমলের বাড়ি। আব্দুলের মা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। সোনামুড়া শহরটি খুব বড় নয়। তুলনায় বানিজ্যিক এলাকা হিসাবে মেলাঘরের গুরুত্ব অনেক বেশী। আব্দুল একদিন তার মাকে গিয়ে তিয়াষদের সম্পর্কে বলে। আব্দুলের মা সব শুনে তিয়াষকে তাদের বাড়ি আনতে বলে। তিয়াষ যথারীতি একদিন তাদের বাড়িও যায়। আব্দুলের মা তিয়াষকে বেশ আদর যত্নও করে।

আব্দুল সোনামুড়ার এন.সি.ইনস্টিটিউশানের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। পড়াশুনোয় খুবই ভালো। ক্লাশের ফার্স্ট বয়। একদিন আব্দুল তিয়াষকে তাদের বাড়ি সম্পর্কে কনেক কথাই বলে।

— জানো তিয়াষ, আমার মা বিয়ের পর আদালতে এফিডেফিট দিয়ে নামটা পাল্টায়। আমার মামাবাড়ি মেলাঘর। মাঝে মাঝে মামা বাড়ি যাই। গেলে দিদিমা আদর যত্ন করে, খেতে দেয়। মামারাও খোঁজ-খবর করে । কিন্তু মামীরা খুব একটা ভালো চোখে

দেখে না। আমি সব বুঝতে পারি। কাউকে কিছু বলিনা।

আব্দুল আরো বলেছিল - তার মা খুব একটা বাপের বাড়ি যায় না। তবে, মা দিদিমাকে মাসে মাসে পাঁচশ টাকা করে পাঠায়। আব্দুলের দুটি মাসী আছে। দু'জনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। আব্দুলের একটি ছোট্ট বোন আছে। মেয়েটির নাম রহিমা বেগম। সে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। দেখতে খুব সুন্দর। কিন্তু বড় লাজুক।

লতিফ সাহেব একদিন তপোধীরকে সপরিবারে তাদের বাড়ি আমন্ত্রণ জানায়। তপোধীর, নন্দিতা ও তিয়াষকে নিয়ে তাদের বাড়ি যায়। তারা খুবই অতিথি বৎসল। ভালোভাবেই তাদের আদর -আপ্যায়ন করেন। লতিফ সাহেব নামজাদা উকীল। আজ লতিফ সাহেব এসেছেন তপোধীরের কোয়ার্টারে সপরিবারে।

তপোধীরের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে লতিফ সাহেব বলেছিলেন — জানেন স্যার, এই সোনামুড়া মহকুমায় আমার নীনার আব্বাজান ও তাঁদের পূর্ব পুরুষেরা প্রায় দেড়শ থেকে দুশো বছরের পুরোণ বাসিন্দা। দেশ ভাগের পর নানা প্রলোভন এসেছিল। আমার বাবা পাকিস্তান সৃষ্টি সমর্থন করতেন না। মুসলিম লীগেও কোনদিন যোগদান করেননি। জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে থেকেই আজীবন রাজনীতি করে গেছেন। সোনামুড়া ত্যাগ করাব কথা একবারও ভাবেন নি। - আমার রাজনীতি একেবারেই ভালো লাগে না। তাই দূরে থাকি।

জানেন স্যার, বর্তমান সময়ের মতো এমন অস্থির পরিস্থিতি আগে কখনো দেখিনি। একটা বিষয় আমাকে বড় ব্যথিত করে। এদেশে ধর্মীয় সংস্কারের কারণে হিন্দু-মুসলমান কোনদিন পরস্পরের বাড়িতে অন্ন গ্রহণ করতো না। এখন সেই বাধ্যবাধকতা অনেকটা কমেছে। আমার কি মনে হয় জানেন- ধর্মের নামে হিন্দু-মুসলমান আলাদা না হয়ে স্বেচ্ছায় সামাজিক বন্ধন মেনে নিলে দেশের অনেক উন্নতি হতো। উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুরা অবলীলায় এই মহতী কাজটুকু করতে পারতেন। এঁরা কেউই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভাবেননি। ভাবী সভ্যতাকেও সে ভাবে প্রত্যক্ষ করতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। যুগ যুগ ধরেই আমাদেরই খেসারৎ দিয়ে যেতে হবে। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন আমি হিন্দু বিয়ে করেছি। এজন্য আমাকে দুইদিক থেকেই অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। আমার স্ত্রীর হিন্দু নারীর মতো পোশাক পরা এবং ধর্মীয় অনুশাসন পালনে আমি কোন বাধা দিইনা বলে আমাদের মোল্লা-মৌলবীদের আমি চক্ষুশূল। তাদের কাছে আমি কাফের।

তপোধীর— লতিফ সাহেব, আপনার কথাশুনে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা

আরো কয়েকগুণ বেড়ে গেল। মানব সভ্যতা অগ্র গমনের ক্ষেত্রে শিক্ষার একটা বড় ভূমিকা ও অবদান রয়েছে। মহাত্মা পুরুষগণ জগতের মানুষকে ধর্মান্ধতা শিক্ষা দেয়নি। অথচ এক শ্রেণীর সংস্কারাচ্ছান্ন মানুষের কল্যাণেই বিশ্বজুড়ে ধর্মের নামে হানাহানি। এইসব মূঢ় ধর্মান্ধ ব্যক্তিগণই প্রতিটি মানব সমাজের পক্ষে বড় বোঝা। তারাই কিন্তু সমস্ত কু-প্রথা, কদাচার, ভ্রষ্টাচারের বাহক। লতিফ সাহেব-কাউকে না কাউকে সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব নিতেই হয়। প্রতিটি সমাজই অসূয়াই প্রকাশ করে গেছে। এরা কোনদিনই মৌমাছি হতে পারবে না, পারবে না ফুলের মধু ও সৌরভ আস্বাদন করতে। শুভ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজ অভ্যন্তরে প্রতিনিয়তই ভাঙ্গাগড়া চলছে। পরিনির্মাণ ও প্রতিনির্মাণের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে সত্যিকারের সমাজ বাস্তবতা। দেহের রোগ ব্যাধির মতো সভ্যতায়ও সংকট দেখা দেয়। লতিফ সাহেব, বিশ্বাস হারাবেন না। একদিন মানষের ক্রমমুক্তি ঘটবেই। সেদিন হয়তো প্রমিথিয়ূসরা থাকবেনা। লতিফ সাহেব-হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীর মধ্যে অবাধ-বিবাহ ব্যবস্থা, সামাজিক আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণে পারস্পরিক অংশগ্রহণ এবং দুইটি ধর্মের সম আচরণীয় বিষয়গুলোর সমন্বয় সাধনের ফলে অনেক অবাঞ্ছিত বিষয় থেকে সমাজকে রক্ষা করা সম্ভব।

তপোধীর- আমাদের দেশবাসীর মধ্যে সত্যিকারের দেশ প্রেমের বড়ো অভাব। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরও আমরা দেশ প্রেমের প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সমাজ দ্রোহী, রাজদ্রোহী, দেশ দ্রোহী, বাষ্ট্র দ্রোহী, স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি, দুবৃত্ত সম্প্রদায়ের একটা অংশ এই ভারতবর্ষ নামের মহান দেশের রাজ ক্ষমতারও অধিকারী। তাদের কাছ থেকে দেশ ও জাতি কি প্রত্যাশা করতে পারে বলুন। নীতির রাজা যে রাজনীতি তাতে আজ মরচে ধরা রঙ। কোন নীতির বালাই নেই। কিছুদিন পর পরই ধর্মগুরুরা নানা ফতোয়া জারী করছে। ধর্মীয় অনুশাসন পালনের নামে অপ্রচলিত বিধি বিধান চাপিয়ে দেশটাকে পেছনে নিয়ে যেতে চাইছে। - এই মহাবিশ্বলোকে দুর্লভ মানব জন্ম আমরা লাভ করেছি। মানুষ বিশ্ব স্রষ্টার এক অনন্ত বিষ্ময়। কারণে-অকারণে মানুষ মানুষকে খুন করছে। কী ভয়ংকর অন্যায়। দু'দিন আগে পরে তো সকলকেই কোন না কোন ভাবে ধরণীর ধূলায় মিশে যেতে হবে। সাড়ে তিন হাত জায়গার জন্য নিরন্তর আমরা লড়াই করে চলেছি । যে মানুষের অমৃতের সাধনা করা উচিৎ, তারাই যুগে যুগে নরমুন্ডের গেন্ডুয়া খেলছে। হিংসা-ঘৃণা-অসূয়া-বিদ্বেষ কি ভাবে দূর করা যায় বলুন তো। তা না হলে যে এই জগতে কোনদিনই লোকক্ষয় রোধ করা যাবে না।

লতিফ সাহেব — ঠিকই বলেছেন। মানুষ আজকাল বড়ো বেশী ক্রিটিক্যাল।

দুশটি পালক

আমি একজন ক্রিমিন্যাল লয়্যার। এইটা আমার পেশা। পয়সার জন্য আমাকে অনেক মিথ্যা মামলা লড়তে হয়। ধর্ষক-খুনী-নৈতিক অপরাধীর ভূমিকায় আমাকে অভিনয় করে বলতে হয় যে আমি নির্দোষ। কিন্তু আইনজ্ঞ হিসাবে আমি তো জানি যে সেই প্রকৃত অপরাধী। আইনের সূক্ষ্ম মার-প্যাঁচে কত অপরাধীকে যে মুক্ত করেছি, তা বলে শেষ করা যাবে না। আবার একই ভাবে বহু নিরীহ-নিরপরাধ মানুষকেও মিথ্যা মামলায় গারদে পুরতে সেই একই আইনের সাহায্য নিয়েছি। বিচারকের রায় শোনার পর ঘরে এসে বিবিকের দংশনে দগ্ধ হয়েছি। সারা রাত ছটফট করেছি। ঘুমুতে পারিনি। আল্লার কাছে শুধু দোয়া মেগেছি।

— এমন সময় ঘরের টেলিফোন বেজে ওঠে । তপোধীর উঠে গিয়ে রিসিভার তোলে - হ্যালো - গুড্ আফটারনুন স্যার - হ্যাঁ - স্যার ? কালই ? কটার সময় স্যার ? এক্ষুনি পাঠাতে হবে ? কেবিনেট মিটিং ? পাঠাচ্ছি স্যার - । ফ্যাক্স করবো না । স্পেশাল মেসেঞ্জার ? — ঠিক আছে স্যার- নমস্কার স্যার।

রিসিভার রেখে তপোধীর বলে — দেখুন অবস্থা। বন্ধের দিন, তবু রেহাই নেই। ডি. এম. সাহেবের টেলিফোন, জরুরী রিপোর্ট এক্ষুনি পাঠাতে হবে। কাল কেবিনেট মিটিং।

টেলিফোনের কথা শুনে লতিফ সাহেব নিজেই উঠে দাঁড়ান। লতিফ সাহেবকে উঠতে দেখে তপোধীর বলে - আপনারা বসুন, কথা বলুন, আমি রিপোর্টটা পাঠিয়েই চলে আসবো।

লতিফ সাহেব — না, আর বসছিনা। সারাদিন আপনারদের এখানে কাটিয়ে বেশ আনন্দই পেলাম। আর একদিন আমাদের এখানে আসুন। আজ চলি। নমস্কার।

তপোধীরও সপরিবারে কোয়ার্টারের গেইট পর্যন্ত তাঁদের এগিয়ে দিয়ে এলেন। তারপর চলে গেলেন অফিসে।

দু'টি পালক



সকলের চলে যাবার পর মা ও ছেলে বিছানায় একটু গড়িয়ে নেয়। এক সময় তন্দ্রা মতো এসে যায়। এদিকে টি.ভি চলছে। ন্যাশান্যাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল। একটি বাঘিনী লালন করে চলেছে একটি হরিণ শিশু। অতি বিরল ঘটনা। যে বাঘের খাদ্য হরিণ। সেই হরিণ শিশুকে পালন করছে বাঘিনী। তিয়াষ দেখে আর অবাক হয়।

এমন সময় আবার বেজে ওঠে টেলিফোন। তন্দ্রা জড়ানো গলায় রিসিভার তুলে নিয়ে নন্দিতা বলে — হ্যালো - কে ? মাধুরী - ? বল কবে ? জ্বর? এদ্দিন বলিস নি কেন ? - হ্যাঁ - খবর দিতে এত দেরী করলি কেন? জ্বরের মধ্যে কেবল তিয়াষদা তিয়াষদা করছে ? হ্যাঁ - ডাক্তার বাবু বলেছে - । আচ্ছা দেখি - হ্যাঁ - ওতো অফিসে চলে গেছে - ঠিক আছে - ঠিক আছে - ওর সঙ্গে কথা বলে তোদের জানাচ্ছি - চিন্তা করিস না — রাখছি - । বলেই নন্দিতা রিসিভার রেখে দেয়।

তপোধীরকে অফিসে ফোনে ধরে নন্দিতা - হ্যালো। আমি বলছি - । শুনছ ? মাধুরী এইমাত্র ফোন করেছিল। জুঁইয়ের আজ পাঁচ-ছয়দিন জ্বর চলছে। বেশ বাড়াবাড়ি রকমেরই জ্বর। জ্বরের ঘোরে কেবল তিয়াষদা, তিয়াষদা করছে । মাধুরী বলছে উদয়পুর ফিরে যেতে। কি বললে — রেডি হবো? ঠিক আছে । তুমি তাড়াতাড়ি এসো। - বলেই রিসিভার রাখে নন্দিতা।

গ্রীষ্মের ছুটিও প্রায় শেষের পথে। কথা ছিল আগামী বুধবার তারা উদয়পুর ফিরে যাবে। শুক্রবার স্কুল খুলছে। তিয়াষও সব শুনেছে। নন্দিতা তবু তিয়াষকে বলে — বাবু, রেডি হয়ে নে, আমরা আজই চলে যাব। তোর বাবা এখুনি আসছে।

তপোধীর আদ্যন্ত সৎ, নিষ্ঠাবান, মরমী, কাজপাগল মানুষ। সরকারী কোষাগারের পয়সায় এক কাপ চাও কোনদিন খায়না তপোধীর। ব্যক্তিগত কাজে কোনদিন সরকারী গাড়ির অপব্যবহার করে না। অথচ বড় বড় আমলা, মন্ত্রী-নেতা নেতৃগণ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সরকারী গাড়ির যথেচ্ছ ব্যবহার করছে। সরকারী কোষাগারের লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয় ঘটছে। ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠানো, শপিং করা; আত্মীয় বাড়ি বেড়ানো,

বিনোদন, পিকনিক ইত্যাকার বিভিন্ন কাজেই সরকারী গাড়ির বেপোরোয়া ব্যবহার করে চলেছে। কে কাকে বলবে ? সবাই যে সমান দোষী। প্রশাসনের উচ্চ বেতনধারী ছাপ মারা অমাত্য পর্যায়ের আমলা-অফিসারদের সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভালো। চাকুরীতে যোগদানের প্রথম দিন থেকেই সেই কি রিসেপসন। তারা যেন প্রত্যেকেই একজন রাজপুত্র কিংবা রাজকুমারী। বাড়ি - গাড়ি কত যে অনৈতিক সুযোগ সুবিধা তারা ভোগ করে, তার ইয়ত্তা নেই। ঘন ঘন কলকাতা-দিল্লি-মুম্বাই। যেখানে যার বাড়ি - সরকারী কাজ দেখিয়ে সরকারী পয়সার শ্রাদ্ধ করে রথ দেখা এবং কলা বেচা দুইই তারা সেরে আসে। অথচ রাজ্যের উন্নতিতে তাদের খুব একটা বড় ভূমিকা দেখা যায় না।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার এই বর্জ্য আমলাকুল চিরটাকালই নিজেদেব আখের গোছাতে খুবই দক্ষ। এঁদের মধ্যে অনেক নমস্য ও ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বও অবশ্যই আছেন। যাঁদের সততা, সৎগুণ সকলেরই অনুকরণ ও অনুসরণের যোগ্য। ময়ূরের দলে অনেক পুচ্ছধারী দাঁড়কাক ও রামশালিখও আছেন। তারা প্রায় সবই দেশজ উপাদানে তৈরী এবং বিদেশী মেসিনে রঙ করা। অধঃস্তন অফিসাবদের ধমক দিয়ে, তাদের মেধা, বুদ্ধি ও মননের ফসল কুড়িয়ে সরকারের কাছ থেকে বাহবা কুড়িয়ে নিজেদের উপরে ওঠার সিঁড়িটা ঠিক রাখাই ওদের আসল কাজ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের যারা অন্তর্ভুক্ত — তাদের আবার তেলের খনিতেও কাজ করতে হযেছে বহুদিন। ফলে তৈল মর্দনেব গুণটি প্রায় জন্মসূত্রেই এঁদের অনেকেরই আয়ত্বে। এই একই গুণে অবসরের পরেও যে তাঁদেব আর অবসর জোটেনি। আনুগত্যের কী অপার মহিমা। এঁদের অনেকেই আবার অধঃস্তন অফিসারদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে সাময়িক বরখাস্ত বা ভিজিল্যান্স কেইসে জড়িযে সরকারের বিশ্বস্ততা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। পুরস্কার মিলেছে হাতে হাতে। এঁদেব অপদার্থতায় সরকারী কোষাগার ফাঁকা হয়ে যায়, একই সঙ্গে নিজেদের দৌলত বৃদ্ধি পায়। এ এক আশ্চর্য ভানুমতীর খেল। তপোধীর কত কাহিনী যে জেনেছে, কত ঘটনা যে চাক্ষুস করেছে, কত বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা এই বয়সে সঞ্চয় করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

তপোধীর একটি ট্যাক্সী ভাড়া করে নন্দিতা ও তিয়াষকে উদয়পুর পাঠিয়ে দিল। যাবার সময় সে নন্দিতাকে বলে — জুঁইয়ের অবস্থা বেশী খারাপ হলে যেন হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। প্রয়োজন হলে আগরতলা নিয়ে যেতে বল। হিমাদ্রিকে খবব দিতে বলো। আমিও খবর নেবো। তোমরা পৌঁছেই খবর দেবে কিন্তু।

ট্যাক্সী কোয়ার্টার ছেড়ে চলে যায়। তাকিয়ে থাকে তপোধীর। তারা চলে যাবার পর তপোধীর কোয়ার্টারের সামনের গোলাকার রোয়াকে গিয়ে বসে। বেলা অবসানের

দু'টি পালক

ইশারা দিগন্তে। প্রচন্ড গরমে ঘরে বসার উপায় নেই। আবার এই অবেলায় লোডশেডিং চলছে। নিদাঘের তাপ প্রবাহে বিশ্বচরাচর অস্থির। আকাশের কোথাও মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। আবহাওয়াবিদরাও কোন আশার বাণী শোনাতে পারছেন না। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বিশ্বের বিজ্ঞানীকূল সবিশেষ চিন্তান্বিত। বিশ্বে জন বিস্ফোরণ, বসতির জন্য নির্বিচারে সবুজ ধ্বংস, বৃক্ষ নিধন, অতিমাত্রায় গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন - প্রভৃতি কারণে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, ভূ-মন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। লোভ লালসা, ভোগ্য উপকরণের উত্তরোত্তর চাহিদা, কালনেমির লঙ্কাভাগের মতো বিশ্বের অমিত শক্তিধর রাষ্ট্র সমূহ সমগ্র পৃথিবীকে আপন স্বার্থে ভাগ - বাঁটোয়ারা করে চলেছে। ফলস্বরূপ মানব সভ্যতা আজ প্রকৃতই ধ্বংসের মুখোমুখি।

তপোধীর মাঝে মাঝে বড়ো বেশী নস্টালজিক হয়ে পড়ে। স্মৃতির সরণি বেয়ে টাইম মেশিনে চেপে তপোধীর আজকের এই নিভৃত মুহূর্তে পৌঁছে যায় সুদূর অতীতের ধূসর শৈশবে। যে শৈশব জুড়ে খেলা করে রামধনু রঙ দিয়ে আঁকা বহু বিচিত্র সব ছবি। কোনটি বিবর্ণ ধূসর। কোনটি অম্লান, স্পষ্ট। তপোধীর তখন তিয়াষের মতোই সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। বয়স বোধ হয় ক্লাশের তুলনায় বছর খানেক বেশী হবে। গ্রামের স্কুলেই পড়াশুনো করে। ব্রজেন্দ্র নগর স্কুল। তার স্কুলের সহ-পাঠীদের মধ্যে অনুপ এবং অলকেশ ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেই তার চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড়। তাদের ক্লাশে দুটি মেয়ে পড়ত। বেলা আর খেলা। দুই যমজ বোন। তিয়াষের থেকে অনেক বড়। ওই বছরই তাদের দুই বোনের বিয়ে হয়ে যায়। মাধব নগর। তাও তারাও দুই যমজ ভাই। বিয়ের পর তাদের সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হয়নি। তপোধীর কিন্তু সেই বয়সেই নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিষয়ে সবকিছুই বুঝতে পারত। তপোধীর দেখেছে সেই সময়কার গ্রামের ছেলে-মেয়েরা অনেক বেশী বয়সে স্কুলে ভর্তি হতো। তাদের মধ্যে যৌন সচেতনতাও ছিল অনেক বেশী। ফলে তপোধীর অন্যদের তুলনায় ছোট হলেও - নারী পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা শুনে শুনে সেই বয়সেই বেশ পাকা হয়ে উঠেছিল। কুয়াশার আবরণে মোড়া সেই আবছা ধারণা একদিন তপোধীরের জীবনে সেই বয়সে একটা চরম বাস্তব রূপে প্রকটিত হয়েছিল।

আজ এই মুহূর্তে তাই মল্লিকার কথাই তপোধীরের বেশী করে মনে পড়ে। মল্লিকার সংস্পর্শেই তপোধীর নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিষয়ে একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। মল্লিকা তপোধীরেরই বয়েসী। সে তাকে খুব ভালোবাসত। তারা দু'জন সকাল বেলা প্রায়ই ফুল তুলতে যেত। মাঝে মাঝে অন্যেরাও তাদের সাথী হতো। একদিন মল্লিকা শিউলি গাছ তলায় বসে বসে বিনি সুতোয় একটা শিউলির মালা গেঁথে টুপ করে তপোধীরের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিল — তপু। আজ আমি তোর গলায় মালা পরিয়ে দিলাম। বড় হলে

তুই আমায় বিয়ে করিস। তপোধীর বলেছিল — এই মল্লি, তুই এটা কি করলি? আমি যদি তোকে কোনদিন বিয়ে করতে না পারি, তবে ?

মল্লিকা — সে আমার ভাগ্যের দোষ বুঝবো। তোকে তার জন্য দোষ দেব না রে। তোর সঙ্গে বিয়ে না হলে আমি এ জীবনে আর কাউকে বিয়েই করবো না। বাবা-মা জোর করে বিয়ে দিতে চাইলে গলায় দড়ি বা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবো।

মল্লিকাদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো ছিলনা। তবু মল্লিকা বড় হয়ে উঠছে দেখে ভিন্ গাঁয়ের একটা ছেলের সাঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। মল্লিকা কোনদিন তপোধীরের ভালোবাসার কথা কাউকে বলতে পারেনি। তার বাব-মা কিম্বা কাকা - কাকীদেরও সে কথা বলেনি। ক্লাশ ফাইভ পাশ করার পর তার বাবা-মা আর তাকে স্কুলে পাঠায় নি। মল্লিকা পড়াশুনোয় খুবই ভালোছিল। তপোধীরের এক ক্লাশ নীচেই সে পড়তো। বেশ বুদ্ধিমতী এবং বেশ সপ্রতিভ। দেখতে খুবই সুন্দরী। টানা টানা কালো চোখ। টিকলো নাক। কুন্দফুলের মত শুভ্র দন্ত পংক্তি। গোল মুখ। মাথায় কোমর পর্যন্ত ঝোলানো কালো চুল। ফরসা গায়ের রঙ। তাকে দেখতে অনেকটা মা দুর্গার মতো দেখতে। তপোধীর তখন কলেজে পড়ছে। পড়ার চাপে বেশ ক'মাস বাড়ি আসেনি। পুজোর ছুটিতে বাড়ি গিয়ে তপোধীর জানতে পারে মল্লিকা রথের দিন দুপুরবেলা তাদের ঘরের পেছনের বাগানের বাতাবী লেবুর গাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু তার কারণ কেউ জানে না।

মল্লিকার মৃত্যুর খবর শুনে তপোধীর পুরো নির্বাক হয়ে যায়। মল্লিকার জন্য তপোধীর সারারাত কেঁদেছে। মেয়েটি সত্যিই ভালো ছিল। ফুলের মতো মন ছিল তার। লুকিয়ে লুকিয়ে কত কিছু যে খাওয়াতো মল্লিকা। সে সব বড়লোক বাড়ির শৌখীন খাবার ছিল না। কুল, কামরাঙা, পেয়ারা, আতা এ সবই ছিল লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার ফল। গরমের দিনে কাঁচা আমের চাটনি করতো সে। পাতলা কাঁচা আমের কুচি, আখের গুড়, নুন, দুধ মিশিয়ে মিষ্টি চাটনি। কখনো কাঁচা লংকা দিয়ে টক-ঝাল-মিষ্টি চাটনি। মল্লিকার হাতে জাদু ছিল, খেতে ভালো লাগত। কাঁঠালের মুচির ভর্তা। অদ্ভুত লাগতো খেতে। কাঁঠালের মুচি, আধ্পাকা কুল, কাঁচা লঙ্কা, নুন, একটু তেঁতুল। তপোধীর ভাবে — এখনকার ছেলে মেয়েরা ম্যাগী, চিপস, কুরকুরে খায়। কিন্তু প্রকৃতির সেই অপরিমেয় দান - সে তারা কোথায় পাবে। মল্লিকার মতো মেয়েরা সংসার থেকে হারিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অভাবী গ্রাম বাংলার অন্দর মহলেও ঢুকে পড়ছে বিধ্বংসী মানবসভ্যতার নানা খাদ্যাখাদ্য।

জ্যৈষ্ঠ মাসে জাম পাকতো। তাদের বাড়িতে দুটি বড় জামের গাছ ছিল। প্রচুর জাম ধরতো। তপোধীরই গাছে উঠে জাম পেড়ে দিত। মল্লিকা জামের ঝাঁকানি করতো।

দু'টি পালক

একটি মগের মধ্যে পাকাজাম, লংকা পোড়া, সঙ্গে আবার লংকা গুড়ো, নুন, কখনো কখনো একটু চিনি — সব মিশিয়ে ঢাকা দিয়ে ঝাঁকাতো আর মুখে সুর করে ছড়া বলতো। ছড়াটা তিয়াষের এখনো মনে পড়ে — ।

আম পাকে, জাম পাকে , পাকে রে ধুতুরা

বুড়া কালে সাধ হইলে যাইতরে মথুরা। —

ঝাঁকির চোটে পাকা জাম ফেঁসে যেত, বীজ থেকে আলাদা হয়ে জামের শাঁস আরও হয়ে যেতো বেশ নরম তুলতুলে। — তার ছড়াটার মানে যেন বোঝা যেত জামের ঝাঁকনি খাবার সময়। সব ঋতুর ফল খেতে হয়। সেই ফল খাওয়ারও যে কত আয়োজন, তা বলে শেষ করা যায় না। মল্লিকার হাতের জামের ঝাঁকনি সবাই খেতো। তপোধীরের বাবারও খুব প্রিয় ছিল জামের ঝাঁকানি। বাবা বলতো — জাম খাবি, জাম খেলে বহুমূত্র রোগ হয় না। মানুষ এখন ডায়াবেটিস রোগে কী ভয়ংকর ভাবে ভুগছে। ছয় ঋতুর ফল তো এখন মানুষ খায় না, জানেওনা। এখন ফল মানে দামী দামী আপেল, আঙ্গুব, বেদানা, আনার এ সব। আমাদের দেশজ ফল এবং বুনো ফল যে সবই প্রায় অবলুপ্তির পথে। মানুষ এখন ভিটামিন খোঁজে, মিনারেল খোঁজে। সে সময়েব মানুষ এসব না জেনেই যে অনেক ভালো ছিল।

তাদেব বাড়িতে একটা লুকলুকি ফলের গাছ ছিল। মল্লিকা ভত্তা বানিয়ে নিয়ে আসত। টক তবু খেতে ভালোই লাগত তপোধীবের।

মল্লিকাকে তপোধীরের মনে হতো অরণ্য দুহিতা। তাদেব চার পাঁচটা দুধের গরু ছিল। দুধ বিক্রিই ছিল তাদের আয়ের উৎস। দুই আনা সের দুধ। তাই বেচে সংসার চালানো। বড়োই কষ্টের। মল্লিকাই সব গরুগুলির পরিচর্যা করতো। ঘাস খাওয়াতে পাড়ার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বনে গরু চরাতে নিয়ে যেত মল্লিকা। সে তার গরুগুলির নাম ধরে ডাকলে তারা ছুটে চলে আসত। তার গরুগুলির নামও ছিল বেশ সুন্দর। কালী, ধলী, রঙ্গী, চুমকি — তপোধীরের আজও সব মনে পড়ে। গরুগুলি কাছে এলে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিত, গলা জড়িয়ে ধরে আদর করত। পশু হলেও গরু বড্ড আদব বোঝে। গরুগুলিকে পুকুর থেকে জলে এনে স্নান করাতো। এঁটুলি ধরলে আঙ্গুল দিয়ে টেনে তুলে এনে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের নীচে ফেলে পিষে মারতো। বড় বড় এঁটুলি মারার সময় ফটাস ফটাস টিকটিকির ডিম ফাটার মতো শব্দ হতো। চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন "ফুল বিহূ" উৎসব পালন হতো। ওইদিন নদীতে নিয়ে গরু স্নান করানো হতো। মল্লিকার বাবা ও ভাই গরু স্নান করিয়ে আনত। মল্লিকা গরুগুলিকে গোয়ালে নিয়ে প্রত্যেকটির গলায় ফুলের মালা

পরিয়ে দিত। গোয়ালে ধূপ-ধুনো দিত। কুর্চি ফুল, কাটগোলাপ, আকন্দ, গুঞ্জা ফুলের মালা গেঁথে গরুর গলায় পরাত। হোলির দিনে গরুর গায়ে আবীর দিত।

মল্লিকা বলতো — জানিস তপু, মানুষের থেকে গরুগুলি অনেক ভালো। ওরা কথা শোনে, আদর বোঝে। খাওয়ালে খুশী হয়। এদের ভালোবাসলে কেমন ভালো লাগে জানিস।

গরু চরাতে গিয়ে মল্লিকা বনের নানা ফল শাড়ীর আঁচলের কোঁচা ভরে কুড়িয়ে আনত। পাকা মিষ্টি ডুমুর, লতা-আম, কুল, বনতাল, কাউ, বনকাঁঠালের বিচি, এলনা, অবৈইন - এখন সে সব বুনো ফলের যে খোঁজও পাওয়া যায়না। তপোধীর সবই খেয়েছে। খেতে ভালোও লাগত। — আজ সে সবই যে পলি পড়া স্মৃতি, তার উপর স্তরে স্তরে জমেছে সময়ের পলেস্তারা।

মল্লিকা নেই। কথাটা ভাবতেই চোখে জল এসে যায় তপোধীরের। পাত্র পক্ষের কন্যা দেখে বড়োই পছন্দ। লক্ষীমন্ত ঘরোয়া সংসারী গৃহকর্মে নিপুণা মেয়ে। সে সময় পাত্র পক্ষকে উল্টো কন্যাপণ দিতে হতো। পাত্রপক্ষ কন্যাপণ হিসাবে মল্লিকার বাবাকে ছয়কুড়ি টাকা দেবে। অগ্রায়ণে বিয়ে। আশীর্বাদের দিনও পাকা। এরই মধ্যে একদিন তারই প্রিয় চুমকির গলার দড়ি খুলে নিয়ে মল্লিকা নিজের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে গভীর অভিমানে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। কিছু না বলেও তপোধীরকেই চিরদিনের জন্য অভিযুক্ত করে গেল। ভাবতে ভাবতে রবিঠাকুরের সেই বিখ্যাত গান মনে পড়ে যায় —

'জীবনে যত পূজা হল না সারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা,
যে ফুল না ফুটিতে সে ঝরিল ধরনীতে।"

মল্লিকাতো ফুলেরই নাম। মল্লিকা কুঁড়ির মালাই সুন্দর। তাই কি মল্লিকার জীবনে আর ফোটাই হল না। কুঁড়ি হয়েই ঝরে গেল? হবে হয়তো।

তপোধীরই একমাত্র মল্লিকার মৃত্যুর আসল কারণ জানে। কিন্তু সে কথা আজো কাউকে বলতে পারেনি। মল্লিকার কথা তাই কাউকে বলে না তপোধীর। এই প্রেম-ভালোবাসাময় পৃথিবী থেকে একটু ভালোবাসা যদি মল্লিকার জন্য থেকেই যায়, ভালোবাসার অনন্ত ঐশ্বর্যময় ভান্ডারে টান পড়বে বলে মনে হয় না।

আজ বার বারই মল্লিকার স্মৃতি বড়ো বেশী করে মনে পড়ছে তপোধীরের। তাদের নিজেদের একটা বড় পুকুর আছে। ছুটির দিনে সকলের স্নান হয়ে গেলে তপোধীর স্নান করতে যেতো। আর মল্লিকাও সেই অপেক্ষাতেই থাকত। তপোধীর পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসতে বসতেই কাঁখে কলস আর পিঠে ছোট্ট একটা গামছা জড়িয়ে স্নান করতে

আসত মল্লিকা। তারপর দু'জনই এক সাথে জলে ডুব দিয়ে ভুটভুটি তুলত। মাঝ পুকুরে ডুব দিয়ে মাটি তুলে আনত। মল্লিকাও সাঁতারে বেশ পটু ছিল। পুকুরে গিয়েই সাঁতরে এপার ওপার করতো। সেই পুকুরের উত্তর পশ্চিম কোণে একটা আম গাছ ঝড়ে পুকুরের মধ্যে কাত হয়ে পড়ে। সেই গাছের কয়েকটি শাখা জলের মধ্যেও পড়েছিল। আমের পাতার ঝোপ ভেতরে ঘরের মতো আড়াল তৈরী করেছিল। মল্লিকা একদিন সাঁতার কেটে আমগাছের ডালে বসে পা ডুবিয়ে বসেছিল। তপোধীর ডুব সাঁতার কেটে একেবারে মল্লিকার পায়ের কাছে গিয়ে পা দুটো টেনে জলের মধ্যে নিয়ে আসে। সেখানে জল কম ছিল। তারপর হঠাৎই তপোধীর মল্লিকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। মল্লিকাও জড়িয়ে ধরে তপোধীরকে। জলের মধ্যে দাঁড়িয়েও দু'জন দু'জনের বুকের উষ্ণতা অনুভব করতে থাকে। তারপর দু'জনের কেউই কাউকে কিছু না বলে স্নান সেরে চুপ চাপ বাড়ি চলে যায়। স্নানের ছুতোয় এরপর তারা প্রায়ই পুকুরের আমের শাখায় বসে পরস্পরের কোলে মাথা রেখে জলে পা ডুবিয়ে ভিজা শরীরে শুয়ে থাকত। একদিন পারুলদি তাদের ওই অবস্থায় দেখে ফেলে। এরপরই তারা দু'জন ডুব দিয়ে ঘাটের দুই দিকে উঠে স্নান সেরে বাড়ি চলে যায়। পারুলদিদের বাড়ি ছিল তাদেব পুকুরের পূর্ব পারের টিলার উপর। পারুলদিরা বৈষ্ণব। পারুলদি জন্মাবধি বৈষ্ণবদের গেরুয়া শাড়ী পরতো। এই বয়সেই কপালে রসকলি আঁকতো। বেশ ফরসা ছিল বলে — খুব ভাল লাগত পারুলদিকে। পারুলদি এমনিতে খুবই ভাল ছিল। একথা পারুলদি কোনদিন কাউকে বলেনি। সেদিনের পর তপোধীর আর একসঙ্গে মল্লিকার সঙ্গে স্নান করতে যেত না। অবিশ্যি সেই বছরই বাবা আম গাছটি কেটেও ফেলে।

তপোধীরদের বাড়ির প্রশস্ত উঠোনের পাশেই একটি বড় বাতাবী লেবু গাছ ছিল। বাতাবী লেবুর ডাল খুবই শক্ত হয়। সেই গাছের ডালে দড়ি দিয়ে একটা দোলনা বানিয়েছিল তপোধীর। সেই দোলনায় তপোধীর ঝুলত। সে তার ছোট ভাই-বোনদের দোলনা ঠ্যালা দিতে বলত। বিনিময়ে তারাও দোলনায় দোলার সুযোগ পেত।

মা একবার কয়েকদিনের জন্য মামাবাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল সঙ্গে তার ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তপোধীর জানি কি কারণে যায়নি। বাড়িতেই ছিল। বাবাও সেদিন বাড়ি ছিলনা। সেই সুযোগে তপোধীর ও মল্লিকা রাধা-কৃষ্ণ সেজে নিজেরাই দোলনায় দুলে দুলে ঝুলন ঝুলন খেলছিল। সেদিনের সেই কথাটি বড় মনে পড়ে তপোধীরের।

মা মল্লিকাকে খুবই স্নেহ করতেন। তাদের বাড়ীতে অভাবটা একটু বেশী ছিল বলে, কখনো কখনো তাঁদের রাঁধতে হয়তো দেরী হতো। মা মাঝে মাঝে চুপি চুপি মল্লিকাকে ডেকে চাল দিয়ে দিতেন। আবার কখনো কখনো ঘরে ডেকে এনে ভাত খাইয়ে দিতেন।

দুপটি পালক

তপোধীর ততদিনে স্কুলের গন্ডী পেরিয়ে কলেজ জীবনে প্রবেশ করেছে। এম.বি.বি. কলেজে পড়ার সুযোগে অন্য এক অনাস্বাদিত জগতের ছোঁয়ায় তপোধীরের মন আবিষ্ট হয়ে ওঠে। নব জীবনের পুলক স্পর্শে তার মধ্যেও এক বিরাট ভাবান্তর ঘটে। মল্লিকা বেশ ছোট বয়স থেকেই ফ্রক ছেড়ে শাড়ী পরতো। শাড়ী পরা মল্লিকাকে তপোধীরের বালিকা বধূ, বালিকা বধূ মনে হতো।

কলেজে ভর্তি হবার পর বাড়ি এলে মা আর মল্লিকাকে তপোধীরের কাছে বেশী ঘেঁষতে দিতেন না। তপোধীরের ঘরে গেলে এবং মা টের পেলেই মল্লিকাকে রান্না ঘর থেকে ডাকতে থাকত — মল্লি, শোন না মা, তপু মোচার শাক ভালোবাসে। এইটা তাড়াতাড়ি একটু কেটে দে না। বেলা হয়ে গেছে। ছেলেটার ক্ষুধা লেগেছে। - এমনি এটা-ওটা কেটে দেওয়া, অযথা অন্য কাজে ডেকে নিয়ে যেত। মুখে কোন কথা বলত না, মল্লিকা যে বুঝত না, তাই নয়। বুঝত, কিন্তু তারও যে কিছু করার কোন উপায় নেই। জেঠিমাকে কোন কথা বলার সাহসই ছিল না মল্লিকার। তপোধীরও বুঝত। কলেজে ভর্তি হবার পর মল্লিকার সঙ্গে তপোধীরের দূরত্বটা ক্রমেই বেড়ে যায়। সময় ও জীবনের নিয়মে প্রত্যেকেরই জীবনে এমনি অনেক ঘটনা ঘটে থাকে, আর এমনিভাবেই তার পরিনতিও ঘটে। জগৎ-সংসারের যে তাতে কিছুই যায় আসে না। যুগে যুগে সব দেশেই এমন অনেক তপোধীর-মল্লিকা জন্মায়। এমনটাই হয় তাদের পরিণতি। যে সকল বিরহকাহিনী সবাই জানে, তাদের নিয়েই কবিরা গান লিখে, কবিতা লিখে। ব্রজের গোপ বালক বংশীধর কানাইয়া লালের জন্য রাধারানীর বিলাপ যে আজও শেষ হয়নি। যমুনা পুলিনে, কালিন্দীর জল কল্লোলে আজো সেই বিরহের সুর শোনা যায়।

তপোধীরদের বাড়ির পেছনে একটা বড়ো বেতের ঝোপ ছিল। সেই ঝোপে বেশ লম্বা লম্বা বেত হয়েছিল। সেই বেত গাছে ফল হতো। বেতের ফল। সেখানকার লোক বলত - বেতোইন্। বেতের ফল খেতে খুব স্বাদ । একটু টক লাগলেও ভালোই লাগত খেতে। তপোধীর বাড়ি গেলে মা মল্লিকাকে বলতো তপুর জন্য বেতফলের ভত্তা করিস তো। ওর খুবই পছন্দ। মল্লিকা অতি সাবধানে বাঁশের আগায় উল্টো কাঠি বেঁধে বেত ফল পাড়তো। যাতে হাতে বেতের কাঁটা না ফোটে। তপোধীরের জন্য বেত ফলের ভত্তা করে চুপচাপ জেঠিমাকে দিয়ে আসত। মল্লিকা শেষের দিকে কেমন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। খুব একটা কারো সঙ্গে কথা বলতো না। লজ্জা লজ্জা ভাবটাও কেমন বেড়ে গিয়েছিল। ছুটিতে তপোধীর বাড়িতে এলে কখনো কখনো মল্লিকার সঙ্গে দেখা হলে জিগ্যেস করতো— মল্লি, কেমন আছিস রে ?

মল্লিকা উত্তর দিত — ভালো। তুই কেমন আছিস ? ক'দিন থাকবি? তোর পরীক্ষা কবে শেষ হবে ?

তপোধীর উত্তর দিয়েই চলে যেত। বাকী সময় দু'একবার দেখা হতো। তপোধীর স্নান করতে গেলে মল্লিকাও কলস নিয়ে জল ভরতে যেতো। কোনদিকে না তাকিয়ে জল ভরে চলে আসত। তপোধীর মল্লিকার দিকে চেয়ে থাকত। কিন্তু অতীত সম্পর্ক জাগিয়ে তুলতে চাইতো না।

কখনো কখনো তপোধীর তাদের বাড়িতে যেত। মল্লিকা তপোধীরের সামনে আসতে লজ্জা পেত। সেই লজ্জার অন্য কারণও থাকত। অভাবের সংসার বলে মল্লিকার বাবা মল্লিকাকে সহজে শাড়ী কিনে দিতে পারত না। শাড়ী ছিঁড়ে গেলে সূঁচ দিয়ে সেলাই করে পরতো। মাও কখনো তাঁর আধা-পুরানো শাড়ী, ব্লাউজ, সায়া মল্লিকাকে দিয়ে দিত। অনেক সময় পরনে ময়লা শাড়ী থাকত। তাই ছেঁড়া বা ময়লা শাড়ী পরে মল্লিকা তপোধীরের সামনে আসতে সংকোচ বোধ করতো। কখনো ঘর থেকে মুখটা বাড়িয়ে তপোধীরকে দেখত। হাসি হাসি মুখের আড়ালে বিষণ্ণতা জেগে থাকত। অভাবের মলিনতাও সারা দেহে ছিল ছড়ানো। কত আশাছিল মল্লিকার। মল্লিকা বেঁচে থাকলেও তপোধীর কখনো মল্লিকাকে বিয়ে করতে পারত না। সামাজিক বাধ্য বাধকতা এড়িয়ে চলা সম্ভব হতো না। মল্লিকারা এই বিশ্ব জগৎ থেকে নিজেকে এই ভাবে অপসৃত করে সারাজীবনের মতো ভীরু কাপুরুষ তপোধীরদের বাঁচিয়ে দিয়ে যায়, বাঁচিয়ে দিয়ে যায় গড্ডালিকা প্রবাহে চলা সমাজ জীবনকে। মল্লিকার মতো মেয়েদের সাধ পূর্ণ হয় না। কার তাতে কি আসে যায় ? ঋতুচক্র বন্ধ হয় না। সূর্য ওঠা, ফুল ফোটা, পাখি ডাকা কিছুই বন্ধ হয় না। মল্লিকারা না জন্মালে যে জগৎ কোনদিন বিরহের বেদনা বুঝত না। তপোধীরের মনের আকাশে মল্লিকা চিরকালের মতো এক জ্বলজ্বলে তারার মতো জেগে রয়েছে। নারীরা যে তারার মতো। আকাশ যেমন বুকে অনেক তারা ধরে থাকে, হৃদয়ের আকাশে তেমনি অনুরাধার পাশে শুকতারা ও জেগে থাকে। স্মৃতি মানুষকে বড়ো করে, বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখায়। বিস্মৃত স্মৃতির মানুষ কখনো স্বপ্ন দেখে না। স্মৃতিই যে মানুষকে স্বপ্ন দেখায়। স্মৃতি দুখের হলেও তার মাঝে জড়িয়ে থাকে মধুর পরশ, যা জীবনকে মাধুর্যে ভরিয়ে তোলে।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলো ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীতেই অধরা মাধুরী বিলিয়ে দিচ্ছে। রাস্তায় বাড়িতে বিদ্যুতের আলো জ্বলে উঠেছে। তপোধীরের মনটা জুড়ে একটা বিষণ্ণতা ছড়িয়ে বিদ্যুতের আলো জ্বলে উঠেছে। বিষণ্ণতার কি কোন রঙ হয়? নীল-কালো রঙটা কি বিষণ্ণতার প্রতীক ? আজ বহুবছর পর মল্লিকার স্মৃতিটি তপোধীরের

মনকে অতর্কিত বিধ্বংসী ঝড়ের মতো যেন তছনছ করে দিয়ে যায়। নিঃসঙ্গ তপোধীর স্মৃতির সৈকত বেলায় যেন কোন ত্রাণ শিবিরের আশ্রয়প্রার্থী।

এমন সময় অমল আসে। অমল তার কোয়াটারেই থাকে। ফাই-ফরমাশ খাটে। বেশ্ব বিশ্বস্ত। -- অমল বলে - স্যার আলোটা জ্বেলে দেব ?

তপোধীর বলে — দে, আর দ্যাখ, কাজের মাসী এসেছে কিনা। এলে বল - আমাকে এক কাপ চা করে দিতে।



তিয়াষ আর জুঁইয়ের মধ্যে কৈশোর প্রেমের একটা টানা-পোড়েন চলছেই। তপোধীর তার নিজের জীবন দিয়ে সে কথা পুরোপরি উপলব্দি কবতে পাবে। তপোধীব আপাততঃ তাদের নিয়ে বেশী ভাবতে চাইছে না। ভবিতব্যতা তো কিছু বলা যায না। তপোধীর তাদের উভয়ের মেলা-মেশায় কোন রকম বাধা দিতে চায় না। শিশুবা যতবেশী স্বাভাবিক ভাবে মেলা-মেশার সুযোগ পায়, ততই তাদের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাধা দিলেই কৌতূহল, মনে নানা রকর্ম জটিলতা সৃষ্টি হয়। বারণ কবলে বাবণ না মানাব ইচ্ছে, বাধা দিলে বাধা টপকানোর দুর্দমনীয় ইচ্ছার সৃষ্টি হয়। এতে হিতে বিপবীত হতে পারে। শৈশব, কৈশোরেব কৌতূহল মেশানো ভালোবাসা যৌবনের অস্থিরতা কাটিযে সফল পরিনতির দিকে এগিয়ে যায়। সে জন্য সকল পক্ষকেই ধৈর্য্য ধারণ কবতে হয়। মাধুবী এবং হিমাদ্রিও সব জেনে-বুঝেও কিছুই বুঝতে দেয়না। নন্দিতা ও তপোধীবও যে তেমনই। কৈশোর প্রেমে আবেগ বেশী, এই বয়সটা যে নিরাবলম্ব। অপবিণত বয়সের প্রেম-প্রণয়েব প্রতি সময়ের কোন সমর্থন থাকে না বলে পরিণতি প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই ট্রাজেডির রূপ নেয়। কৈশোরের উদ্ভিদরূপী প্রেমবিরহের তাপে দগ্ধ হয়ে যৌবনের জলধারায় সিক্ত হয়ে এক সময়ে সত্যিকারের পরিপূর্ণতা লাভ করে। তপোধীর চায় জুঁই-তিয়াষেব ভালোবাসা বিরহ মিলন, মান-অভিমান, ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে শরতের পরিপক্ক সোনালি ফসলের মতো সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠুক। কাবো জন্য কাউকে যেন সারা জীবন অনুতাপ কবতে

না হয়।

নন্দিতা, তিয়াষ সহ সোজা ধনী সাগরের পারে তাদের ছেড়ে আসা কোয়ার্টারের সামনে গিয়েই ট্যাক্সী থেকে নেমে পড়ে। জুঁইয়ের জ্বর আগের চেয়ে একটু কম। অ্যান্টি বায়োটিক চলছে। জ্বর বাড়লে প্যারাসিটেমল দিতে বলা হয়েছে। ম্যালেরিয়া ধরা পড়েনি। ডাক্তার বলেছে - ভাইরাল ফিভার। লোকে বলে — ওষুধ খেলে সাতদিন, আর না খেলে এক হপ্তায় সেরে যায়। কিন্তু রোগ হলে যে ডাক্তারের পরামর্শ নিতেই হয়।

গত দুই রাত মেয়েটা বড় কষ্ট পেয়েছে। মাধুরী ও হিমাদ্রিও গত দুই রাত চোখের পাতা এক করতে পারেনি। দু'দিনেই মেয়েটি কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে। কিছুই খেতে চায় না। সোনামুড়া থেকে রওয়ানা দেবার আধঘন্টা পরই সূর্য অস্ত যায়। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। অন্ধকার তেমন গাঢ় নয়। আকাশে চাঁদের বন্যা। বৈশাখের দগ্ধ দিনের ভ্যাপসা গরম। আবহাওয়ার পূর্বাভাষ বলছে — রাজ্যে মৌসুমী বায়ু আসতে আরো সপ্তাহ খানেক লাগবে। তুলনামূলক ভাবে উদয়পুর গরম কিছুটা কম। এই মনোরম সুন্দর ছোট্ট শহরটার চারদিকেই বেশ কয়েকটি বড় বড় সরকারী দীঘি। এই রাজ্যের রাজা-মহারাজাদের আমলে খনন করা। তবে বায়ু দুষণ থেকে এই শহরটাও রক্ষা পায়নি। নব্য শহর প্রেমীদের দৌরাত্ম্যে শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিব জন্য পুকুর ভরাট করে পার্ক, দলীয় অফিস এসব গড়ে উঠেছে। এতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বেশ কিছুটা হলেও নষ্ট হচ্ছে।

নন্দিতা ও তিয়াষ সোজাসুজি ঘরে ঢুকে যায়। কম ওয়াটের একটা আলো জ্বলছে ঘরে। জুঁই মাঝের ঘরের খাটে শুয়ে আছে। একটু আগে লেবুর সরবৎ খেয়েছে। ক্লান্তিতে দু'চোখে ঘুম নেমে এসেছে। মাথার উপর পাখা ঘুরছে। গরমের দিনে জ্বর। তাতে যদি আবার লোডশেডিং শুরু হয় তবে বিপত্তির শেষ নেই।

মাধুরী ঘরেই ছিল। ক'দিন পর হিমাদ্রি আজ একটু আগে বেরিয়েছে। নন্দিতা জুঁইয়ের কপালে হাত দিয়ে দ্যাখে জ্বর তেমন নেই। মেয়েকে আদর করে দিয়ে নন্দিতা ও মাধুরী বাইরে গিয়ে বসে।

তিয়াষ এতক্ষণ জুঁইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। জুঁই সত্যিই ফুলের মতো দেখতে। আজ মনে হচ্ছে বাসিফুলের মতো কেমন ম্রিয়মান। মা ও মাসী ঘর থেকে চলে যাবার পর তিয়াষ জুঁইয়ের পাশে বসে। আলতো ভাবে জুঁইয়ের কপালে হাত রাখে। তিয়াষের হাতের স্পর্শে জুঁইয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেলেও জুঁই ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে। তারপর উল্টোদিকে পাশ ফিরে শুয়ে তিয়াষের হাতটা নিজের দুই হাত দিয়ে টেনে বুকের মধ্যে চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। তিয়াষ জুঁইয়ের কান্নায় হঠাৎ অভিভূত ও

কিমকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। - ডাকে - মা, মা - তাড়াতাড়ি এসো - মাসী - তাড়াতাড়ি এসো - দ্যাখো জুঁই কাঁদছে। তিয়াষের অতর্কিত চীৎকারে তারা ভয় পেয়ে যায়। দৌড়ে ঘরে আসে। মাধুরী ও নন্দিতা হাঁফাতে থাকে। বলে — কি হয়েছে ? তিয়াষ — দ্যাখো না, জুঁই কাঁদছে। তিয়াষের চোখেও জল এসে যায়। মাধুরী ও নন্দিতা দু'জনেই বুঝতে পারে যে অভিমানে জুঁই কাঁদছে।

নন্দিতা জুঁইয়ের কাছে যায়। কপালে হাতে রেখে বলে — কি হয়েছে মা, কাঁদছিস্ কেন ?

জুঁই তবু কাঁদে — কিছু বলে না। নন্দিতা জুঁইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। শান্ত হয় জুঁই। তারপর বলে — তোমরা নিষ্ঠুরের মত আমাকে ফেলে চলে গেছ। এখন আবার বলছ - কি হয়েছে মা ? যাও, তোমরা সোনামুড়া চলে যাও। আমাদের এখানে থাকতে হবে না। আমি তোমাদের তো কেউ নই। আমার জন্য তোমরা এখানে কেন থাকবে? — ক্লান্ত স্বরে কথাগুলো বলে নীরব হয়। শরীরে জোর নেই। আর কিছু বলতে পারে না। আবার নেতিয়ে পড়ে।

নন্দিতা ইশারায় তিয়াষকে জুঁইয়ের কাছে বসতে বলে। মাধুরীও মেয়েকে বোঝায় — তোর মিষ্টি মাসী আর সোনামুড়া যাবে না। তুই আর কাঁদিস না। তিয়াষ ও তোর মিষ্টি মাসী আজ আমাদের বাসাতেই থাকবে।

নন্দিতা জুঁইকে আদর করে দিয়ে উঠে যায়। মাধুরী সহ তারা পাশের ঘরে চলে যায়। তিয়াষ অসুস্থ জুঁইয়ের পাশে বসে থাকে। কিন্তু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, তার এখন কি করা উচিৎ।

তিয়াষ আস্তে আস্তে জুঁইয়ের কপালে হাত বাখে। এলোমেলো চুলে বিনুনি কাটে। জুঁই তিয়াষের দিকে পাশ ফিরে শোয়। তিয়াষ আলতো ভাবে জুঁইয়ের মুখের ওপর মাথা রাখে। জুঁই দুই হাতে তিয়াষের গলা জড়িয়ে ধরে আবার কেঁদে ওঠে। নিজে নিজেই শান্ত হয়। তারপর আস্তে আস্তে বলে - তিয়াষদা তুমি আমায় ফেলে চলে গেলে কেন ? তোমাকে ছাড়া যে আমি থাকতে পারি না। তুমি যে আমার জীবনের সব। আমার দেহ মন সবই তো তোমার। আমি বড়ো হয়েছি। ভালো মন্দ বুঝতে পারি। ভালোবাসতে জানি। আমি যে তোমায় ভালোবাসি তিয়াষ দা।

তিয়াষ বলে — তুই কাঁদছিস কেন ? কাঁদবিনা, কাঁদতে নেই। আমরা আর সোনামুড়া যাবোনা। এখানেই থাকবো।

জুঁই — তোমরা আবার কোয়ার্টারে চলে এসো না তিয়াষ দা। মেসোকে বলনা।

মেসোকে — বললেই হবে।

তিয়াষ — এখন তুই একটু ঘুমিয়ে পড়। গলাটা ছেড়ে দে। মা-মাসী এক্ষুনি এসে পড়বে।

জুঁই — আসুক। এলেই বা কী। আমি বুঝি তোমাকে ভালোবাসতে পারি না? তারা বুঝি কিচ্ছু বোঝে না ? তারা ঠিকই বোঝে।

তিয়াষ কোন প্রতিরোধ না করে জুঁইয়ের বাহু বল্লরীর ফাঁস থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। তারপর জুঁইয়ের হাতে হাত রেখে বসে থাকে। একসময় ক্লান্ত জুঁই ঘুমিয়ে পড়ে। মাধুরী এসে জুঁইয়ের খাটে মশারী দিয়ে যায়। তিয়াষ ধনী সাগরের পাড়ে গিয়ে বসে। কোয়ার্টার ছেড়ে চলে যাবার পর এই প্রথম পুকুরের ঘাটে গিয়ে বসে তিয়াষ। ধনী সাগরের জলে অনেকদিন পর পা ডুবিয়ে বসে। মনে পড়ে কবি কৃষ্ণধন নাথের একটি কবিতা —

" কভু কোন জলাশয়ে
ডুবিয়েছ পা ?
ঝর্ণার নরম জলে
ভিজিয়েছে গা ?
সাগরের নোনা জলে
দিয়েছ কি ডুব ?
নিরালা নদীর তীরে
বসেছিলে চুপ ?

ছোট্ট এই কবিতাটি তিয়াষের মনে গভীর আলোড়ন তোলে। জুঁই সুস্থ থাকলে এই চাঁদ্‌নী রাতে সেও যে এখানে এসে বসত। এতক্ষণের ক্লান্তি, উৎকণ্ঠা দুর্ভাবনার অনেকটাই অবসান হয়েছে। মনটা এখন হাল্কা, নির্ভার মনে করছে তিয়াষ। অদূরে গাছের ডালে বসে একটি লক্ষ্মী পেঁচা ডেকে উঠল। দূর থেকে রাত জাগা পাখিদের ডাক কানে আসছে। ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে জুঁইয়ের ওষুধ নিয়ে একটু আগে হিমাদ্রিও ফিরে এসেছে।

ধনী সাগরের জলে হাওয়া ঢেউ তুলেছে। কয়েকটা বালি হাঁস চাঁদের আলোয় উড়ে গিয়ে আবার জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বালি হাঁসেরা শীত শেষ হলেই উত্তরে উড়ে যায়। ছোট ছোট ছানা-পোনারা উড়তে পারে না বলে তারা থেকে যায়। বেঁচে থাকলে পরবর্তী দলের সঙ্গে উড়ে যাবে। কিন্তু মানুষ যে বড়ো নিষ্ঠুর। মেরে যে খেয়ে ফেলে ।

টলটলে দীঘির জলে পদ্ম আর শাপলার পাতা জলের উপর জেগে উঠছে।

দু'টি পালক

শীতের সময় পাতাগুলি মরে যায়। জলের নীচে পদ্ম-শাপলার কন্দমূল বসন্তে জেগে ওঠার জন্য সারা শীতকাল ঘুমিয়ে কাটায়। ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি সময়ে একটি দুটি পদ্মকুঁড়ি জেগে ওঠে। তারপর একসময় ধনী সাগরের অর্দ্ধেক জলাশয় সাদা পদ্মফুলে ভরে যায়। এরাই যেন প্রকৃতিতে আগমনীর প্রথম বার্তাবহ। নদীর পাবে শ্বেত কাশফুল, প্রাঙ্গনে শিউলি, জলাশয়ে পদ্ম, আকাশে সাদা মেঘের পান্‌সী — এই সব মিলিয়ে শরৎ। তিয়াষের চোখের সামনে চিত্রনাট্যের চিত্রপটের মতো এই ছবিগুলি একে একে ভেসে উঠেই আবার মিলিয়ে যায়। ধনী সাগরেব চারপাশে গত কয়েক বছরের অনেক স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে। হীরা-মুক্তা-মাণিক্যেব মতো সেই সব স্মৃতির কনিকাগুলি প্রত্যুষের রৌদ্র স্নাত শিশির বিন্দুর মতো জ্বল জ্বল করে।

মা এসে তিয়াষের পাশে বসে — বাবুন, কি ভাবছিস এখানে বসে বসে ? মা, আদর করে তিয়াষের মাথায় হাত রাখে। তিয়াষও আবেগে মায়ের বুকে মুখ লুকায়।

মায়ের বুকে মুখ রেখেই তিয়াষ বলে — মা, একটা গান গাও না, গান শুনতে বড্ডো ইচ্ছে করছে ।

নন্দিতা বলে — দূর বোকা ছেলে। ঘাটে বসে গান গাইলে মানুষ আমাদেব পাগল বলবে রে।

তিযাষ — মা, সব কথা ফুরিয়ে গেলে - শুধু গান থাকে, তাই না মা ?

নন্দিতা — বাবুন, তুই কেন এত ভাবিস বে , বলতো।

তিয়াষ — মা, তুমি কখনো গাছকে কাঁদতে দেখেছে ?

নন্দিতা — গাছ কখনো কাঁদতে পারে ? কি যে বলিস্ তুই ?

তিয়াষ — হ্যাঁ, মা গাছ কাঁদে । আমি একবার আমাদেব গ্রামেব বাড়ির নাগ কেশরের গাছটাকে কাঁদতে দেখেছি। জানো মা, গাছ কাঁদলে গাছেব পাতা থেকে বিন্দু বিন্দু জল গড়িয়ে পড়ে ।

নন্দিতা — জুঁই কেঁদেছে বলে তোর খুব মন খারাপ লাগছে ? জুঁই এখন সুস্থরে। ওর জ্বর পড়ে গেছে । চল আমরা এখন ঘরে যাই।

তিয়াষ — মা, চলো না, একটু মৌদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।

নন্দিতা বলে — চল্, তুই হাঁটতে থাক। আমি তোর রাঙ্গা মাসীকে বলে আসছি।

ধনী সাগব পারের কোয়ার্টার ছেড়ে তিয়াষরা প্রায় আটমাস আগে চলে গেছে। এ'ক মাসেই সব যেন কেমন অপরিচিত। দু'একজন দেখলেও মামুলী কুশল প্রশ্ন ছাড়া

আর কিছুই জানতে চায়নি। দূরে চলে গেলে হৃদ্যতা বা আন্তরিকতায়ও যেন কোথায় ভাঁটা পড়ে ।

নন্দিতাকে দেখে পাশের কোয়ার্টারের এক মহিলা জিগ্যেস করে— কবে এলেন দিদি? কেমন আছেন? ভালো?

নন্দিতা উত্তর দেয় — হ্যাঁ, ভালো। আপনারা কেমন আছেন? আপনার ছেলের খবর কি ?

মহিলা — না, তেমন ভালো নেই গো দিদি । ছেলেটা এবার পাশ করেনি। তার বাবা কম চেষ্টা করেনি। আসি দিদি, সময় পেলে আসবেন। এই মহিলা তিয়াষদের কোয়ার্টারে কারণে-অকারণে কত এসেছে । সব সম্পর্কই একদিন স্মৃতি হয়ে যায়।

মৌ-দের বাড়ির দিকে যেতে যেতেই, মাঝপথে গিয়ে থেমে যায় তিয়াষ। তারপর মাকে বলে— মা, ভালো লাগছে না। চল ফিরে যাই। আজ আর মৌদের বাড়ি যাব না। কাল যাবো।

নন্দিতা — বাবুন, তোর মনটা আজ ভালো নেইরে। কি ভাবছিস ? ঠিক আছে, তোব যখন ভালো লাগছে না, চল ফিরে যাই।

মৌদের বাড়ি যাওয়া হল না। গ্রীষ্মের চাঁদনী রাতে মা ও ছেলে ধনী সাগরের পারের পিচ ঢালা পথ ধরে হিমাদ্রিদের কোয়ার্টারে ফিরে আসে।

রাত হয়েছে। মাধুরী খাবারের আয়োজন করছে । জুঁই এখনো ঘুমোচ্ছে। জ্বর ছেড়ে গেছে। নন্দিতা ও মাধুরী জুঁইয়ের পাশে এক বিছানায় ঘুমিয়েছে। তিয়াষ ও হিমাদ্রি আলাদা আলাদা বিছানায়। তিয়াষের দেহে মনে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার এক অজানা ক্লান্তি। বিছানায় গা এলিয়ে দেবার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিয়াষের ঘুম এসে যায়।

শেষ রাতের দিকে জুঁইয়ের ঘুম ভেঙ্গে যায়। জুঁই বুঝতে পারে একপাশে মা, আর এক পাশে নন্দিতা মাসী। নন্দিতাকে জুঁই মিষ্টি মাসী বলে। ঘুম ভাঙ্গার পর জুঁই বুঝতে পারে যে, সে মিষ্টি মাসীর বুকে। বুঝতে পেরেই জুঁই মিষ্টি মাসীর গলা জড়িয়ে ধরে। ঘুমের ঘোরে নন্দিতা জুঁইকে আদর করে দেয়। জুঁই আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে যায় মাধুরীর। বাসি কাপড় ছেড়ে মাধুরী মেয়ের জন্য রান্না চাপিয়ে দেয়। মসুর ডালের স্যুপ, শুক্তো ও মাছ ঝোল করে আটটার মধ্যেই ভাত পথ্য দিয়ে দেয়।

ততক্ষণে সকলেই ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। নন্দিতা সকলকে চা ও প্রাতঃরাশ দিয়ে দেয়। জুঁইটা এই ক' দিনেই কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। বৃন্তচ্যুত পদ্মকুঁড়ি যেমন

রৌদ্রের তাপে শুকিয়ে যায়, জুঁইকে দেখতেও তেমন লাগছে । জুঁইয়ের ম্লান শুচি-সুন্দর রোগ ক্লান্ত চেহারা দেখে তিয়াষের তাকে কুমারী মেরী মাতা বলে মনে হয়।

তিয়াষ ও নন্দিতা সারাদিন জুঁইদের কোয়ার্টারে কাটিয়ে সন্ধ্যার মুখে তাদের ভাড়া বাড়িতে যাবার জন্য তৈরী হয়। কিন্তু জুঁই তাদের যেতে দিতে নারাজ। জুঁই নন্দিতাকে বলে — মিষ্টিমাসী, আজ তোমরা কিছুতেই যাবে না বলে দিচ্ছি। গেলে কিন্তু আমি রাত্তিরে কিছুই খাব না। অসুখ করলে কাল আবার দৌড়ে আসবে। তার চেয়ে বরং আজ থেকে যাও। কাল তোমাদের যেতে বারণ করব না।

— অগত্যা সে রাত্রিও তারা সেখানে থেকে গেল।

বাসায় ফেরা হলো না দেখে নন্দিতা ও তিয়াষ অপরাহ্নে মৌদের বাড়ি যায়। নিরুমাসী অনেকদিন পর তাদের পেয়ে খুবই আদর আপ্যায়ণ করে। মৌয়ের তিয়াষকে দেখে একটু লজ্জা লজ্জা ভাব হয়। সে চুপচাপ ঘরের ভেতরে বসে থাকে। তাদেব সামনে আসেনা।

নিরুপমা মৌকে ডাকে — এই মৌ দ্যাখ কে এসেছে ? তিয়াষ ও তোর মিষ্টিমাসী এসেছে। এদিকে আয়।

মৌ দূর থেকেই তাদের আসতে দেখেছিল। এখন না দেখার ভান কবছে । তিযাষ মৌয়ের মধ্যে একটা আড়ষ্ট ভাব দেখতে পায়। আগে তো কখনো মৌযেব এমনটি হয়নি। আজ এমন হচ্ছে কেন?

মৌ তো ভালো করেই জানে এবং বোঝে যে তিয়াষদা জুঁইকে ভালোবাসে। তাদের মা-বাবাও তো তাই চায়। তার মাও আড়ালে- আবড়ালে কিংবা আকারে - ইঙ্গিতে এমনটাই বহুবার প্রকাশ করেছে । তবু মৌয়েব মন যে বুঝতে চায় না। সেও তো তিযাষকে ভালোবাসে। কিন্তু মৌ সে কথা কিছুতেই তিয়াষকে বলতে পারে না।

মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে এবার পর্দার আড়ালে এসে দাঁড়িয়ে মুখটা বের কবে বলে — কেমন আছ মিষ্টিমাসী ?

জুঁইয়ের দেখাদেখি সকলেই নন্দিতাকে মিষ্টিমাসী বলে। আর মাধুরী সকলের কাছে রাঙ্গা মাসী বলে পরিচিত।

এবার নিরুপমা মেয়েকে ধমক দিয়ে বলে — তোর এমন ঢং হল কবে থেকে ? তাঁদের যেন আগে কখনো দেখিস্ নি। তোব মিষ্টি মাসীকে প্রণাম কর। মায়ের ধমক খেয়ে মৌ তাড়াতাড়ি নন্দিতার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। মাকেও প্রণাম করে মৌ। গুরুজনদেব প্রণাম করার পাশাপাশি মা-বাবাকেও প্রণাম করতে হয়। মা-বাবা যে সকলেরই উপরে।

দু'টি পালক

প্রণাম করতে করতে মৌ হঠাৎই তিয়াষকে প্রণাম করে। তিয়াষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটনাটা ঘটে যায়। তাই সে পা সরিয়ে নেবার সুযোগই পায়নি।

তিয়াষ কিছুটা হকচকিয়ে গিয়ে মৌকে বলে — কিরে মৌ? আমাকে প্রণাম করলি কেন? আমি কি তোদের প্রণাম নেবার যোগ্য?

মৌয়ের লজ্জা লজ্জা ভাব কেটে যায়। মৌ মৃদুভাষী। সে বলে — তুমি যে আমার মাষ্টার মশাই। এখানে থাকতে তুমি আমায় অংক-বিজ্ঞান পড়াতে। মৌ আসলে তিয়াষকে একটু ছুঁতে চেয়েছিল। প্রণাম করার ছলে মৌ তাই করে।

তিয়াষও মা ও নিরুমাসীকে প্রণাম করে । তারপর বলে — আমার তো তোকে আশীর্বাদ করার বয়স হয়নি রে মৌ। আমি তোকে কি বলে আশীর্বাদ করবো বলতো। আমিই যে সকলের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থীরে।

মৌ — তিয়াষদা, আমায় ক'টা অংক বুঝিয়ে দাও না। তুমি আমার ঘরে এসো। মা ও মিষ্টিমাসী গল্প করুক।

মৌ তিয়াষকে অংক বইটা দিল। তিয়াষ পর পর বেশ ক'টি অংক মৌকে বুঝিয়ে দিল। তিয়াষ লক্ষ্য করে মৌ যেন কেমন অস্থির, চঞ্চল। তার পড়ার প্রতি কোন আগ্রহই নেই। আজ তার মন অন্য কিছু চায়। মৌ অংক করতে করতে হঠাৎ কলমটি তিয়াষের পায়ের কাছে ফেলে দেয়। ঝুঁকে পড়ে এক সঙ্গে দু'জনেই কলমটা তুলবার জন্য হাত বাড়ায়। তিয়াষের হাতের সঙ্গে মৌয়ের হাতের স্পর্শ লাগে। এক অসংযত আবেগে মৌ তিয়াষের হাতটা ধরে ফেলে। তিয়াষ কোন প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে মৌয়ের হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। সজোরে ধরে রাখার চেষ্টা করেও মৌ ব্যর্থ হয়। মৌকে একটি কথাও বলে না। তারপর আরো কয়েকটি অংক করে দিল তিয়াষ। তারপর উঠে পড়ে। যাবার সময় মৌকে বলে — যাইরে মৌ। অংকগুলি দেখিস। আর একদিন এসে বাকীগুলি বুঝিয়ে দিয়ে যাব। — বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে যাবার সময় মাকে বলে মা, আমি যাচ্ছি। তুমি এসো। নিরুমাসী এখন যাই। তুমি মৌকে নিয়ে একদিন আমাদের বাসায় এসো।

নিরুমাসী — যাই বলতে নেই বাবা, এসো।

তিয়াষ চলে যাবার পর মৌয়ের বুকটা টিপ্ টিপ্ করতে থাকে। স্বাভাবিক হতে অনেক্ষণ সময় লাগে মৌ'র। মৌ ভাবে — তিয়াষদার কাছে আমি আসলে ছোট হয়ে গেলাম। কি ভাববে আমায় তিয়াষাদা। মৌ তো জানে যে তিয়াষদা সত্যি সত্যিই জুঁইকে ভালোবাস। জুঁই তো দেবীর মতো সুন্দর। শুধু বাইরে নয়, জুঁই মনেও সুন্দর। ওর মতো

মেয়ে তো হাজারেও একটা মিলে না। তবে তিয়াষদাকে ভালোবাসার অধিকার কি জুঁইয়ের একার? মৌয়ের কি তবে তিয়াষদার উপর কোন অধিকার নেই। জোর করে কি কারো ভালবাসা আদায় করা যায়? তিয়াষদা তো মৌয়ের মনের কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। মৌও তো তিয়াষকে ভালোবাসে, অন্তর দিয়েই ভালোবাসে। জুঁই ভালোবাসতে পারলে, সে নিজে কেন ভালোবাসতে পারবে না? ভালোবাসা তো কারো একচেটিয়া অধিকার হতে পারে না। মৌ কালো। টাকা-পয়সা-ধন সম্পত্তিও কম। ভালোবাসার জন্য কি রূপ লাগে ? অর্থ-বিত্ত লাগে ? কালো হলে কি ভালোবাসতে নেই?

তা কেমন করে হয় ? গরীবের মেয়েদের কি কোন হৃদয় নেই? মৌ নানা কথা ভাবতে ভাবতে নিজে নিজেই কেঁদে ফেলে। নিজেকে সে আর কিছুতেই ধরে রাখতে পারে না। তিয়াষদার নীরব প্রত্যাখ্যান মৌয়ের সমস্ত সত্তাকে ভেঙ্গে দুমড়ে মুচড়ে একাকার করে দিয়ে যায়।

তিয়াষ জুঁইদের ঘরে ফিরে আসে। তিয়াষকে দেখেই জুঁই মুখ ঘুরিয়ে রাখে। মৌদের ওখানে যাওয়াই যে জুঁইয়ের এমন আচরণ তা তিয়াষ ভালো করেই জানে।

তিয়াষ মাধুরীকে কৌতুক করে বলে — রাঙ্গামাসী, বৃষ্টি আসবে গো, দেখ কেমন মেঘ করেছে।

মাধুরী তিয়াষের ইঙ্গিত বুঝতে না পেবে বলে — বাবাবে বৃষ্টি এলে ভালো হয়। দেখছিস্ না ভ্যাপসা গরমে ঘেমে নেয়ে একেবাবে একসা হয়ে গেলুম। তিয়াষ — রাঙ্গামাসী, তুমি কিছুই দেখ না। আকাশে মেঘ জমেনি। ঘরের ভেতরে মেঘ জমেছে গো।

মাধুরী এবার কথার অর্থ বুঝতে পেবে হেসে ওঠে। মাধুবীও জানে তিয়াষ মৌদের বাড়ি গেলে জুঁই তা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না।

মাধুরী ও নন্দিতা দু'জনেই বিলোনীয়ার মেয়ে। তাবা দু'জন তাদের শৈশব, কৈশোব, যৌবন এবং বিবাহিত জীবনও প্রায় এক সঙ্গেই কাটিয়ে দিচ্ছে। মাধুরীদেব বাড়ি বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠের পাশে, আর নন্দিতাদেব বাড়ি ইন্দ্রপুরী সিনেমা হলের পেছনে। নন্দিতা, মাধুরী দু'জনই একই ক্লাশে পড়ে। ছোটবেলা থেকেই তারা দু'জন ভালো বন্ধু। তারা দু'জনই একই স্কুলে পড়ে। চৈত্রমাসে 'মজিদ মিঞার' ঘাটে বারুনী মেলা বসে। প্রচুর লোক সমাগম হয়। তারা দু'জনই এক সঙ্গে মেলায় যেত। মেলা থেকে মাটির হাঁড়ি-কলসী-উনুন কিনে আনত। সঙ্গে মাটির পুতুল। এসব নিয়ে রান্না রান্না খেলা, পুতুলের বিয়ে বিয়ে খেলা - কেটে গিয়েছে শৈশবের দিনগুলি। ছুটির দিনে পাল্টাপাল্টি করে এবাড়ি ওবাড়ি যাওয়া আসা, কৈশোরের দিনগুলিতে স্কুল মাঠে গোল্লাছুট খেলা — এসবের আনন্দ তো কম ছিল না। তবে তাদের দু'জনের প্রিয় খেলা - এক্কা-দোক্কা- আর ধাপ্পু খেলা।

দু'টি পালক

কালের ধারা বেয়ে সবই তো এখন হারিয়ে যাচ্ছে।

এখন শিশুদের খেলনার কত উপকরণ — আর কত নতুন নতুন খেলা - তবু যেন কিছুতেই মন ভরেনা। তারা দুই বান্ধবী ক্লাশ এইট-নাইন অব্দি এসব খেলাই খেলত। মা কত বকাবাকি করতো - বলতো - এমন ধিঙ্গি ধিঙ্গি মেয়ে - কি রে তোদের কোন লজ্জা শরম নেই, তারা এসব গায়েই মাখত না।

মুহুরী নদীর চরে তখন ভালো আখ হতো। একবার দুই বান্ধবী নদীর চরে আখ খেতে যায়। সেখানে তাদের পাড়ার মন্টুদা তখন আখ কাটছিল। তাদের দেখে মন্টুদা ডেকে বলে - কি রে তোরা কুইশ্যাইর (আখ) খাইবি? আয় এদিকে আয়।

বলেই দুইটা আখ কেটে তাদের ডাকে। তখন বেলাও পড়ে এসেছিল। এদিকে লোকজনের আনাগোনা কম। ভয়ে ভয়ে তারা একটু যায়। তারা জানে মন্টুদা ছেলেটা ভালো নয়। তাদের থেকে প্রায় ছয় সাত বছরের বড়। পাড়ায় খুবই বদনাম। — দূর থেকে মাধুরী বলে - ছুঁড়ে দাও মন্টু দা।

মন্টুদা বলে — অতদূর ছুঁড়তে পারব না। আয় নিয়ে যা। মাধুরী নন্দিতাকে বলে - তুই এখানে দাঁড়া। আমি নিয়ে আসছি। বলেই মাধুরী আঁচলটা কোমরে গুঁজে আখ আনতে যায়। আখ তুলতে যেতেই মন্টুদা মাধুরীকে ঝাপ্টে ধরে। তখন মাধুরী ও নন্দিতা একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে। তাদের চীৎকার শুনে লোকজন দৌড়ে আসে। ততক্ষণে মন্টুদা মাধুরীকে ছেড়ে দিয়েছে। আখ খাওয়া রেখেই জমি থেকে পাড়ে উঠে আসে। তাদের কাছ থেকে সব কথা শোনার পর মন্টুদাকে ধরে এনে গাছের সঙ্গে বেঁধে বেদম মার দেওয়া হয়। সেই থেকে মন্টুদা আর কোনদিন মাধুরী ও নন্দিতার দিকে চোখ তুলে তাকায়নি। বাড়ি ফিরে মাকে সে সব বলার পর তাদের দু'জনের ভাগ্যেও অনেক লাঞ্ছনা জুটেছিল।

সেই মন্টুদাই কি করে ফুসলিয়ে বগা ফা থেকে এক বড়লোকের শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে ফেলে। মেয়েটি বি.এ. পাশ। আর মন্টুদা সাতবার মেট্রিক দিয়েও পাশ করতে পারেনি। সেই মন্টুদাই এখন দলের এক বড় নেতা। নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চ্যায়ারম্যান হয়েছিল একবার।

তাদের দু'জনের জীবনে সে অর্থে গোপন কিছুই নেই। তারা দু'জনে দু'জনের সব কথাই বলতো। কোন ছেলে পেছন পেছন ঘুর ঘুর করে। কোন ছেলে কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে। কার মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে। এমনি অনেক কথাই তারা আলোচনা করত।

নন্দিতার পেছনে বিলোনীয়া কলেজের একটা ছেলে অনেকদিন ঘুরেছে। ছেলেটা

দু'টি পালক

বৈদ্যের টিলায় মাসী বাড়ি থেকে কলেজে পড়তো। ছেলেটির নামও বিদঘুটে। রাখহরি। তার এক মাসতুতো বোন ছিল নন্দিতারই সহপাঠী। নাম তামসী। সেই রাখহরি একবার তামসীর মারফৎ নন্দিতার কাছে একটি প্রেমপত্র পাঠিয়েছিল। সে চিঠিটা না পড়েই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কেমন হ্যাংলা ছেলেরে বাবা। ছেলেটিকে দেখলেই নন্দিতার কেমন গা ঘিন্ ঘিন্ করতো। কলেজে ভর্তি হবার পরও ছেলেটি পিছু ছাড়েনি। তবে নন্দিতা কোন দিন তার সঙ্গে কখনোই কথা বলেনি। নন্দিতার বিয়ের বহু বছর পর একদিন সেই রাখহরিকে এক ভোঁটকা কালো মত মেয়েকে নিয়ে হকার্স কর্ণারে ব্লাউজ কিনতে দেখেছিল। নন্দিতাকে দেখেই রাখহরি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছিল। নন্দিতা ইচ্ছে করেই সেই দোকানে গিয়েই রাখহরির বৌয়ের পাশে দাঁড়িয়েই ব্লাউজের দরদাম করছিল। রাখহরি কাল বিলম্ব না করে বৌকে নিয়ে হকার্স কর্ণার থেকে বেরিয়ে যায়। তারপর আর কোনদিন দেখা হয়নি।

মাধুরীর জন্য তো তাদের পাড়ার গোপালদা একেবারেই পাগল হয়ে যায়। গোপালদা যে মনে মনে মাধুরীকে ভালোবাসত তা মাধুরী কেন, কেউই জানত না। গোপলদা 'মাধুরী' 'মাধুরী' করে পাগল না হলে কেউই জানত না। গোপালদা ছিল বিদ্যাপীঠ স্কুলের সেরা ছাত্র। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনটি লেটার নিয়ে প্রথম বিভাগে পাশ করে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হয় । দুই বছর পর পাগল হয়ে ফিরে আসে।

গোপালদার প্রতি মাধুরীরও দুর্বলতা ছিল। মাধুরী নন্দিতাকে বলত — জানিস নন্দিতা, গোপালদার কথা মনে পড়লে খুবই খারাপ লাগে রে। জানিস - দাদার ওখানে গেলে - গোপালদা জানতে পারলেই একবার অবশ্যই আসবে এবং বলবে —- মাধুরী, তুমি ভালো আছ তো। ভালো থেকো। —

— শুদ্ধ কলকাতার ভাষায় কথা কটি বলেই আমার মুখের দিকে একটু চেয়ে থাকবে। তারপর চলে যাবে। রাস্তা ঘাটে দেখলেও আর কোন কথা বলবে না। - তখন সত্যিই গোপলদার জন্য মনটা খারাপ হয়ে যায়।

নন্দিতা ও মাধুরী — দুই ছোটবেলার বান্ধবী জৈষ্ঠের এক সন্ধ্যায় ধনী সাগরের পারে সিঁড়ির উপর বসে নিজেদের হারিয়ে যাওয়া দিনের নানা কথা ভাবছিল এবং এসব নিয়ে আলোচনাও করছিল।

নন্দিতাই মাধুরীকে বলে — মাধুরী, গোপালদা এখন কেমন আছে রে ?

মাধুরী বলে — আগের মতই । স্বাভাবিক না।

নন্দিতা — জানিস মাধু, গোপলদার জন্য আমারও খারাপ লাগে রে।

মাধুরী — আমারও খারাপ লাগে। তবে গোপলদাকে বিয়ে করিনি বলে আমার

মনে কোন ক্ষোভ বা দুঃখ নেই। তবে এমন একটা ব্রিলিয়ান্ট ছেলের জীবন এভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, আমি সত্যিই কষ্ট পাই।

নন্দিতা — গোপালদা একদিন না একদিন পাগল হতই। তুই বিয়ে না করে ভালোই করেছিস। বিয়ে করলে সারাজীবন এমন একটা বোঝা নিয়েই তোর দিন কাটাতে হতো।

কিছুক্ষণের জন্য নন্দিতা ও মাধুরী কেমন নস্টালজিক হয়ে ওঠে। কোন কথা না বলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। নিজ নিজ স্মৃতির মেদুরতায় তারা নিজেরা কেমন যেন আনমনা হয়ে যায়। — মাথার উপর দিয়ে কয়েকটা বালিহাঁস উড়ে এসে ঝুপ্ ঝুপ্ ধনী সাগরের জলে পড়ে। একটা রাত জাগা পাখি দীঘি পাড়ি দিয়ে উড়ে গেল ? পাখিটার প্রণয়িনী কি তারই জন্য প্রতীক্ষা করে আছে ? — কে জানে। — নন্দিতার জীবনানন্দ দাসের কবিতা মনে পড়ে —

''বালিহাঁস পাখা মেলে সাঁই সাঁই শব্দশুনি তার
এক-দুই-তিন-চার অজস্র অপার।

গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হয়ে এসেছে। নন্দিতা ও তিয়াষ পরদিনই তাদের ভাড়া বাড়িতে চলে আসে। তপোধীর টেলিফোনে খবরা খবর নিয়েছে। পরের শুক্রবার স্কুল খুলবে। জুঁই রোগের ঝাপটা সামাল দিয়ে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাষ অনুযায়ী রাজ্যে মৌসুমী বায়ু ঢুকে পড়েছে। একদিকে ঘন কালো মেঘের আনাগোনা। থেমে থেমে বৃষ্টি পড়ছে। কখনও ঝির ঝির, কখনো মুষলধারে।

আকাশে মেঘ জমলে তিয়াষের মন কেমন উদাসী হয়ে যায়। কি যেন হারাই হারাই ভাব। ষান্মাষিক পরীক্ষার বড় একটা বেশী দেরী নেই। তিয়াষের এবার পড়াশুনোয় খুবই বিপত্তি ঘটেছে। বার বার স্থান পরিবর্তন, নতুন পরিবেশ, জুঁইয়ের অসুস্থতা, জুঁইয়ের সঙ্গে সম্পর্কের টানা-পোড়েনও যে অনেকটা দায়ী। পড়তে বসেও পড়াশুনোয় বেশী মন দিতে পারেনি। মনে যে চঞ্চলতা। মা, তিয়াষের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে । বুঝতেও পেরেছে । একদিন অকারণেই নন্দিতা তিয়াষকে খুব বকা-ঝকা করেছে। পরীক্ষার আগেই আবার একটা আন্তর্জাতিক উৎপাত শুরু হয়েছে। ভারত-অষ্ট্রেলিয়া একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ। টি.ভি.তে খেলা দেখতে গিয়েও পড়াশুনোর ব্যাপক ক্ষতি হয় তিয়াষের।

তিয়াষও বুঝতে পারে যে সে পড়াশুনায় একটু পিছিয়ে পড়েছে। পরীক্ষায় ভালো ফল করতে না পারলে যে জীবনের কোন মূল্যই নেই। তিয়াষের মনে যে এখন অনেক স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখা ভালো। আকাশ-কুসুম স্বপ্ন দেখা কি ভালো? তিয়াষ জুঁইকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সে স্বপ্নের যে কোন অবয়ব নেই। আকার নেবার আগেই মিলিয়ে যায়। বৃষ্টির

দু'টি পালক

আগে আকাশে যেমন রামধনু দেখা দেয়, আবার ক্ষণকাল পরেই মিলিয়ে যায় । এও যেন তেমনি।

বহুদিন পর স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা। হৈ-চৈ, দিন দিন ক্লাশে পড়ার চাপ। ইতিমধ্যে একসময় পরীক্ষাও শেষ হয়ে যায়।

অনেকদিন জুঁইয়ের সঙ্গে দেখা নেই। তাদের বাড়িতে যাওয়াও হয়না। জুঁইয়েরও পরীক্ষা শেষ হয়েছে। মা ও রাঙ্গামাসীর আসা-যাওয়া, কথা-বার্তা সবই ঠিক আছে। কিন্তু মাধুরী ও নন্দিতা দু'জনেই তাদের সন্তান সম্পর্কে এখন ভীষণ সিরিয়াস। এ বয়সের ছেলে-মেয়েরা মাখনের মত নরম, তুলতুলে। যতক্ষণ না ওরা শক্ত ছানা হয়ে উঠছে, ততক্ষণ খেয়াল রাখা দরকার। ছানা হয়ে ভেসে উঠলেই নিশ্চিন্ত, তখন ওবা নিজেদেব আত্মশক্তিতেই ছানার মতো সব কিছুর উপরে ভেসে থাকতে পারবে। তিয়াষ ইচ্ছে করলেই জুঁইয়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে পারে। একবার যদি এই কথা বলা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়, তবে তা একসময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।

এরই মধ্যে মিলিদি কয়েক বারই তিয়াষকে তাদের বাড়ি যাবার জন্য চাপাচাপি করেছে। তিয়াষ এক একদিন এক এক অজুহাত দেখিয়ে যায়নি। সেদিন কোন এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আকষ্মিক মৃত্যুতে প্রথম ঘন্টাব পরই পুরো স্কুল ছুটি হয়ে যায়। মিলি স্কুলের গেইটের সামনে দাঁড়িয়েছিল। সোহম ও পলাশ সহ তিয়াষ স্কুল থেকে যাবার সময় মিলি তাদের গেইটের সামনে পথ আটকায়। তাবপর তিয়াষকে বলে — এই তিয়াষ। তুই আমাদের বাড়ি আজকাল যাস না কেন রে? মা তোকে কতদিন যেতে বলেছে । যাবি এখন ? তবে চল্।

তিয়াষ — না মিলিদি, এখন যাব না। আজ আমরা খেলা দেখতে যাব। আর একদিন তোমাদের বাড়ি যাব।

মিলি — আমার সঙ্গে তুই মিছে কথা বলছিস্? ঠিক করিস নি। ঠিক আছে , যাস্ না আর আমাদের বাড়ি। মাকে বলে দেবো যে, তিয়াষ আমাদের বাড়ি আসতে পছন্দ করে না।

তিয়াষ — একথা বলছ কেন মিলিদি ? আজ বিকেলেই তোমাদের বাড়ি যাব।

মিলি — সত্যি বলছিস্ ? যাবি ঠিকই ?

তিয়াষ — মা কালীর দিব্যি। আজ বিকেলে যাবই। জেঠিমাকে মুড়ির মোয়া করে রাখতে বলো।

তিয়াষের পায়েষ আর মুড়ির মোয়া খুবই প্রিয়। শ্রাবণের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

দু'টি পালক

সাবাদিনই আকাশের মুখ ভার। থমথমে কালো মেঘে আকাশ ঢেকে আছে। প্রবল বৃষ্টি নামবে। মাকে বলে তিয়াষ মিলিদের বাড়ি যায়। তিয়াষদের ভাড়া বাড়ি থেকে মিলিদের বাড়ি খুব একটা দূরে নয়। পাঁচ-সাত মিনিট হেঁটেই যাওয়া যায়। তিয়াষ বের হবার একটু পরেই একফোঁটা-দুফোঁটা করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। মিলিদের বাড়িটা একটা প্রশস্তগলির শেষ প্রান্তে। সাজানো-গুছানো বেশ বড় বাড়ি। ঢুকতেই গ্রীল দেওয়া বড় গেইট। তারপর ঘাস বিছানো পথ। বাড়ির ভেতর সাজানো বাগান। জেঠিমা আর মিলিদিই বাগানটা বেশ পরিচর্যা করে। বাগানে নানা জাতিব ফুল গাছ। সাত-আট প্রজাতির হলুদ, লাল, সাদা, নীল জবা ফুল। বেড়ার উপর সাদা-নীল অপরাজিতা, কুঞ্জলতা, রাধাচূড়া। বাগানের চারপাশে কেয়ারী করা রঙ বেরঙের পাতা বাহারের ঝাড়। ভেতরে রজনীগন্ধা, বেলি, কুন্দ। শ্রাবণ সন্ধ্যায় বেলির সৌবভ বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ঢোকার মুখে গেইটের সামনে দুইদিকে দুইটি শিউলি ফুলের গাছ। এই শ্রাবণেই শিউলি গাছে দু'একটি কুঁড়ি জেগে উঠেছে। সামনে দুটি কামিনী ফুলের গাছ। দুই কোনায় দুটি টগব ফুলের গাছ। ছাতার মত বিস্তার। শ্রাবণে সাদা ফুলের মাতামতি বেশী। বর্ষার প্রায় সব ফুলই সৌবভময়। বাড়িতে ঢুকেই তিয়াষ ডাক দেয় — জেঠিমা, জেঠিমা দরজা খোল তাড়াতাড়ি - বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছি — জেঠিমা ও জেঠিমা —

মিলি এতক্ষণ বাইবেই চোখ রেখেছিল। তিয়াষেব প্রতীক্ষাই করছিল। বৃষ্টি আসছে দেখে, জানালা বন্ধ করতে গেছে। তিয়াষেব ডাক শুনে তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলে দেয়। দরজা খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তিয়াষ ঘরে ঢুকে যায়। মিলি তিয়াষকে বলে — তুই বোস্। আমি জানালাগুলো বন্ধ করে আসি। জল ঢুকছে। — বলেই মিলি জানালা বন্ধ করতে চলে যায়। তিয়াষ একটা চেয়াব টেনে বসে পড়ে। ততক্ষণে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামে। মিলি ঘবের আলো জ্বেলে দিল। তারপর বলে — মা, মাসীর বাড়ি গেছে রে। এখনো তো এলো না। কখন গেছে।

মিলিদির মাসীর বাড়ি ধ্বজনগর। আর মিলিদের বাড়ি উদয়পুর ডাক-বাংলা রোডে। শুক-সাগর জলার উপর মাটি ভরাট করে বাড়ি তৈরী করেছে। শৈলেশ বাবু রুচিবোধ সম্পন্ন মানুষ। একতলা বাড়িটি সাজানো-গোছানো - তিয়াস এবার মিলিকে বলে - জেঠিমা তো বোনের বাড়ি গেছে বুঝলাম। তোমার বাবা কোথায় মিলিদি?

মিলি - বাবা, দিদির ওখানে গেছেরে। দিদির পরীক্ষা চলছে। মা এক্ষুণি চলে আসবে। না হলে বাড়িতে আমি একা থাকব নাকি?

তিয়াষ কিছু বলে না। বাইরে শ্রাবণের ধারা। মাঝে মাঝে গম্ভীর মেঘ গর্জন। লোডশেডিংয়ের ভয়ে লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখে মিলি। বড় মোমবাতি ও দেশলাই রেখে দিল

হাতের কাছে।

মিলি তিয়াষকে বলে - তুই বোস। আমি আসছি। - বলেই মিলি ফের চলে যায়।

তিয়াষ একটি পুরোনো 'দেশ' নিয়ে নাড়াচাড়া করে। ভাবে, কি জন্য আজ বৃষ্টির মধ্যে এলাম। সারা বাড়িতে একটি যুবতী মেয়ে - আর তিয়াষ। কেউ এসে পড়লে কি ভাববে? - ভাববার তো কিছু নেই। তিয়াষ তো প্রায়শই তাদের বাড়ি আসে। তাদেরই ঘরের ছেলের মতো। আর তাছাড়া মিলিদি তিয়াষের দুই ক্লাশ সিনিয়র। তিয়াষ অষ্টম শ্রেণীর পথে। মিলিদিও দশমে উঠবে।

এমন সময় মিলিদি তিয়াষের জন্য দুটি মুড়ির মোয়া ও এক বাটি পায়েস এনে সামনের টেবিলের উপর রেখে বলে - এই তিয়াষ, খা।

তিয়াষ - জেঠিমা তো বাড়ি নেই। এ সব কে করেছে?

মিলি - আমি করেছি। দ্যাখনা কেমন হয়েছে। খারাপ হলেও খেয়ে নিবি। কাউকে বলবিনা কিন্তু।

তিয়াষ মুড়ির মোয়া ও পায়েস খেয়ে বলে - পায়েস কি সত্যিই তুমি করেছ, না জেঠিমা করে রেখে দিয়ে গেছে?

মিলি - আমি নিজে করেছি। স্কুল থেকে আসার পর করেছি। মুড়ির মোয়া মা কাল করেছিল।

তিয়াষ - মিলিদি, পায়েসটা.সত্যিই দারুণ হয়েছে। তোমার হাতের এমন সুস্বাদু পায়েস খেয়ে তোমার বর কিন্তু তোমার বশ হয়ে থাকবে।

মিলি - যাঃ ফাজিল। তোকে আর অমন পাকা পাকা কথা বলতে হবেনা। তুই বোস। আমি আসছি।

মিলিদি ভেতরের ঘরে যাবার পর তিয়াষ দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। বাইরে ঘন অন্ধকার। একটানা বৃষ্টি ঝরছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক। দরজা বন্ধ করে তিয়াষ আবার ঘরে এসে বসে। একুট পরে মিলি এসে তিয়াষকে ডাকে - এই তিয়াষ এই দিকে আয়।

তিয়াষ পায়েস খেয়ে বেশ খোশমেজাজে। মিলিদের বাড়িতে তিয়াষের কোন সংকোচ নেই। তাই মিলির আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিয়াষ তার পিছু পিছু তাদের বেডরুমে যায়। মিলি তিয়াষকে খাটে বসিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়। মিনিট পাঁচেক পরে মিলি শাড়ী পরে তিয়াষের সামনে এসে দাঁড়ায়।

টিউবলাইটের আলোয় মিলিকে অপূর্ব দেখায়। এমনিতে শাড়ী নারীর সৌন্দর্য

কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। তিয়াষ কোনরকম সংকোচ না করেই মিলিদির দিকে চেয়ে বলে - মিলিদি, শাড়ী পরলে না তোমাকে অপূর্ব দেখায়। তোমাকে সত্যি দেবীর মতো লাগছে মিলিদি।

মিলি এক দৃষ্টিতে তিয়াষের দিকে চেয়ে থাকে। তিয়াষ দেখতে বড়ো মিষ্টি। এই বয়সেই বেশ লম্বা। সুন্দর স্বাস্থ্য। মজবুত গড়ন। চোখদুটি বেশ সুন্দর। জোড়া ভুরু। মাথায় ঘন কালো চুল। বড় ভালো লাগে তিয়াষকে। মিলি আসলে মনে মনে তিয়াষকে ভালোবাসে। বয়স মেপে কি ভালোবাসতে হয়? ভালোবাসার জন্য কি মেয়েদের সব সময় ছেলেদের থেকে ছোট হতে হবে? কেন? কেন এই নিয়ম। মিলি এই নিয়ম মানেনা।

এরপর তিয়াষের দিকে জিজ্ঞাসু কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে মিলি বলে - সত্যি বলছিস্ তিয়াষ? আমাকে দেখতে তোর ভালো লাগছে?

তিয়াষ - তোমাকে মিথ্যে তো কখনো বলিনি মিলিদি। তোমাকে সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছে। তোমাকে দেখতে ভালো লাগে মিলিদি।

মিলি - তুই আমাকে ভালোবাসিস্?

তিয়াষ - ওমা, একথা জিজ্ঞেস করার কি আছে? তোমাকে আমি সত্যিই ভালোবাসি।

মিলি তিয়াষের কথা শুনে তার আরও কাছে আসে। আর অতর্কিতেই তিয়াষকে হতবাক করে দিয়ে মিলি তার পরিধানের সমস্ত কাপড় খুলে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে তিয়াষকে জড়িয়ে ধরে।

হতচকিত ভাব কাটিয়ে তিয়াষ সজোরে মিলির আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। একুট সরে গিয়ে মিলি অসংকোচে নগ্ন দেহেই আলোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। কাপড় পরার একটুও চেষ্টা করেনা।

তিয়াষও সম্পূর্ণ চেতনা অবলুপ্ত মানুষের মতো মিলিদির নগ্ন সৌন্দর্য অপলক দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। মিলির নগ্ন উদ্ভাসিত লাজত্যক্তা মোহিনী উর্বশীরূপে কিন্তু তিয়াষের কোন চিত্ত বিভ্রম ঘটেনা। তিয়াষ মনে মনে নিজেকে গর্বিত মনে করে। উদ্ভিন্ন যৌবনা রমণীর এই অসংকোচ রমনীয় মূর্তি একান্তই বিরল। তিয়াষ সেই বিরল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তিয়াষ চেতনা ফিরে পেয়ে লজ্জায় অধোবদন হয়। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে মিলিকে বলে - মিলিদি আমার বড্ডো লজ্জা করছে। ভয় লাগছে। তুমি কাপড় পরে নাও। - বলেই তিয়াষ বাইরের ঘরে দ্রুত পায়ে চলে আসে। দরজা খুলে দেখে ততক্ষণে বৃষ্টিও অনেকটা কমেছে। দরজার সামনে একটু দাঁড়ায় তিয়াষ।

এদিকে বিবস্ত্রা-নগ্ন মিলি ঘরের মধ্যে প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে তার

কোন ভাষা নেই। মনে হচ্ছিল সে যেন সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন। ঠিক এই সময় লোডশেডিং হয়ে যায়। অন্ধকার হতেই মিলির চেতনা ফিরে আসে। অন্ধকারের মধ্যে হাতড়িয়ে কাপড় খুঁজে নিয়ে পরে নিল। তারপর বিছনায় পড়ে বুকে একটা বালিশ জড়িয়ে ধরে গভীর বেদনায় ও আবেগে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে মিলি।

দিশাহীনের মত তিয়াষ অস্ফুটে শুধু বলল - মিলিদি, আমি যাই। তারপর একটা ঘোরের মধ্যেই তিয়াষ বাড়ি ফিরে আসে। এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তিয়াষের কিশোর মনে প্রবল আলোড়ন ওঠে। চোখ বুঝলেই মিলির অনিন্দ্য সুন্দব অপূর্ব নগ্ন মূর্তি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কবির কল্পিত স্বপ্নলোকের মূর্তিমতী উর্বশী। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে তাঁর কবিতায় মূর্ত করে তুলেছিলেন। এই কি সেই - অনন্ত যৌবনা রূপসী নারী। যে রমণী কোনকালেই মুকুলিকা বালিকা বয়সী ছিলনা। মিলিদির নগ্ন রমনীয় রমনী মূর্তি তার দেহ মনে উত্তাপ ও চঞ্চলতা সঞ্চার করে। একটুও ঘুমুতে পারেনা। সারারাত বিছানায় ছটফট করে। চোখ বুঝলেই তিয়াষ দেখতে পায় - বিবস্ত্রা মিলিদি তিয়াষকে বুকে জড়িয়ে ধরে আছে। অন্য সময় ঘুম না এলে তিয়াষ মায়ের কাছে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকত। আজ লজ্জায় মায়ের কাছেও যেতে পারছে না।

পাখি ডাকা ভোরেই বিছানা থেকে উঠে পড়ে তিয়াষ। পড়তে বসে। একটির পর একটি বইয়ের পাতা উল্টিয়ে যায়। পড়ায় মনঃসংযোগ করতে পারে না।

সেদিন আর স্কুলে যায়নি তিয়াষ। মা চলে গেলে বাবার বইয়ের রেক থেকে বুদ্ধদেব বসু অনুদিত 'মেঘদূত' কাব্যগ্রন্থখানি বের করে তিয়াষ। এই বইয়ের পেছনে অনেকগুলি মুদ্রিত ছবি রয়েছে। তার মধ্যে একটি ভেনাসের নগ্ন মূর্তি। পাতা খুলে ছবিটির দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে তিয়াষ। মিলিদি তো এই ছবির ভেনাসের মতই। মিলিদির ফরসা নগ্ন রূপের পানে এমন করে তাকিয়ে সে নির্লজ্জের মতো কি দেখেছিল? পৃথিবীর সব নর-নারীই তো নিজের কাছে নগ্ন। একটি নগ্ন মানুষ নির্জনে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের রূপ দেখে কি কখনো লজ্জা পায়? পায় না তো। তিয়াযের এ কথা স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই যে সে এক মহাজাগতিক সৌন্দর্য দেখার অধিকারী।

তিয়াষ এবার নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করে। সে প্রকৃতই ভাগ্যবান। তিয়াষ শুনেছে শিল্পীরা মডেল দেখে ছবির পোট্রেট আঁকে। শিল্পী নির্জনে বর্ণে ও রেখায় তুলির এক একটি আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলে নগ্নিকার দেহ বল্লবীর এক একটি অনুপম ভঙ্গীমা। চিত্রার্পিতা নগ্নিকা কখনো মানবী আবার কখনো বা দেবী। তিয়াষ মিলিদিকে জীবন্ত নারী না ভেবে চিত্রার্পিতা মানবী বা দেবী ভাবতে পারছে না কেন? রমণীর এমন দেবদুর্লভ নগ্ন রূপ মাধুরী মানব জীবনে একবার দর্শন করাই তো যেতে পারে। এই রূপ না দেখলে যে

জীবন অপূর্ণ থেকে যায়। মা কালীও তো নগ্ন। কই নগ্ন কালীমূর্তি দেখে তো ভক্ত কখনো লজ্জা পায় না। বরং দেবীমূর্তির পদপ্রান্তে সকলেই মাথা নত করে।

মিলিকে তো দিদি বলেই ডাকে তিয়াষ। যৌবন বিকশিত মিলিদির লাবণ্যমণ্ডিত নগ্ন মূর্তি দেখে তিয়াষ কেন তার পদ প্রান্তে নত হয়ে একবার তাকে প্রণাম করল না? মিলিদি স্বেচ্ছায় বিবস্ত্রা না হলে তিয়াষ কি কখনো মিলিদিকে বলতে পারত - মিলিদি, তুমি একবার নগ্ন হও, আমি তোমার অনঙ্গ মুরতির রূপ সুধা পান করতে চাই। পারবো না। তিয়াষ মিলিদির কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

তিয়াষ আপন মনের অগোচরেই রমণীর নগ্ন নারী মূর্তি দেখার এক অদম্য অভিলাষ পোষণ করতো। মিলিদি তিয়াষের কাছে কি চেয়েছিল? কামনা-বাসনার তো এই বয়স নয়। তবে মিলিদি তিয়াষের বহুদিনের সুপ্ত লালিত বাসনা পূরণ করে দিয়েছে। নারীরা নাকি অন্তর্যামী। তারা পুরুষের মনের কথা জানতে পারে। তিয়াষ মিলিদিকে ভালোবাসতে চেয়েছে। তবে সেই ভালোবাসার এমন অনঙ্গ আচরণ হয়তো তার প্রত্যাশিত ছিল না।

শিশুদের নগ্ন দেখতেই তো সুন্দর। ওরা বোঝে না লজ্জা কি? শিশুর সরলতাই তার সৌন্দর্য, আর সেই সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা তার নগ্ন রূপে। মিলিদিও শিশুর মতোই সরল। আসলে অন্তরে শৈশব সৌন্দর্য ও শিশুর সাবল্য না থাকলে কেউই নিরাবরণা - বিবসনা হতে পারে না। বিশ্ব প্রকৃতি নগ্ন বলেই এত সুন্দর। প্রকৃতিকে যতই মানুষ নানা আবরণ দিয়ে ঢাকতে চায়, ততই এক উৎকট, বীভৎস রূপ প্রকটিত হয়। আসলে যা নগ্ন, তাই সুন্দর, যা সুন্দব তাই নগ্ন।

পোশাক তো মানুষের একটা ছদ্ম আববণ। পশু-পাখি তো নিরাবরণা। তাদের পোশাক পবালে না তারা স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করতে পাববে, না তাদের দেখতে ভালো লাগবে। নানা কথা ভেবে তিয়াষ তার মনকে শাসনে আনতে পারে না। সেই একই ভাবনা নানা ব্যঞ্জনা নিয়ে বুদ্বুদের মতো উঠছে আর ভাঙ্ছে। ভুলতে চাইলেও কিছুতেই ভুলতে পারে না। মন আপনা আপনিই আলোড়িত হতে থাকে।

তিয়াষ মনে মনে বলে - মিলিদি তুমি আমার জীবনকে সত্যই ধন্য করেছ, কৃতার্থ করেছ। জগতের কোটি কোটি পুরুষের যে দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয় না, না চাইতেই যে আমি তা পেয়েছি। মা-বাবার কাছেও যার নগ্ন হতে লজ্জা, সে তার সমস্ত লজ্জা বিসর্জন দিয়ে, সমস্ত সংকোচ ভুলে আমার সম্মুখে বিবসনা হতে পেরেছে। মিলিদি, তুমি আমার সত্যিকারের দিদি। আমি তোমার এই ভাস্বর মহিমময় ভেনাস মূর্তি চিরকাল আমার অন্তরে লালন করে যাব। - এসব কথা ভাবতে ভাবতেই তিয়াষ ভেনাসের প্রতিকৃতিটি বুকের ওপর রেখে বুকে জড়িয়ে ধরে। মনে মনে মিলিদির স্বপ্ন বিভঙ্গময় মূর্তির পদতলে আপনা

আপনিই লীন হয়।

মিলিদি তিনদিন পর পর স্কুলে আসেনি। তিনদিন পর তিয়াষ নিজে থেকেই একদিন মিলিদের বাসায় যায়। গিয়েই ডাকে - জেঠিমা - ও জেঠিমা - তিয়াষের ডাক শুনেই মিলির মা বেরিয়ে আসে -। বলে - তিয়াষ? তুই অ্যাদ্দিন আমাদের বাড়ি আসিসনি কেন রে? তোকে কতদিন পর দেখলাম। মিলির কাছে তোকে কতদিন খবর দিয়েছি -। আয় ঘরে আয়। বোস। যা, মিলি ভিতরেই আছে। - এই মিলি, তিয়াষ এসেছে রে। দ্যাখ্।

মিলি তিয়াষের ডাক শুনে লজ্জায় একেবারে কুঁকড়ে যায়। সেদিনেব কথা মনে করে মিলির সারা শরীর অবশ হয়ে আসে। মিলি সেদিন বর্ষণ ক্লান্ত নিভৃত পরিস্থিতিতে মনের আবেগ, চপলতা ও প্রবৃত্তির দুর্মর তাড়নায় সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে তারই অনুজপ্রতিম কিশোর বয়সী তিয়াষের সামনে উলঙ্গ হয়ে মনের যে কদর্যতার পরিচয় দিয়েছে তার ক্ষমা কোথায়। বয়ঃসন্ধি নারী মনে এমন বিভ্রান্তি এনে দেয় কেন? নারীমনকে নিয়ে প্রকৃতিব এই কি নিষ্ঠুর খেলা? নাকি এমন আচরণ জীবন-যৌবন বিকাশকালের অতি স্বাভাবিক ঘটনা। নগ্ন হওয়া কি পাপ? অপরাধ? দুর্জ্ঞেয় মানব মনের অতলে দাঁড়িয়েও কি এই দুর্বোধ্য প্রশ্নের সঠিক কোন উত্তর খুঁজে পাওয়া সম্ভব?

মিলি তিয়াষের গলার আওয়াজ পেয়েই রান্না ঘরে চলে যায়। কোন মুখে মিলি তিয়াষের সামনে দাঁড়াবে। কি বলবে তিয়াষকে? তিয়াষ যদি তাকে জিজ্ঞেস করে - মিলিদি, তুমি সেদিন আমার সামনে নেংটা হয়েছিলে কেন? কি জবাব দেবে মিলি? ছি! ছি! লজ্জায়-ঘৃণায় যে মিলি মাটিতে মিশে যেতে চাইছে। - হে শ্রীকৃষ্ণ, তুমি তো দ্রৌপদীব লজ্জা নিবারণ করেছ। আজ ঠাকুর আমার লজ্জা নিবারণ কর। তিয়াষ নিশ্চয়ই ভাবছে - মিলিদি একটা লজ্জাহীন মেয়ে। এই বয়সের মেয়েরা এমন লজ্জাহীন হতে পারে - তা ভাবতেই কেমন শিউরে উঠছে মিলি।

তিয়াষ এবার মিলিকে ডাকে - মিলিদি, ও মিলিদি। এদিকে এসো। আজ ক'দিন স্কুলে যাচ্ছ না কেন?

মিলির মা এবার বলে - মেয়েটির গত পরশু থেকে কি যে হয়েছে? কাউকে কিছু বলছে না। ঘরের কোণে চুপচাপ বসে থাকে। ডাকলেও সাড়া দেয় না। ডাক্তারের কাছে যেতে বললেও যায় না। তোর স্যার কাল খুব বকাবকি করেছে। তবু সাড়া দেয়নি। আমিও কত বুঝিয়েছি, তবু শোনে না।

তিয়াষ বলে - দ্যাখো তো জেঠিমা, মিলিদি কোথায়? - মিলির মা ঘরে গিয়ে দেখে মিলি নেই -। তারপর ডাকে - মিলি - ও মিলি - তুই কোথায় রে?

দু'টি পালক

মিলি অনেকক্ষণ পর রান্না ঘর থেকে উত্তর দেয় - আমি এখানে। এত ডাকছ কেন?

মিলির মা এবার বলে - বলছি না, তিয়াষ এসেছে। তোকে ডাকছে। আগে তিয়াষের জন্য এমন করতিস্? আজ আবার কি হলো? মেয়ের ঢং দেখে বাঁচি না বাপু -। আয় এদিকে।

মিলি ও তিয়াষ দু'জনেই জানে কি ঘটেছে। কিন্তু এ কথা তো কিছুতেই বলা যায় না। মিলি রান্নাঘর থেকে এসে তার পড়ার ঘরে মাথা নীচু করে বসে। তিয়াষ মিলির সেই ঘরে ঢুকে। মিলির মা সন্ধ্যাপূজা দেবার জন্য ঠাকুর ঘবে চলে যায়। শৈলেন বাবু ঘরে নেই। কোথাও গেছেন হয়তো।

তিয়াষ মিলির একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। বলে - মিলিদি। এ ক'দিন স্কুলে যাও নি কেন? স্কুলে না গিয়ে ঠিক করনি।

মিলি কোন কথা বলতে পারে না। তিয়াষের দিকে চোখও তুলতে পারে না। বুকটা অস্বাভাবিক টিপ্‌টিপ্ করতে থাকে।

তিয়াষ আবার বলে - আমাব দিকে তাকাও মিলিদি। তুমি অমন লজ্জা পাচ্ছ কেন? আমি কিচ্ছু ভাবিনি মিলিদি। আমি কাউকে কিছু বলব না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

মিলি আজো আবার এক দুবন্ত আবেগে তিয়াষের দুটি হাত ধরে তার বুকের উপর টেনে নেয়। হাত দুটি ধরে অনেকক্ষণ চোখ বুঝে থাকে। একসময় ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে মিলিদি। তিয়াষ আজ আব তার হাত সরানোর কোন চেষ্টাই করেনি। কিছুক্ষণ পর মিলি তিয়াষের হাত ছেড়ে দিয়ে তার অশ্রুভরা ম্লান চোখ তুলে তিয়াষের দিকে তাকায়। তাবপর আস্তে আস্তে বলে - তিয়াষ, আমি খুব খারাপ মেয়ে তাই নারে? - আমার উপর সেদিন সত্যই কোন ভূত ভর করেছিল রে! না হলে আমি সমস্ত লজ্জা-শরম ত্যাগ করে এমন বেলাজের মতো আচরণ কি করে করতে পাবলাম বল্‌তো। আমার ভাবতেও এখন সমস্ত গা শিরশির করছে। মরমে আমি পুরো মরে যাচ্ছি রে। তুই তো সারাজীবন আমায় খারাপ ভাববি। তাই না? তোকে মুখ দেখাবো কেমন করে বলতো। আমি তো সারা জীবনের জন্য তোর কাছে ছোট হয়ে গেলাম রে তিয়াষ? তুই আমার কত ছোট। সব জেনেও কেমন জানি হয়ে গিয়েছিলুম। আমার একটা শিক্ষার দরকার ছিল রে তিয়াষ। জীবনে আমার একটা বড় শিক্ষা হলো। তিয়াষ - মিলিদি, তোমাকে আমি একটা প্রণাম করবো।

বলেই মিলিকে প্রণাম করে তিয়াষ। মুহূর্তেই মিলির দেহে মনে আশ্চর্য ভাবান্তর ঘটে। যৌবনের দুরন্ত আবেগে তার মধ্যে যে কামনা-বাসনার উদগ্র ক্ষুধা জাগ্রত হয়েছিল,

নিমেষেই তা সুললিত স্নেহ সুধা ধারায় রূপান্তর ঘটিয়ে দু'জনকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। গভীর আবেগে তিয়াষকে বুকে জড়িয়ে ধরে মিলি। তারপর বলে - তিয়াষ আজ থেকে আমি তোর সত্যিকারের দিদিরে। তুই চির জনমের জন্য আমার ভাই।

মিলি এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তার মনের সব গ্লানি মুছে গেছে।

তিয়াষ - মিলিদি, তোমায় প্রণাম করলাম কেন বলতো।

মিলি - আমি তোর দিদি। তোর গুরুজন। তাই প্রণাম করলি।

তিয়াষ - তোমায় প্রণাম করলাম - তুমি দেবী - মহাদেবী বলে।

মিলি - কি, যা তা বলছিস্? আমি আমার কৃত অপরাধ ঢাকবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না - বলতে ইচ্ছে করছে -। হে ধরণী দ্বিধা হও' - আমাকে তোমার বুকে আশ্রয় দাও । আর তুই কিনা বলছিল - দেবী-মহাদেবী। তোর কথা শুনে যে আমার হাসি পাচ্ছে।

তিয়াষ - মিলিদি। তুমি আমায় দেব শিল্পীর আঁকা অপূর্ব শিল্প সুষমাময় ভাস্কর্য-মূর্তি দর্শন করার দেবদুর্লভ সুযোগ দান করেছে। সেজন্যই দেবী। ক'জন মানুষের জীবনে নারীর এমন সুন্দর রমনীয় রূপ দেখার সৌভাগ্য ঘটে - বলতে পার? তুমি আমার বড় হয়েও নিঃসঙ্কোচে আমার সামনে তোমার নগ্ন ঐশ্বর্যের বৈভব প্রদর্শন করেছ। এ জন্য তোমাকে আমি প্রণাম করেছি। ভারতীয় পুরাণে একমাত্র মা কালিকাই তাঁর অনন্য নগ্নরূপ প্রদর্শন করেছেন - আর কেউ পারেনি। তাই তোমাকে দেবী বলেছি, তাই তোমাকে প্রণাম করেছি।

মিলি - তুই এই বয়সে এত পড়াশুনো করিস? এত কথা কি করে জানলি? তারপর তিয়াষকে আদর করে দিয়ে বলে - আমি জন্ম-জন্মান্তরে তোর দিদি হয়ে থাকতে চাই। তোর কথায় আমার মনের সব কালিমা আজ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। তুই মহান। তাই আমার দুর্বলতাকে তুই মহতীরূপ দান করে আমার জীবনকেও সার্থক করে দিয়েছিস। আমার কাঙ্গালীপনাকে তুই মহতী শিল্পীর রূপ দিয়ে ধন্য করেছিস্। আমি ভালো না। তোর মত স্নিগ্ধ চন্দন তরুর স্পর্শে আমি নিজেও আজ সুরভিত। এ যে আমার এক মহতী প্রাপ্তি। আমাদের দেশের নারীদের সব চিন্তা-চেতনা-রূপ-যৌবন-দেহমন আবেগ-আহ্লাদ-বিরহ-ভালোবাসা মান-অভিমান জাগতিক প্রেম-প্রণয়-ভালোবাসা জড়িয়েই যে পল্লবিত হয়। আমরা যে অতি সাধারণ। এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে আমরা যে বড় কিছু কোন দিন ভাবতে পারিনা। এ আমাদের আত্মার দৈন্য - শিক্ষার দৈন্য।

ঠাকুর ঘর থেকে জেঠিমার সন্ধ্যা আরতির ঘন্টা বেজে চলেছে। পূজা সাঙ্গ হবার ইশারা -। পূজা শেষের কাঁসর বাজছে। পূজা শেষে জেঠিমা তিয়াষের জন্য পূজার প্রসাদ,

মুড়ির মোয়া ও নারকেলের নাড়ু নিয়ে আসে। এরপর জেঠিমা তিয়াষকে বলে - কিরে তিয়াষ, তোর মাকে আসতে বলতে পারিস না। সে কবে এসেছিল। আর তো এলই না।

তিয়াষ - তোমরা যেন আমাদের বাড়িতে হপ্তায় হপ্তায় যাও।

জেঠিমা - শোন ছেলের কথা! আমি যেতে পারি না বলে, তোরা আসবি না?

তিয়াষ - আমি তো আসি জেঠিমা। বরং তোমরা একেবারেই যাও না। বাবার বদলীর পর আমাদের কি অবস্থা বল তো। বাবা সোনামুড়া, মায়ের চাকরী, আমার স্কুল - পড়াশুনো - মাষ্টারবাড়ি। সময় তো আমাদেরও নেই জেঠিমা। তবু এরই মধ্যে সময় করে নিতে হয়। আসা-যাওয়া না থাকলে যে সম্পর্ক থাকে না জেঠিমা।

জেঠিমা হাসতে হাসতে বলে - তিয়াষরে, আমি তোর জেঠিমা নই, তুই আমার জ্যাঠামশাইবে। এমন বড় বড় কথা বলিস বাপু। তোদের আজকালকার ছেলেদের সত্যিই বুঝে ওঠা দায়।

চপল ঝর্ণা যখন মোহনার নদী, তখন স্থির, অচঞ্চল, গভীর গোপন। মিলির জীবনে ঘটে গেছে এক আশ্চর্য পরিবর্তন। মিলি এখন আর চপল ঝর্ণা নয়, মোহনার নদী। মননে ও অস্তিত্বে দেখা দেয় গভীর ভাবান্তর। চলনে-বলনে প্রকাশিত হতে থাকে প্রশান্তির ভাব। ক্রমশঃ দেহের মধ্যেও বিকশিত হতে থাকে মননের সৌন্দর্য। পড়াশুনোয় আগ্রহ বেড়ে যায়। ছেড়ে দেওয়া নাচে আবার তালিম নিতে থাকে। মিলি আগের থেকেও আরো সুন্দরী হয়ে ওঠে।



এই প্রথম তিয়াষের পরীক্ষার ফল প্রত্যাশামত হয়নি। দু'একটি বিষয়ে সোহম ও পলাশ তিয়াষের চেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে। তিয়াষ সবচেয়ে খারাপ করেছে অংকে। এবারে অংকে তার নম্বর আশির কোঠায়। বাবা-মা দু'জনেই তিয়াষের উপর খুব বিরক্ত। এর পরই তিয়াষ পড়াশুনোয় আরো বেশী সিরিয়াস হয়ে যায়। আড্ডা, খেলাধূলা, টিভি দেখা - সবই কমিয়ে দেয়। জুঁই কিম্বা মিলিদের বাড়িতেও আজকাল আর তেমন যায় না। সামনেই পুজোর ছুটি। মহালয়ার দু'দিন আগে থেকেই ছুটি শুরু। পড়াশুনায় তিয়াষের

যাতে ক্ষতি না হয়, তাই নন্দিতা ঠিক করেছে পূজার ক'দিন ছাড়া তারা এবার সোনামুড়ায় থাকবে না। এবার মাধুরী হিমাদ্রি ও জুঁইকে নিয়ে পুজোর ক'দিন তপোধীরের আতিথ্য গ্রহণ করবে। ক'দিন হলো নন্দিতা-তিয়াষকে নিয়ে সোনামুড়ায় এসেছে। জুঁইকে নিয়ে তার বাবা-মা ষষ্ঠীর দিন আসবে। নন্দিতা আগে এসে সব আয়োজন পাকা করে রেখেছে। এখানে এলে তারা তেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। সারাদিন কোয়ার্টারে কাটাতে হয়। তাই তাদের ভালো লাগে না। তিয়াষ আসার খবর পেয়ে আব্দুল এসে এর মধ্যেই তার সঙ্গে দেখা করে গেছে। এখানে তিয়াষের বন্ধু বলতে আব্দুলই। আজ বোধন। কাল প্রথম পুজো।

ষষ্ঠীর দিন দুপুরের আগেই মা-বাবা সহ জুঁইরা এসে পড়ে। আজ আবার জুঁইয়ের জন্মদিন। সন্ধ্যায় ঘরোয়া ভাবে তপোধীরের কোয়ার্টারে জুঁইয়ের জন্মদিন পালন করা হোল। জুঁই আজই তার জীবনের এক যুগ অর্থাৎ বার বছর পূর্ণ করল। তপোধীর গত বছর পূজার পর এখানে মহকুমা শাসক রূপে কাজে যোগ দেয়। সোনামুড়ায় এবারই তার প্রথম পুজো দেখা। কিছুদিন পর হয়তো আবার কোথাও বদ্‌লী করে দেবে।

অনেকদিন পর তিয়াষ ও জুঁই কাছাকাছি। সপ্তমীর দিন সকাল বেলা নতুন কাপড়-চোপড় পরে তিয়াষ জুঁইকে পুজো দেখাতে বেরিয়ে যায়। কোয়ার্টারেব পাশেই নীচের মাঠে বারোয়ারী পূজা। সকাল থেকেই ঢাকের শব্দ কানে আসছিল। পুজোমণ্ডপে আব্দুলও তার বোন রহিমাকে নিয়ে পুজো দেখতে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বহিমার সঙ্গে জুঁইয়ের ভাব হয়ে যায়। তিয়াষ আব্দুল আর রহিমাকে দুপুরে তাদের বাসায় খাবারের আমন্ত্রণ জানায়। আরও কয়েকটি আশপাশের পুজো দেখে তারা ঘরে ফিরে আসে। নন্দিতা ও মাধুরী রান্নায় ব্যস্ত। রান্নার মাসী সব যোগাড় করে দিচ্ছে। তপোধীর ও হিমাদ্রি দাবা নিয়ে বসেছে। তাদের জন্য মাঝে মধ্যেই চা আসছে। এর মধ্যে মালাকাব সাহেবও আসেন। তিনি আবার মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক। তপোধীর মালাকার সাহেবকেও দুপুরে খেয়ে যেতে বলেন। লতিফ সাহেবকে টেলিফোনে জানিয়ে দেওয়া হয় যে আব্দুল ও রহিমা দুপুরে এখানেই খাবে। - দাবা খেলা ছেড়ে দিয়ে তারা আড্ডা জুড়েছে। - সেই আড্ডায় শ্রীমন্ত পুর থেকে শুরু করে ওয়াশিংটন পর্যন্ত আলোচনা চলে।

এদিকে জুঁই আর রহিমা কোয়ার্টারের সামনে আমগাছের ছায়ায় এক্কা-দোক্কা খেলছে। তিয়াষ ও আব্দুল ক্যারামবোর্ড। দুপুরে জম-জমাট খাবার ব্যবস্থা। সোনামুড়ার বিখ্যাত কাটারী মাছের পাতুড়ী, চিংড়ি মাছের মালাইকারী, বেগুনি, কঁচি পাঠার মাংসের কসা, মিক্সডাল, পাপড়, চাট্‌নী। শেষ পাতে মেলাঘরের সুমিষ্ট দই-মিষ্টি। রীতিমতো ভূরি ভোজে সকলেই ক্লান্ত। খেতেও একটু দেরী হয়ে গেছে। খাবার পর সকলেই বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করে। সকলেই একটু বেশী বেশীই খেয়ে ফেলে। নন্দিতা-মাধুরীর রান্নার যুগলবন্দী -

রান্নার স্বাদ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। খাবার পর মালাকার সাহেব তাঁর নিজের কোয়ার্টারে চলে গেলেন। আব্দুল ও রহিমাও বাড়ি চলে যায়। তারপর পাখা চালিয়ে অবেলায় চলে সকলেরই একটা লম্বা ঘুম।

তিয়াষ একটুখানি ঘুমিয়েই উঠে যায়। কোয়ার্টারের পেছনে একটা বিশাল মেহগনি গাছ রয়েছে। আশে-পাশে কয়েকটা ফলের গাছ। পেয়ারা, সবেদা, পেপে, আতা, ডালিম - এমনকি কয়েকটি ফুলের গাছ। তিয়াষ ভাবনায় মগ্ন হয়ে প্রকৃতির শোভা অবলোকন করতে থাকে। তিয়াষের পায়ের শব্দে জুঁই ও জেগে ওঠে। সে বেরিয়ে এসে চারদিকে তিয়াষের সন্ধান করতে গিয়ে পেছনের বাগানে আত্মমগ্ন তিয়াষকে দেখতে পায়। মিলিদির ঘটনায় তিয়াষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বার খুলে যায়। তিয়াষ এখন অনেক পরিণত, সংযত। শিকারী চিতার মত সন্তর্পণে জুঁই তিয়াষের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে।

শরতের স্বর্ণাভ গোধুলি। মণ্ডপে মণ্ডপে পূজার ঢাক-ঢোল-কাঁসর-ঘন্টা বাজছে। আজ সন্ধ্যায় সোনামুড়া টাউন ক্লাবের পুজোয় আরতি প্রতিযোগিতা। অষ্টমীর দিন ঢাকী-প্রতিযোগিতা। নবমীর দিন সন্ধ্যায় যাত্রাগান। দশমী দিন দুপুরে কুস্তি খেলা। ওই দিকে মেলাঘরে তিনদিন ব্যাপী কবিগানের জমজমাট আসর বসেছে। বাংলাদেশ থেকে দুই প্রসিদ্ধ কবিয়াল এসেছে। প্রতিবছরই পুজোর সময় মেলাঘর দুর্গোৎসব কমিটি কবিগানের আসর বসায়। সব ক্লাবই তপোধীরকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিয়াষ শুনেছে তার ঠাকুর্দাও নাকি বয়সকালে নামজাদা কবিযাল ছিলেন। তিয়াষের ঠাকুর্দার স্মৃতি খুব একটা স্পষ্ট নয়। ঠাকুর্দা যখন মারা যায় তখন তিয়াষের বয়স ছিল আট বছর। তপোধীর জন্ম সূত্রেই কবি প্রতিভার অধিকারী। গল্প, কবিতা, গান, ছড়া, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস - সাহিত্যের সব শাখাতেই তপোধীরের অধিকার। তিয়াষ আপনমনে এসবই ভাবছিল। এমন সময় জুঁই পেছন থেকে তিয়াষের চোখ টিপে ধরে।

তিয়াষ জানে জুঁই তার চোখ চেপে ধরে আছে। তবু না চেনার ভান্ করে বলে - কে? কে? - ছেড়ে দাও বলছি। - জুঁই তবু চোখ ছাড়ে না, কথাও বলেনা। তিয়াষ তার দুই হাত পেছনে দিয়ে জুঁইকে ধরতে চায়, জুঁই সরে সরে যায়, ধরতে পারে না। পরে নিজেই চোখ ছেড়ে দিয়ে তিয়াষের গলা জড়িয়ে ধরে। তারপর বলে - আমি যে তোমার চোখ ধরেছি, তুমি বুঝি সেটা বুঝতে পারনি? তুমি আমার সঙ্গে ঢং করলে না, আমার মেজাজ গরম হয়ে যায়।

তিয়াষ - ফ্রীজের জল ঢেলে মাথা ঠাণ্ডা করলেই হয়। কে বারণ করছে?

জুঁই - তোমার এই তেরছা কথা আমার ভালো লাগে না।

তিয়াষ - ঠিক আছে চল, সামনের বাগানে ঘাসের উপর বসব।

দু'টি পালক

জুঁই তিয়াষের গলা ছেলে দেয়। তারপর ঘাসের উপর বসে। সন্ধ্যা তখন হয় হয়। তিয়াষ তখন জুঁইয়ের মাথাটা কোলের উপর রেখে এক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। জুঁইও কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে একসময় আস্তে আস্তে চোখ নামিয়ে নেয়। তারপর বলে - তুমি ভারী অসভ্য! মেয়েদের মুখের দিকে অমন করে তাকিয়ে থাকে?

তিয়াষ - যত দোষ, নন্দ ঘোষ। মেয়েরা চোখ টিপে ধরলে, গলা জড়িয়ে ধরলে, পুরুষের বুকের মধ্যে মাথা রাখলে - সেটা দোষের নয়?

জুঁই - তুমি অমন করে চেয়ে থাক বলেই তোমার চোখ টিপে ধরেছি।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে জুঁই ফের বলে - আমার মুখের দিকে অমন করে তাকিয়ে তাকিয়ে তুমি কি দেখ বলতো।

তিয়াষ - তোকে দেখি। তোকে অমন ভাবে দেখতে সত্যিই ভালো লাগে। তুই সত্যিই সুন্দর রে জুঁই।

জুঁই - তুমি কি আজই প্রথম বুঝলে? এর আগে তুমি বুঝি আমায় আর কোনদিন দ্যাখনি? ঢং। শুধু শুধু আহ্লাদী। তোমার ওই আহ্লাদী কথা শুনলে না পিত্তি জ্বলে যায়। - বলেই জুঁই তিয়াষের কোল থেকে মাথা তুলে দু'জনই পাশাপাশি বসে। অনেকদিন পর তাদের জীবনে এসেছে এক নিভৃতির অবকাশ মুহূর্ত। দু'জনেই স্মৃতি বেদনায় মেদুর। হঠাৎ দু'জনেরই কথা ফুরিয়ে যায়। অন্ধাকার ঘনিয়ে আসার আগেই সপ্তমীর চাঁদের আলো ধরণীকে জড়িয়ে ধরেছে। নীরবতা ভঙ্গ করে জুঁই আপন মনে গেয়ে ওঠে,

'তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণে

ও মোর ভালোবাসার ধন।' জুঁইয়ের আবেশ জড়ানো মিষ্টি সুরের ঝংকার লেগে সকলেরই নিদ টুটে যায়। গান শেষ হবার পরও তারা কোন কথা বলে না।

তারপর জুঁই একসময় অভিমানী গলায় বলে - গত তিনমাসের মধ্যে একবারও আমার খোঁজ করবার দরকার মনে করনি। তুমি আসলে খুবই স্বার্থপর তিয়াষ দা। তিয়াষ এবার খোঁচা দিয়ে জুঁইকে বলে - রাগলে না, তোকে বেশ সুন্দর দেখায়। ঠিক লক্ষ্মী পেঁচার মত। কি বললে -? আমাকে পেঁচার মতো লাগছে? তোমাকে তো দেখতে ছুঁচোর মত। - জুঁই

তিয়াষ - তোর মুখটা আসলে তাল বেগুনের মত। যেন বাংলার পাঁচ।

এবার সত্যি সত্যি রেগে গিয়ে উঠে যায় জুঁই। তারপর মুখ গুঁজে বিছানায় শুয়ে কাঁদতে থাকে। - নন্দিতা ও মাধুরী বিছানায় শুয়ে শুয়েই নানা সুখ-দুঃখের কথা বলাবলি করছিল। -জুঁইয়ের কান্না শুনেই তারা বুঝতে পারে যে দু'জনে এক পালা ঝগড়া হয়েছে।

দু'টি পালক

-নন্দিতা পাশ ফিরে শুয়ে জুঁইকে বুকে টেনে নিয়ে বলে - কি হয়েছে রে মেয়ে? কাঁদছিস্ কেন? এতক্ষণ ছিলি কোথায়? দু'জনে আবার ঝগড়া করেছিস্ বুঝি?

জুঁই কোন উত্তর না দিয়ে কাঁদতে থাকে। এবার মাধুরী নন্দিতাকে বলে - চল তবে আমরাও কাঁদতে থাকি। - বলেই দু'জনেই নাকি কান্না জুড়ে দেয়।

মা ও মিষ্টি মাসীর নাকি কান্না শুনে জুঁইয়ের কান্না বন্ধ হয়ে যায়। তারপর রাগের সঙ্গে বলে - মিষ্টিমাসী, তোমার ছেলে - যা একটা হচ্ছে না? দিন দিন একটা ছুঁচোর মত হয়ে উঠছে।

নন্দিতা গাম্ভীর্যের ভাণ করে বলে - কি করেছে আমার ছেলে?

জুঁই - আমাকে কি বলেছে, জিগ্যেস কর না।

নন্দিতা - খারাপ কিছু বললে তো, আমি জিজ্ঞেস করলেও বলবে না। তুইই বল না কি বলেছে।

জুঁই - তোমার ছেলে একবার আমায় বলেছে - আমি নাকি দেখতে লক্ষ্মী পেঁচার মত, আর একবার বলেছে আমার মুখটা নাকি তাল বেগুনের মত, আবার বলেছে.- বাংলার পাঁচ। -আমি আর তোমার ছেলের সঙ্গে কোন কথাই বলব না। আড়ি - আড়ি - আড়ি -। এই তিন কাটতি দিলাম।

নন্দিতা - বাবা, আমাদের সঙ্গে রাগ করে কথা বন্ধ করিস না। আমরা কথা না বলে থাকতে পারি না। -বলেই নন্দিতা জুঁইকে আবারও আদর করে দেয়।

ততক্ষণে তিয়াষ ও ঘরে ঢুকে মাধুরীর পাশে গিয়ে বসেছে।

জুঁই - ইস্। কি হচ্ছে আবার দেখতে এসেছে। আমি কিন্তু আড়ি দিয়েছি। কারো সঙ্গেই কথা বলব না।

তিয়াষ মাধুরীর কোলে মাথা রেখে বলে - রাঙ্গা মাসী, আমিও ঠিক করেছি, আমিও আর কারো সঙ্গেই কথা বলব না।

মাধুরী তিয়াষকে আদর করে দেয়। তিয়াষ আদর পেয়ে বলে - এবার থেকে তুমি আমার মা। তোমায় যেন আর কেউ মা না ডাকে।

জুঁই - খুব ভালো হয়েছে। মিষ্টি মাসী। এবার থেকে আমি তোমায় মা ডাকবো। কিন্তু আর কেউ তোমায় মা ডাকতে পারবে না।

নন্দিতা ও মাধুরী দু'জনকেই আদর করে দিয়ে নিজেদের কাজে চলে যায়। জুঁই উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে। তারপর বলে - আমি কথা বলব না বলেছি, তবু বেহায়ার

মতো আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য বসে রয়েছে।

তিয়াষ - আমার কারো সঙ্গে কথা বলতে বয়েই গেছে। গায়ে পড়া মেয়েদের আমার একেবারেই পছন্দ নয়।

জুঁই - কেউ আমার কথার উত্তর দিক, তা আমি চাই না।

তিয়াষ - গায়ে বিছুটি লাগিয়ে ঝগড়া করা মেয়েদের স্বভাব।

জুঁই - মিষ্টি মাসী, শুনছ। তোমার ছেলে বলেছ - মেয়েরা নাকি গায়ে বিছুটি লাগিয়ে শুধু ঝগড়া করে।

তিয়াষ - করেই তো। আমি চললাম। বাগানের চাঁপাফুলের গাছে এ সময় এক জোড়া - লক্ষ্মী পেঁচা এসে বসে। দেখতে ভারী সুন্দর। কারো দেখতে ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে আসতে পারে।

জুঁই - সমস্ত মান-অভিমান ঝগড়া-বিবাদ ভুলে একলাফে তিয়াষের পাশে এসে বলে - তিয়াষ দা, লক্ষ্মী পেঁচা কোথায় গো, আমায় দেখাবে?

তিয়াষ - তখন লক্ষ্মী পেঁচা বলায় মানিনীর খুব মান হয়েছিল। এখন সত্যিকাবেব পেঁচা দেখার এমন আগ্রহ কেন?

বলেই তিয়াষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। পেছন পেছন জুঁই। তিয়াষ ক'দিন ধরেই লক্ষ্য করছে যে প্রতি সন্ধ্যায় স্বল্প পত্র বিশিষ্ট চাঁপা গাছের ডালে একজোড়া সাদা লক্ষ্মী পেঁচা এসে রোজই অনেকক্ষণ বসে থাকে। সন্ধ্যা একটু নিবিড় হয়ে রাত্রি হলে চাঁদের আলোয় উড়ে চলে যায়। সম্ভবতঃ চাঁপা গাছের কোটবে বাসা বেঁধেছে এই পেঁচক দম্পতি।

তিয়াষ বাইরে এসে দেখে সত্যিই চাঁপাব ডালে পেঁচা দুটি বসে আছে। জুঁইকে দেখিয়ে তিয়াষ বলে - দেখছিস্ জুঁই, চাঁদের আলোয লক্ষ্মী পেঁচার মুখটি দেখতে ভারী সুন্দর না?

জুঁই - তিয়াষ দা, ঠিক বলেছ গো। এমন সুন্দর লক্ষ্মী পেঁচা আগে কখনো দেখিনি। দেখতে সত্যিই সুন্দর।

তিয়াষ - তবে তখন রাগ করেছিলে কেন? এখন নিজেই বলছে লক্ষ্মী পেঁচার মুখ সুন্দর। আমি তো সুন্দর বলেই তোকে তখন ও কথাটা বলেছিলাম।

জুঁই - আবার? মিষ্টি মাসীকে ডাকব? আবার যদি আমায় অমন কথা বল, তবে তোমার সঙ্গে সত্যি কারের আড়ি।

এবারের্র কবিগানের আসর তিনদিনের পরিবর্তে দুইদিন করা হয়েছে। কবিয়ালরা

দু'টি পালক

নবমী আর দশমী তিথিতে বিশালগড়ে বায়না নিয়েছেন। তাই আজই সকলেই মেলাঘর কবিগান শুনতে যাবে। মেলাঘর যাবার জন্য সাজগোজ চলছে। জুঁই-তিয়াষের ডাক পড়েছে। গাড়িও প্রস্তুত।

কবিগানের বিরাট জম-জমাট আসর বসেছে। পালা করে একজন কবি আসরে উঠছেন। কবিয়ালের সহকারী হিসাবে একজন পদকর্তাও আছেন। পদকর্তা পদরচনা করে কবিয়ালের কানে কানে বলে দিচ্ছেন। দু'জনই সে সময়ের বাংলা দেশের সেরা কবিয়াল। একজন যামিনীপাল, অন্যজন যশোদা কর্মকার। আসরে তখন অক্রুর সংবাদ পালা চলছে। শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য অক্রুর এসেছেন ব্রজধামে। কংস অক্রুরকে পাঠিয়েছেন কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে যেতে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধাম ছেড়ে মথুরা যাবেন। ব্রজের ঘরে ঘবে হাহাকার উঠেছে। বৃন্দা এসে সে খবর বাধাকে জানিয়েছে। রাধা অশ্রুজলে যমুনার জল স্ফীত করে চলছে। এই প্রসঙ্গে পদকর্তা পদরচনা করে গান ধরলেন,

অশ্রুধারা বহে রাধার কলসে কলস,
নাড়ীটিপে বদ্যি দিলেন চিন্তামণিরস,
বহে কলসে কলস।

কালাজ্বরে যারে ধরে	সারা দেহ বিবশ করে
দিবারাত্রি অশ্রু ঝবে	মন করে বিবশ। - বহে কলসে কলস।
এ যে বড়ো কঠিন ব্যাধি	গৃহ বৈদ্যের নাই যে সাধ্যি
ব্রজধামে আছে বদ্যি	ওষুধ আছে নবরস। - বহে কলসে কলস।
শীঘ্র যাও তাঁহার ধাম	বৃন্দাবনে তার মোকাম
বলো তাঁকে রাধার নাম	দু'জনে দু'জনের বশ।-বহে কলসে কলস।

পরবর্তী কবিয়াল এসে আসরে উঠলেন। তিনি ফুটিয়ে তুললেন শ্রীকৃষ্ণের বিরহ বেদনা। পদকর্তা গান ধরলেন —

কানু বলে সুবল সখা মনের কথা কারে কই,
রাই কিশোরী বিনে আমি মথুরাতে ক্যামনে রই। -মনের কথা কারে কই।

শিখীর পুচ্ছ ধুলায় গড়ায়	নুপুর জোড়া বাজে না পায়
মোহন বাঁশী বেসুরো গায়	দুঃখের বোঝা একলা বই। -মনের কথা ...
স্বপ্নে দেখি আমার রাধায়	জেগে দেখি একা শয্যায়

দু'পাকর

মালতী ফুল গলায় শুকায় বাকী রাত যে জেগে রই। মনের কথা .....
কোকিল কাঁদে পিয়াল শাখে যমুনার জল রাধায় ডাকে
মনের ব্যথা মনেই থাকে বাকী রাত যে জেগে রই -। মনের কথা ...
নিয়ে চল বৃন্দাবনে যাব না আর গোচারণে
মিলন হবে বঁধূর সনে রাধা আমার প্রাণের সই।- মনের কথা ....
বৃন্দাবনের তরুলতা দুঃখ ভাবে অবনতা
শুক সারি কয় না কথা মর্মে মর্মে দগ্ধ হই। .. মনের কথা কারে কই।

দুই কবিয়ালের তরজার লড়াই দারুণ জমে উঠেছে। কবিদের সুললিত পদরচনায় দুই কিশোর কিশোরীর মন প্রবলভাবে আলোড়িত হয়। তাদের মনে দিয়ে যায় অপূর্ব দোলা। তিয়াষের মন রাধার জন্য আকুলি-বিকুলি করে ওঠে। কৃষ্ণের বিরহ বেদনায় জুঁইয়ের মনও ভারাক্রান্ত। গান শুনতে শুনতে একসময় জুঁইয়ের চোখ জলে ভরে ওঠে।

শুক-সারির দ্বন্দ্ব দিয়ে যোটক শেষ করে দুই কবিয়াল। দুই কবিয়ালের একজন শুক ও অপর জন সারী। শুক-সারীর দ্বন্দ্ব আসলে রাধা-কৃষ্ণের বারমাস্যা --

শুক রূপ প্রথম কবি গান ধরলেন -। উত্তর দিচ্ছেন দ্বিতীয় কবিয়াল। জমে উঠেছে শুক-সারীর দ্বন্দ্ব।

শুক - বৈশাখেতে আমার কৃষ্ণ নীল যমুনার জলে,
কেলি করত গোপ বধূদের সঙ্গে নানান ছলে।
সারী - আমার রাধা আলতোভাবে খুলত কালো কেশ,
ভিজিয়ে দিত আমার রাধার রেশমী বরণ কেশ।
শুক - জৈষ্ঠ্যমাসে আমার কৃষ্ণ কদম তরুর মূলে,
আপন মনে বাজায় বেণু কেমন হেলে দুলে।
সারী - আসল কথা আমার রাধায় ডাকত বাঁশীর সুরে,
লুকিয়ে থাকত তোমার শ্যাম একটুখানি দূরে
শুক - আষাঢ় মাসে দুলত গলায় গুঞ্জ ফুলের মালা,
তাই দেখে যে তোমার রাধার করত হৃদয় জ্বালা।
সারী - রাই কিশোরী গুঞ্জ মালায় বাঁধত যে কবরী,
চুরি করে পরত গলায় তোমার ব্রজের হরি।
শুক - শ্রাবণ মাসে শিখীর পাখায় সাজে বাঁকা শ্যাম,
তোমার রাধা আড়াল থেকে চাইতো অবিরাম।

দুষ্টি পালক

সারী - শ্রাবণ ধারায় আমার রাধার সিক্ত রাঙা বসন,
নিলাজ কৃষ্ণ নয়ন দিয়ে করত কেন লেহন?
শুক - ভাদ্র মাসে আকাশ জুড়ে কালো মেঘের সাজ
তোমার রাধা কৃষ্ণ ভেবে পায় কেন গো লাজ?
সারী - আমার রাধা জলকে চলে নীল যমুনার ঘাটে,
তোমার কৃষ্ণ কেন গো তার পথ আটকে রাখে।
শুক - আশ্বিনেতে আমার কৃষ্ণ ধেনু চরায় বনে
'কৃষ্ণ কোথায়'? শুধায় রাধা কেন জনে জনে?
সারী - আমার রাধা বড়োই শান্ত লাজে বড় নরম,
তোমার কৃষ্ণ বড়োই চতুর নাই কেন তার শরম?
শুক - কার্তিক মাসে আমার কৃষ্ণ রাসকেলি করে,
তোমার রাধা ছাড়ে যে ঘর নীলাম্বরী পরে।
সারী - তোমার কৃষ্ণ বাজায় বাঁশী ডাকে 'রাধা' 'রাধা',
দুটি হৃদয় রাসকেলিতে চির জীবন বাঁধা।
শুক - অগ্রাণেতে আমার কৃষ্ণ পিয়াল তরুর মূলে,
বেঁধে ধেনু সখার সনে গাছের শাখায় ঝুলে।
সারী - আমার রাধা সখীর সাথে গাঁথে ফুলের মালা,
তাইতে তোমার বাঁকা শ্যামের মনে বড়ো জ্বালা।
শুক - পৌষ মাসে আমার কৃষ্ণ শিশির ভেজা পায়,
ঘোরে একা ব্রজধামে পীতাম্বর গায়।
সারী - উদাস শ্যামের এ যে আবার একটা নতুন ছল,
রাধার খোঁজে ঘুরে বেড়ায় ঝরে চোখের জল।
শুক - মাঘ মাসে আমার কৃষ্ণ বংশীবটের তলে,
সারা বেলা কাটায় একা স্নান করবার ছলে।
সারী - তোমার কৃষ্ণ বসে থাকে রাধার প্রতীক্ষায়,
রাধা কখন সিনান করতে আসবে যমুনায়।
শুক - ফাগুন মাসে আমার কৃষ্ণ খেলে রঙের হোলি,
শিখীর চূড়ায় থাকে বাঁধা পলাশ ফুলের কলি।
সারী - তোমার কৃষ্ণ রঙ মেখে গায় সাজে যেন সঙ্,
লাজে মরে শ্রীরাধিকা দেখে নানা ঢং।

দু'টি পাখক

শুক - মধু মাসে আমার কৃষ্ণ বাজায় মোহন বাঁশী,
আকাশ হতে চাঁদের সুধা ঝরে রাশি রাশি।
সারী - বাঁশীর সুরে তোমার কৃষ্ণ ডাকে শ্রীরাধিকায়,
সোনার কলস বলে 'কৃষ্ণ' নুপূর বাজে পায়।

কবিয়ালের গানে সন্তুষ্ট হয়ে দর্শককুল খুশী হয়ে পাঁচ টাকা, দশ টাকার নোট ঝুলিয়ে দিয়েছে বুকে। শ্রোতাদের বিপুল প্রশংসার মধ্য দিয়ে গানের আসর সমাপ্ত হয়।

তপোধীরও বসে বসে কবিগান শুনছিল। তাদের গ্রামের রানীগঞ্জ বাজারে প্রতিবছরই কবিগানের আসর বসত। পূজামণ্ডপে, নাটমন্দিরে এই গানেব আসরে বহু লোক সমাগম হতো। স্বভাব কবিদের গান শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে যেত তপোধীর। আজ বাংলার লোক সংস্কৃতির এই অনন্যধারা অবলুপ্তির পথে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবার ফলে জৈব বৈচিত্র্যে যে ধ্বংস সাধন সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি পরিবেশ দুষণের মতো সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ব্যাপক দুষণ হচ্ছে। বিশেষতঃ এই রাজ্যে এক শ্রেণীব কর্তাভজা সংস্কৃতি প্রেমীর অভ্যুদয় ঘটেছে। সত্তরের দশকের পরবর্তী সময়ে লোক সংস্কৃতি গ্রাসী বিজাতীয় রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী সুবিধাবাদী ও সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তিদেব দ্বাবা এই রাজ্যেব সাংস্কৃতিক জগৎ ব্যাপকভাবে কলংকিত ও কলুষিত হয়েছে। ফল স্বরূপ প্রকৃত সুস্থ সংস্কৃতিকে পুরোপুরি নির্জীব করে দিয়ে শাসক শ্রেণীর তল্পিবাহক চাটুকাবের দল এক উত্তেজক হাল্লা সংস্কৃতির জন্ম দিল। এই অপসংস্কৃতি থেকে লোক সংস্কৃতিকে বাঁচাতে হলে শিল্প-সংস্কৃতি জগতে ব্যাপক আলোড়ন ও প্রতিবাদ প্রয়োজন। প্রতিবাদী কণ্ঠ ছাড়া স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচারী দখল থেকে সংস্কৃতিকে রক্ষা করা সম্ভব নয়।

মহকুমা শাসক এসেছেন। পূজা কমিটির উদ্যোক্তা এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এসে পরিচয় করে যাচ্ছেন। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন। নন্দিতা ও মাধুরীকেও যথেষ্ট খাতির যত্ন ও আপ্যায়ন করা হয়েছে। মেলাঘর থানার বড়বাবু রাতে সকলেব জন্য ডিনারের আয়োজন করেছেন। পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে রুদ্র সাগরের পাবে গড়ে উঠেছে অপূর্ব সুন্দর পর্যটক আবাস 'সাগর মহল'। সেখানেই খাবারের আয়োজন। রুদিজলা থেকে সদ্য ধরা তাজা গলদা চিংড়ির মালাইকাড়ি, পাবদা মাছের ঝোল, চিকেন কারী, ফ্রায়েড রাইস।

সুদর্শন বাবু মানুষটি সৎ এবং অমায়িক। থানার বড়বাবু হলেও তাঁর একটা মানবিক মুখ রয়েছে। প্রশাসনিক কাজকর্মের বাইরেও তিনি গরীব দুস্থ মানুষদের নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন। তাঁর আমলে মেলাঘর থানায় অনেক পরিবর্তন সূচিত হয়। বড়বাবু জানতেন যে মহকুমা শাসকের স্ত্রী ও তাঁর বন্ধুপত্নী দু'জনেই ভালো গায়িকা। তিনি আগে-ভাগেই

দু'টি পালক

সাগর মহলে একটা মজলিশের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। ডিনারের পূর্বে সাগর মহলের কনফারেন্স হলে ছোটখাট একটা জলসার মতো হয়ে গেল। গান, আবৃত্তি, জোকস মিলিয়ে আসর বেশ ভালই হয়েছিল। খানা-পিনা শেষ হতে রাত প্রায় বারোটা। কোয়ার্টারে ফিরে এসে লম্বা ঘুম। বেশী রাত করে ঘুমানোর ফলে পরদিন ঘুম থেকেও উঠতে প্রায় বেলা আটটা বেজে গেল।

তিয়াষ ও জুঁই বায়না ধরেছে তারা নীরমহল দেখবে। নবমীর দিন দুপুরে খাওয়ার পব তারা নীরমহল দেখতে যাবে। তপোধীরের অফিসে কিছু জরুরী কাজ আছে। তাই তপোধীব গেল না। শেষ পর্যন্ত হিমাদ্রিরও যাওয়া হয়নি।

তিয়াষ ও জুঁইকে নিয়ে নন্দিতা ও মাধুরী নীরমহল দেখতে গেল। হিমাদ্রি কোয়ার্টারে একা। আগরতলার কাছাকাছি শহর হলেও সোনামুড়ায় পত্রিকা পেতে দেরী হয়। একটু আগে তপোধীর কোয়ার্টারে বেশ কয়টি পত্রিকা পাঠিয়েছে। হিমাদ্রি বসে বসে পত্রিকা পড়ছিল। ঘন্টা খানেক অফিসের কাজ করে তপোধীর ও কোয়ার্টারে ফিরে আসে। পত্রিকা পড়তে পড়তেই তারা নানা প্রসঙ্গে আলোচনা ও কথোপকথনে ডুবে যায়। কাজের মাসী এক ফাঁকে তাদেব চা দিয়ে যায়। নানা কথার ফাঁকে তাদের অতীত রাজনৈতিক জীবনের প্রসঙ্গও এসে পড়ে। সেই সূত্র ধরেই হিমাদ্রি - তপোধীরকে বলে - তপোধীর দা, তোমার পার্টি ছাড়া ঠিক হয়নি। তুমি পার্টিতে থাকলে এতদিনে অনেক উপরে উঠতে পারতে। এখন কিছু ফাঁপা লোক দলেব নেতৃত্বে রয়েছে। এদের না আছে কোন আদর্শ, না আছে কোন প্রজ্ঞা। তপোধীব দা, দলে তোমার মতো লোকেরই সত্যিকারের প্রয়োজন।

তপোধীর - হিমাদ্রি, তুমি তো আমাকে ভালো ভাবেই জান যে আমি সুবিধাবাদী বা সুযোগ সন্ধানী নই। আমি আমার জীবনে কখনো সমস্যা এড়িয়ে যাই নি। দলেব অভ্যন্তরে বা বাইরে আমি সব সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি। শ্যামল চৌধুরীর মতো নেতাদের কোনদিন তা পছন্দ হয়নি। আমাদের সময়ে দলের একটা নৈতিক ভিত্তি ছিল. সবাই একটা আদর্শে বিশ্বাস করত, রাজক্ষমতার কুর্সিটা ছিল স্বপ্ন-কল্পনার বাইরে। এখন শ্রেণী চরিত্র পুরো বদলে গেছে। দলে এখন ত্যাগীর পরিবর্তে ভোগী মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। নীতি-আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান মানুষের দলে কোন ঠাঁই নেই। দলে এখন ঠিকাদার, প্রমোটাব, ধান্ধাবাজ লোকের ভীড়। সকলেরই কামাইয়ের ধান্ধা। তোমাকে সেদিন বললাম না - এক নেতা এসে কিভাবে চিনির লাইসেন্সের দরবার করে গেল। এই মহকুমায় পাচার বাণিজ্যে বহু ধোপ দুরন্ত নেতা -কর্মী সক্রিয় ভাবে জড়িত। আবার দলেরই আর এক নেতা এসে লাইসেন্স দিতে বারণ করে গেল। একটা চিনি কিম্বা কাপড়ের লাইসেন্স যোগাড় করে দিতে পারলে নেতা নেতৃর পকেটে বেশ কয়েক হাজার টাকা যাদুমন্ত্র বলে

ঢুকে যায়। রাজ্য প্রশাসনের এক মার্কামারা নেতা যে কত কাণ্ড করে গেছে তা তোমরা সবই জান। সার্বিক ভাবে এই অধঃপাতিত নেতার আবার দলে ও প্রশাসনে হাতীর দাঁতের মতোই কদর। টিভি তে একটা বিজ্ঞাপন দেখেছ? -একটা চোর একটা পকেটমারকে বলছে - যে চোরেদের একটা আদর্শ আছে। কিন্তু এদের যে সেটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। তুমি তো এখনো এই দলেরই সদস্য। তুমি কিছু মনে করো না।

হিমাদ্রি - তপোধীরদা, তুমি ঠিকই বলেছ। কলেজে পড়াকালীন ছাত্র রাজনীতিতে তুমি তখন প্রথম সারিতে। কলেজের দাবি-দাওয়া নিয়ে তোমরা অনশন করলে। তখনো আমরা স্কুলে। তুমি তখন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আইকন। গল্প - কবিতা লিখছো। পত্রিকায় ছাপছে। পুরষ্কার পাচ্ছো। বর্ক্তৃতা দিচ্ছো, আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছো। আবার নাটকও করছো, কলেজের সব অনুষ্ঠানেরই তুমি সংগঠক। কলেজের স্বারস্বত সম্মেলনের কথা তোমার মনে আছে তপোধীর দা। - কলেজের তখন স্বর্ণযুগ। তোমরা সেই স্বর্ণযুগের আদর্শ মানুষ। তোমাকে ভালোবাসতাম। শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু সেদিন রাজনীতিতে জড়াই নি। পরে যে কিভাবে জড়িয়ে গেলাম নিজেই জানি না। এখন আমার নিজেরও এই রাজনীতির প্রতি ঘৃণা ধরে গেছে। এখনকার নেতা নেতৃদের লাইফ-স্টাইল দেখে ভেবেই কুল করতে পারি না যে, এদের এই ভোগ-পিপাসা চরিতার্থ করার জন্য টাকার যোগান কারা দেয়। দ্যাখলে না এক নেতার মেয়ের বিয়ে নিয়ে কত হই চই হোল। কমিশন বসলো। শেষ পর্যন্ত অশ্বডিম্ব প্রসব হোল। আসলে এ সবই আই-ওয়াশ।

তপোধীর - হিমাদ্রি, দলের নৈতিক ভিত্তির কাঠামোটা পুরো ধ্বসে গেছে। যারা বলতো গণতন্ত্র বুকের বাতাস, তাঁরাই প্রকাশ্যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও চেতনার উপর প্রতিদিন - প্রতিটি মুহূর্তে নির্লজ্জ জঘন্য আক্রমণ হেনে চলেছে। এই সকল মেকী গণতন্ত্র প্রেমীদের হাতে গণতন্ত্রের নাভিশ্বাস উঠছে। এই দ্বি-চারিতার ক্ষমা নেই।

হিমাদ্রি - কাকে সমর্থন করবে তপোধীর দা? বিকল্প কি বল না? মন্দের আবার ভালো কি? সাগরের জল যেখান থেকেই পান কর না কেন, লোনাই লাগবে। তপোধীরদা, ফেরার পথ যে জানা নেই। জগন্নাথের রথ একা টেনে নেবার সাধ্য নেই। রসি ধরে বসে আছি। যখন বলে, তখনই সবার সঙ্গে ছল করে টানতে থাকব। আমি তো জানি যে আমার টানে রথ চলছে না। প্রতিবাদ করে বেরিয়ে আসতে সাহস লাগে, সেই সাহসই যে আমার নেই।

তপোধীর - হিমাদ্রি, তোমার সঙ্গে আমি একমত নই। বালিতে মুখ গুঁজে কিন্তু প্রলয় এড়াতে পারবে না। মনে রেখো কবির সেই বিখ্যাত পংক্তি

দু'টি পালক

'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?'

আমরাই তো একদিন নক্সালদের কটাক্ষ করে বলেছি - জোর করে ডিম ফোটানো যায় না। কিন্তু একথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। ইনকিউবেটরে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ডিম ফোটানো যায়। আজ আধুনিক হ্যাচারীতে তাই চলছে। চে, মাও, লেনিন তো জোর করেই ডিম ফুটিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে বিপ্লবের ফাঁকা বুলি আওড়ালে তো সত্যিকারের বিপ্লব হয় না। মুখে বিপ্লবের কথা, আর সত্যিকারের বিপ্লবীদের হত্যা। এ দুয়ের মধ্যে কি কোন মিল আছে? হুরুয়ার গণ হত্যার কথা তোমার মনে আছে? অস্ত্র সম্বরণ করে গোবিন্দ তেলী সহ সাতজন উপরে হাত তুলে আত্ম সমর্পন করেছিল। আর সে সময় তাদের বুক ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল বিপ্লবের অন্যতম হোতাদের নিযুক্ত গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী বেতনভুক রাষ্ট্রীয় গুণ্ডা বাহিনী। আর এখনকার বিপ্লবী দলগুলো বিপ্লবের নামে ফাটা ডিমে তা দিয়ে চলেছে। কিন্তু মনস্তাপেও ওতে জোড়া লাগবে না। তোমাদের ওই ফ াটা ডিম থেকে কোনদিন যে বাচ্চা বেরুবে না। বরং দুর্গন্ধ বেরুবে।

হিমাদ্রি হঠাৎ লাফিয়ে উঠে গভীর আবেগে তপোধীরকে জড়িয়ে ধরে বলে - তপোধীর দা, সত্যিই তুমি গুরু। তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ। আমি তো এভাবে কোনদিন ভাবিনি। আমরা যে আসলে প্রকৃতই ফাটা ডিমে তা দিয়ে চলেছি।

তপোধীর - রাজ্য জুড়ে উলঙ্গ রাজার খেলা চলছে। অথচ সেই সৎ, সাহসী, নিষ্ঠাবান শিশুটিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। যে রাজার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে - রাজা তোর কাপড় কোথায়? মানুষকে মিথ্যা স্তোক দিয়ে কতদিন ঘুম পাড়িয়ে রাখবে হিমাদ্রি। ঘুম পাড়ানি গুলি খেয়ে হিংস্র বাঘিনী ক্ষণকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙ্লে সে তার আপন শক্তিতে আবারও গর্জন করে ওঠে। মানুষ জাগছে। আধুনিক শিক্ষার রোশনাই মানুষের চোখ খুলে দিয়েছে। একদিকে আলোর সাধনা, আর অন্যদিকে তমসার আরাধনা। মেলে না হিমাদ্রি মেলে না। কিন্তু মনে রেখো - ঝড়ো হাওয়া আর ভাঙা দরজাটা - মেলাবেন - তিনি মেলাবেন। কংসের কারাগারে চিরকালই কংস হন্তারক জন্মায়। এ যে শাশ্বত প্রতীক। ধর্ম বললে ধর্ম, শাস্ত্র বললে শাস্ত্র। ইতিহাস বললে ইতিহাস, বিজ্ঞান বললে বিজ্ঞান - এর কিন্তু কোন ব্যত্যয় ঘটে না। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে - দু'জনই সমান অপরাধী। বিশ্বের কোন অত্যাচারী শাসকই বাঁচতে পারেনি। হিটলার আর স্ট্যালিন ফারাক কোথায়? আমার কাছে দু'জনেই মানব সভ্যতার চরমতম শত্রু। একজন সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্ট, অন্যজন ফ্যাসীবাদী কমিউনিষ্ট। কি আশ্চর্য সমাপতন। একজনকে বিষপানে আত্মহত্যা করতে হয়। অন্যজন দেহরক্ষী পরিবৃত হয়েও সিংহাসনেই আসীন অবস্থায় খুন হন। একজন গেস্টাপো বাহিনীর সর্দার, অন্যজন রেড আর্মির। একজন লক্ষ লক্ষ ইহুদীদের গ্যাস চেম্বারে

পুরে নির্বিচারে হত্যা করেছে, অন্যজন সমগ্র রাশিয়া জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরে গণকবর দিয়েছে। মানুষকে কয়েদ করে সারা দেশকে কারাগারে পরিণত করেছে। লৌহ যবনিকার আড়ালে মানুষের গণতন্ত্র হরণ করে প্রায় ত্রিশ বছর মানুষ নির্যাতন করে বিকৃত লালসা চরিতার্থ করেছে। বিশ্ব ব্যবস্থায় এরাই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের জনক। এরাই শ্বেত সন্ত্রাসের নায়ক। স্ট্যালিনের কু-কীর্তির ফিরিস্তি মাঝে মাঝেই পত্র-পত্রিকায় বের হচ্ছে। সত্য স্বয়মপ্রভ। তাই লুক্কায়িত সব ঘটনাই আজ প্রকাশ পাচ্ছে। আর সেই সত্যের ভয়াবয়তা জেনে বিশ্ববাসী আতংকিত। সন্ত্রাসের জঠর থেকে যে আদর্শের জন্ম তা কোন মানবধর্ম হতে পারে না। নাগাসাকি, হিরোশিমায় বর্বর নায়কদেরও কিন্তু এ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। হিটলার-স্ট্যালিনের সার্থক উত্তরসূরী - চেসেস্কু, পলপট, এদের সকলের ঠাঁই যে আস্তাকুঁড়ে।

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। দিনের আলোও আস্তে আস্তে কমে এসেছে। বাইরে পাখিদের কল-কাকলি। অসংখ্য পাখি মহা কোলাহল জুড়ে দিয়েছে। ঘরের মধ্যে হঠাৎ কয়েকটি উই পোকা ঢুকে পড়েছে। কাজের মাসীকে ডেকে তপোধীর জানালা গুলো বন্ধ করে দিতে বলে।

উইপোকা খাওয়ার জন্য বাইরে পাখির দল জুটেছে। কাক, শালিখ, শ্যামা, বুলবুল, ফিঙ্গে।

তপোধীর হিমাদ্রিকে বলে - চলো হিমাদ্রি বাইরে যাই। পাখিদের জলসা দেখে আসি। জান শ্যামা পাখিদের পোকা ধরা দেখতে ভারী মজা। কালো কালো পাখিগুলি বিদ্যুতের তারে বসে দোল খায়। তারপর সাঁ করে উড়ে গিয়ে পোকাটাকে মুখে পুরে পাক খেয়ে আবার তারে এসে বসে আর টুপ করে পোকাটা গিলে খায়।

তারা দু'জন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই অতি তুচ্ছ ঘটনাকে দৃষ্টি বন্দী করে।

তারপর তপোধীর বলে - হিমাদ্রি, বিশ্ব প্রকৃতি এমন কিছু সৃষ্টি করেনি, যার কোন প্রয়োজন নেই। প্রকৃতির প্রয়োজন হয়তো আমরা বুঝতে পারিনা। মানুষ তার আপন লোভ-লালসা চরিতার্থ করতে গিয়ে প্রকৃতিকে বদলাতে চাইছে। এই বদলের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা সভ্যতাকে তিলে তিলে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছি। প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার লুট করে আমরা বিশ্ব প্রকৃতিকে নিঃস্ব করে দিচ্ছি। আর এই মহা পৃথিবীর সম্পদের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে আজ বিশ্বায়নের ঢেউ উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী দাদাগিরি মানববিশ্বকে গ্রাস করতে চাইছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানে এক মেরু বিশ্ব ব্যবস্থা নতুন করে বিপদ ডেকে আনছে। ঈশান কোণে দেখা দিচ্ছে অশনি সংকেত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। আমাদের বাঁচতে হবে হিমাদ্রি। জুঁই আর তিয়াষের জন্য আমাদের

বাঁচতে হবে। বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ জুঁই তিয়াষ তাদের স্বপ্ন, প্রত্যাশা আর ভালোবাসা নিয়ে বড় হচ্ছে। তাদের স্বপ্ন সার্থক করার দায়িত্ব যে আমাদেরও। ওরা যেন কোন মহাজাগতিক কৃষ্ণ গহ্বরে হারিয়ে না যায় তার জন্য আমাদের নতুন করে সংগ্রাম করতে হবে। যে অস্ত্র, যে আদর্শ অতি ব্যবহারে জীর্ণ, ভোঁতা হয়ে গেছে তা আগামী প্রজন্মের দেখার জন্য মিউজিয়ামে রেখে দিতে হবে। আমাদের নতুন বিশ্ব গড়ার শপথ নিতে হবে। সন্ধান করতে হবে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শাণিত অস্ত্র, যার লক্ষ্যভেদ ক্ষমতা হবে অব্যর্থ এবং সেই পথেই বিশ্বলোকে ফিরে আসবে প্রকৃত শান্তি। আমাদের হাতে কিন্তু সময় বড় বেশী নেই।

হিমাদ্রি - তপোধীর দা, তোমার কথাগুলো সত্য। কিন্তু কোথায় যাব বলতো? একদিকে সুনামীর ধাক্কায় বেলাভূমি বিধ্বস্ত, অন্যদিকে দাবানল - সবকিছুই গ্রাস করে চলেছে। আমরা পাহাড় চূড়ায়। পথ কোথায় বল তো।

তপোধীর - মানুষের জীবনে হতাশার কোন ঠাঁই নেই। 'আনন্দদৈব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' - আনন্দরূপ অমৃত হইতে নিখিল বিশ্ব জন্মলাভ করিয়াছে। - সারা জগতেই আনন্দধারা বইছে। একটা কথা মনে রেখো হিমাদ্রি, আনন্দ একা উপভোগ করা যায় না। আনন্দ উপভোগে চিরকাল অন্যের সঙ্গে শেয়ার করবে। না হলে আনন্দ পাবে না। সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন করবে, আবার হতাশায় ডুবে থাকবে, তা কখনোই হতে পারে না। বিপ্লবীরা চির রোমান্টিক। তাদের মনে রাখতে হয় এই শাশ্বতবাণী "পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী"। তাদের চিরকাল মনে রাখতে হবে যে, জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন। হিমাদ্রি বড়ো নস্টালজিক হয়ে উঠলুম, কিছু মনে করোনা।

তপোধীর দা, আমার বড়ো দুঃখ যে ওরা তোমায় চিনলো না - বলে হিমাদ্রি।

তপোধীর ওরা না চিনুক, না জানুক - তুমি তো আমায় জানলে। এ জন্য আমার কোন ক্ষোভ নেই। জীবনে তো সব পূজা কখনোই সাঙ্গ হয় না। তবে একথা মনে রেখো - পূজাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

একটু থেমে তপোধীর আবার বলে - কি বলছিলে না? - আমরা পাহাড় চূড়ায়। মহাপ্রলয়ের সেই কাহিনী পড়িস নি?

হিমাদ্রি - মার্কণ্ডেয় পুরাণের সেই কাহিনীর কথা বলছ?

তপোধীর - ঠিক ধরেছিস্। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কমণ্ডলুতে যে ক্ষুদ্র মৎস্য শিশুকে এনে ধীরে ধীরে ছোট থেকে বড় জলাশয়ে রেখে লালন করে শেষে মহাসমুদ্রে ছেড়ে দিয়েছিলেন, প্রলয়কালে সেই অবতার রূপী মৎস্যই একটি নৌকাতে সপ্ত ঋষি এবং জীবনের সব বীজ রক্ষা করতে সাহায্য করেছিলেন। পুরো প্রলয়কাল জুড়ে অনন্ত জলরাশির মধ্যে সেই

বিশাল মৎস্য আপন শৃঙ্গের সঙ্গে রজ্জুর সাহায্যে নৌকাকে বেঁধে ভেসে বেড়িয়েছেন। প্রলয়কালের অবসানে হিমালয়ের শৃঙ্গে নৌকা বাঁধার পর সেই মহা মৎস্য অতল জলে ডুব দিলেন। হিমালয়ের সেই শৃঙ্গে যে আজো 'নৌ-বন্ধন' নামে খ্যাত। কখনো হতাশ হয়োনা, ভয় পেয়োনা। এখন দ্রোহকাল। অন্ধকার চিরস্থায়ী হয় না। কবি সুকান্ত বলেছেন, "রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল"। - আর এই মহাবিশ্বের মহত্তম কবি, আমার জীবনের আরাধ্য ঈশ্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা কখনোই ব্যর্থ হবার নয়। 'রাত্রির তপস্যা সে কী আনিবে না দিন?' - উমার তপস্যা কখনো ব্যর্থ হয়না। মদনভস্মের মধ্য দিয়ে দেবী পার্বতী একদিন শিবের গলায় অবশ্যই বরমাল্য পরিয়ে দেবে। আমরা কি সেই দিনের জন্য প্রতীক্ষা করতে পারব না?

তারপর দুজনই অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। দেয়াল ঘড়িটা কিন্তু টিক্ টিক্ করে সময় সংকেত দিয়েই চলেছে। একসময় তপোধীরই আবার কথা বলে ওঠে - জানো হিমাদ্রি, আমার সমগ্র শৈশবটা নানা বিচিত্র স্মৃতিতে ভরপুর। ফসলের ডাক আজও আমার হৃদয়কে অদ্ভুত ভাবে নাড়া দিয়ে যায়। জান, স্কুল-কলেজে পড়ার সময় ক্ষেতে রোয়া লাগাতাম। বীজতলায় বীজ বুনতাম, ধানক্ষেতের আগাছা বেছে দিতাম, ধান পাকলে কেটে আনতাম, গরু দিয়ে ধান মাড়াতাম। ধান গাছে ধানের শীষ এলে কি যে ভালো লাগত, তোমায় বলে বোঝাতে পারব না। আমাদের পুকুর পাড়ের কাছেই একটা ধান জমি আছে। সেই জমিতে বাবা গোবিন্দ ভোগ ধান লাগাতেন। ধানের মঞ্জরী বের হলে সন্ধ্যায় অপূর্ব সুগন্ধে সারা জমি ম ম করতো। আমি সন্ধ্যাবেলা আলের ধারে দাঁড়িয়ে সেই গন্ধ গায়ে মাখতাম। কী যে একটা অদ্ভুত আনন্দ অনুভূতির হিল্লোল সারা মনকে নাড়া দিত, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। - একবার আমরা তিনভাই বোন মিলে ঠিক করলাম - সারা রাত ধান ক্ষেতের আলে শুয়ে গোবিন্দভোগ ধানের পুষ্প মঞ্জরীর গন্ধ গায়ে মেখে ঘুমিয়ে থাকব। ঠিক হলো জমির পাড়েই বনভোজন করবো, পুকুর থেকে মাছ, ক্ষেত থেকে সবজি, মাকে বলে তেল-নুন মশলা। রান্না বান্না শেষে খাওয়া-দাওয়া সেরে জোছনা রাতে ধানজমির আলে শুয়ে সত্যি সত্যিই আমরা সারা রাত কাটিয়ে দিলাম। দু'চারটে পোকা মাকড়ের কামড় যে খেতে হয়নি তা নয়। সে সব কথা মনে পড়লে এখনও সারা শরীরে এক অদ্ভুত শিহরণ জাগে।

একটু বিরতি দিয়ে তপোধীর আবার বলে - হিমাদ্রি, তোমাদের কাউকে কোনদিন বলিনি, তবে আমার জীবনে একটা খুব বড় দুঃখের ঘটনা আছে। আমাদের বাড়ির কাছেই একটা মেয়ে আমায় খুব ভালোবাসত। ওদের সঙ্গতি ছিল না। খুবই অভাবের সংসার। কিন্তু মেয়েটি বড্ডো ভালো ছিল। তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। শেষে একদিন গলায় দড়ি

দিয়ে আত্মহত্যা করে। তার জন্য মনটা আমার খারাপ হয়ে যায়। তার কথা যে কাউকে বলিনা। তার মৃত্যুটা আমি মেনে নিতে পারিনা।

হিমাদ্রি - 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে'। - কেন মিছিমিছি ফেলে আসা অতীতের কথা বলে কষ্ট পেতে চাইছ।

তাদের কথা আর এগোয়না। হঠাৎই ট্যুরিষ্টরা সবাই ঘরে ফিরে আসে। তাদের দীর্ঘ আলোচনায় বিরতি পড়ে।

হিমাদ্রি মাধুরীর দিকে চেয়ে জিগ্যেস করে - কেমন দেখলে নীরমহল? কেমন লাগলো তোমাদের?

মাধুরী - ভালোই কাটালাম। তোমরা তো যেতে পারতে। তোমরা সারা বিকেল কি করলে? তোমরা গেলে আরো বেশী আমোদ হতো। আমি তো আগেও অনেকবার গিয়েছি। ওই দুটো তো বড্ডো জ্বালিয়েছে আজ। হঠাৎ যে কোথায় গিয়েছিল। ডাকতে ডাকতে গলা শুকিয়ে গেছে। কিন্তু কোন সাড়াই পাচ্ছিলাম না। শেষে দেখি ভূতের মত দু'জনই হন্তদন্ত হয়ে দৌড়তে দৌড়তে আসছে। মেজাজটা একেবারে বিগড়ে দিয়েছে।

ওদের দু'জন সম্পর্কে দু পক্ষই বড়োই সংযত, বড়োই নীরব এবং প্রতিক্রিয়াহীন। তপোধীর ও নন্দিতার ইচ্ছা জুঁই যেন তিয়াষের উপযুক্ত হয়ে বড় হয়। আবার হিমাদ্রি ও মাধুরীর মনোবাসনা - তিয়াষ যেন সর্ব দিক দিয়েই একজন মানুষের মত মানুষ হয়। জুঁই-তিয়াষের লেখা-পড়া, আচার-ব্যবহার, শিষ্টাচার, শ্রদ্ধাবোধ, মনন-মানসিকতা গঠনে তাদের মা-বাবারা খুবই সিরিয়াস।

সেদিন নীরমহল দেখতে গিয়ে জুঁই ও তিয়াষ একসময় হারিয়ে গিয়েছিল। নীরমহলের ভেতরে তারা একের পর এক-নাচমহল, খাসমহল, বেগমমহল, বাঁদী মহল, দরবার কক্ষ, রসুই ঘর দেখেই স্পাইর‍্যাল সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেই টপাটপ ব্রিজ পেরিয়ে ছায়া ঘেরা দেওদার পত্রছায়ার জমিটা পেরিয়ে যেখানে ধাপে ধাপে সিঁড়িটা চলে গেছে জলসীমা অবধি, সেখানে তারা একটি নিভৃত জায়গা পেয়ে যায়। সেখান থেকে সবকিছুই দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে তাদের দেখার কোন উপায় নেই। সেখানে সহজভাবে যাবার কোন উপায়ও নেই। লাফিয়ে নামতে হয়। মাথার উপর দেবদারু গাছের ছায়া, সূর্যের আলো সরাসরি পড়ার উপায় নেই। দু'জন পাশাপাশি বসে। দুজনই কথা বলছিল। প্রায় এক সঙ্গেই। প্রসঙ্গহীন অবান্তর সব কথা। জুঁই তার কোন বান্ধবীর প্রসঙ্গ তুলল তো, তিয়াষ গানের প্রসঙ্গ। তারপর জুঁই হয়তো তিয়াষকে বলল - জানো তিয়াষ দা, একদিন আদর করার ছলে ভবতোষ বাবু আমার গাল টিপে দিয়েছিল। আমার ভীষণ রাগ হয়েছিল। আমি তৎক্ষণাৎ

দু'টি পালক

মাষ্টারমশাইকে বললাম - স্যার, আপনি আমার গাল টিপে দিলেন কেন? আর কক্ষনো এমন করবেন না। আমার ভালো লাগেনি। - জানো, সেই থেকে সেই মাষ্টার মশাই না আমাকে খুব ভয় পায়।

একটুক্ষণ পর তিয়াষ বলে - জুঁই, তুই তো সব সময় আমার কোলে মাথা রাখিস। আজ আমি তোর কোলে মাথা রেখে শুই।

জুঁই কোন দ্বিধা বা সংকোচ না করেই বলে - দাঁড়াও, আমি ঘুরে বসি। এদিকে বসলে রোদের আঁচ পড়বে। - এই আমি ঘুরে বসলাম। এবার তুমি তোমার ইচ্ছা পূরণ করতে পার।

তিয়াষ জুঁইয়ের কোলে মাথা রেখে দুই হাত পেছনে দিয়ে জুঁইয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে। জুঁই তার মুখটা তিয়াষের মুখের উপর আলতো ভাবে রাখে। দু'জনেরই মনে হতে থাকে, তারা যেন কোটি কোটি বছর ধরে এই মহা পৃথিবীতে এমনি একজন অপরের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। যেখানে কোন রাত্রি নেই, দিন নেই, সময় নেই। মা-বাবা-আত্মীয় স্বজন নেই। নদীর ঢেউ, ফুলের সুবাস, পত্র মর্মর, বিহগ কাকলি, ভ্রমর গুঞ্জন - কিছুই নেই। শরতের আসন্ন গোধুলি বেলায় জোনাকীর মত আকাশ থেকে রাশি রাশি পল-অনুপল ঝরে পড়ছে। তারা যেন তুষার মণ্ডিত কোন শৈল সানুদেশে বসে আছে। আর তাদের সারা গায়ে চারদিক থেকে কেবল তুষার ঝরে পড়ছে। আর তুষারের নীচে তাদের দুইজনের দেহ ঢাকা পড়ে গেছে। বাইরে থেকে তাদের আর দেখা যাচ্ছে না। ঘড়ির পেণ্ডুলামের শব্দের মতো বুকের ভেতর নদীর ঢেউ।

হঠাৎ নন্দিতা ও মাধুরীর আর্তচীৎকারে তাদের সম্বিৎ ফিরে আসে। তারপর হুড়মুড়িয়ে উঠেই হন্তদন্ত হয়ে দৌড়াতে থাকে। দৌড়াতে দৌড়াতে তাদের হাঁফ ধরে যায়। ওরা কাছে আসতেই নন্দিতা ও মাধুরী দু'জনে দু'জনেরই কান ধরে টেনে দিয়ে বলে - কোথায় ছিলে এতক্ষণ। ডাকছি যে শুনতে পাচ্ছ না? না বলে গিয়েছিলে কোথায়?

দু'জনে কোন উত্তর দেয় না। তারা বুঝতে পারে যে তাদের বড্ডো বেশী অপরাধ হয়ে গেছে। চুপচাপ সবাই বোটে উঠে যায়। চারদিকে গোধূলির শেষ মুহূর্তের ম্লান আলো নেমে এসেছে। নৈশ প্রহরী এসে গেছে। মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সকলেরই ফেরার তাড়া। সব দর্শনার্থীই চলে গেছে। তাদের জন্য অন্যান্যদেরও দেরী হয়ে গেছে। মহকুমাশাসকের স্ত্রী-পুত্র বলে কেউই কোন কথা বলছে না। তবে ভেতরে ভেতরে সকলেই বেশ ক্ষুব্ধ। সকলেরই মুখ বেশ গম্ভীর। জুঁই ও তিয়াষের দিকে সকলেই কৌতূহলী ও সন্দেহের দৃষ্টিতে চাইছে। তিয়াষ ও জুঁইয়ের বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। তারা উঠতেই বোট ছেড়ে

দেয়। স্পীডবোট জল কেটে দ্রুত এগিয়ে যায়। রাজঘাট থেকে নীরমহলের দূরত্ব প্রায় দেড় কিলোমিটার। বোটে উঠে তিয়াষ জুঁইয়ের দিকে আড় চোখে চায়। জুঁই দেখতে পেয়েই জিভ বের করে ভেংচি কাটে। - চুপ করে থাকা জুঁইয়ের স্বভাব নয়। তিয়াষকে উদ্দেশ্য করে সে বলে - বলে দেবো, তুমি যে আমায় সাড়া দিতে বারণ করেছিলে? তিয়াষ - আমি তোকে বারণ করেছিলাম, না তুই আমার মুখ চেপে ধরেছিলি? নিজে বাঁচার জন্য মিছে কথা বলতে শিখেছে?

জুঁই - তুমিই তো আমার মুখ চেপে ধরেছিলে।

তিয়াষ - মিথ্যে বলবি না জুঁই। এই তোকে বলে দিলাম।

জুঁই - আমি মিথ্যা বলছি, না, তুমি মিথ্যে বলছ?

তিয়াষ - তুই বলছিস।

জুঁই - তুমি বলছ।

তিয়াষ - তুই - তুই - তুই - বলছিস -

জুঁই - তুমি - তুমি - তুমি - বলছ।

বিরক্ত নন্দিতা এবার দু'জনকেই ধমক দেয় - থামবি তোরা? কান ঝালা-পালা করে তুলল। দুটোই আস্ত বাঁদর। বাঁদরামো করার জায়গা পাওনা? বাসায় যাও। তারপর বিচার হবে। এখন আর একটিও কথা নয়। ডাকতে ডাকতে আমাদের গলা শুকিয়ে গেছে। ভয়ে-আতংকে হাত পা অবশ হয়ে আসছিল। তবু সাড়া নেই। - এমন অসভ্যতা করার সাহস পেলে কোথায়? আর কোনদিন তোমাদের নিয়ে কোথাও যাওয়া হবে না। তিয়াষ ও জুঁইকে ডাকতে ডাকতে তারা একসময় অসহায়ের মতো কেঁদেই ফেলেছিল। তারা তাই রাগ করে সারা পথ তাদের দু'জনের সঙ্গে একটিও কথা বলেনি।

একটু পরে জুঁই তিয়াষকে ফের বলে - ঠিকমতো কানটানা পড়েছে। আমি খুব খুশী হয়েছি।

তিয়াষ - আহা, ওনাব জন্য যেন রসগোল্লা বরাদ্দ হয়েছে। এই জুঁই, তুই আমার দিকে তাকাবিনা, কথাও বলবি না।

মাধুরী - কানটানা খেয়েও দেখছি একটুও আক্কেল হয়নি। তোদের কি কোন লজ্জা-শরম নেই? দেখছিস নন্দিতা, এমন বেহায়া, বাপু, আমার সারা জীবনেও কাউকে দেখিনি।

রুদ্র সাগরের জলে গোধুলির লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে। শীতের মধুর আমেজ। জেলেরা টানা জাল দিয়ে মাছ ধরছে। বালিহাঁসের কয়েকটি ছোট ছোট অগ্রগামী দল এসে

পড়েছে। কয়েকটি পানকৌড়ি জলে ডুব দিয়ে গুগলি বা মাছ মুখে নিয়ে জল থেকে উঠেই সাঁই সাঁই করে উড়ে গিয়ে বাঁশের খুঁটিতে বসছে। আবার আর একটি জলে ডুব দিচ্ছে। মাথার উপর দিয়ে তীরের ফলার মতো এক ঝাঁক সাদা বক সুদূর গন্তব্যের পানে উড়ে চলেছে। দু'তিনটি বাজপাখি চক্রাকারে রুদিজলার আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। স্পীড্‌বোট জল কেটে রাজঘাটের দিকে এগিয়ে চলেছে।

দশমীর পরদিন হিমাদ্রিরা উদয়পুর ফিরে যাবে। নন্দিতা, তিয়াষকে নিয়ে লক্ষ্মীপূজার পরদিন ফিরবে। দশমীর দুপুরে জম-জমাট খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন। সন্ধ্যায় তারা প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতে যায়। ফিরে এসে বড়রা তাস নিয়ে বসে পড়ে। হিমাদ্রি ও নন্দিতা একপক্ষে, তপোধীর ও মাধুরী অন্যপক্ষে। ব্রীজখেলায় তারা চিরস্থায়ী পার্টনার।

সময় কাটানোর জন্য জুঁই ও তিয়াষ লুডো খেলতে বসে। জুঁইয়ের দুটি গুটি কাটা পড়ার পরই - জুঁই রাগ করে লুডোর ঘর উল্টে দেয়। তারপর বড়দের পাশে বসে তাস খেলা দেখতে থাকে। তিয়াষ কোন কথা না বলে চাঁদের আলোয় বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। বিসর্জনের দশমীর চাঁদ। সেই আলোর মধ্যেও যেন বিষন্নতার ছোঁয়া লেগে আছে। তিয়াষ ঘাসের গালিচার উপর বসে। চাঁপা গাছের কোটরে বাসা বেঁধেছে যেই একজোড়া লক্ষ্মী পেঁচা, তারা নিশ্চয়ই বাসায় নেই। ভাবতে ভাবতেই ডেকে উঠে একটি পেঁচা, তারপর একা একা উড়ে এসে বিদ্যুতের খুঁটির উপর চুপচাপ বসে। পেঁচাটিও যে তার মত আজ একা - নিঃসঙ্গ - সঙ্গীহারা। কালই জুঁইরা চলে যাবে। বিদায়-বিরহের বিষন্নতার সুর আজই হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যায়। কেমন আনমনা হয়ে যায় তিয়াষ। - ভালোবাসা মানুষকে এমন করে ব্যথা দেয়? কেন দেয়? - হঠাৎ এক টুকরো মেঘ ক্ষণকালের জন্য চাঁদকে আড়াল করেই আবার সরে যায় আকাশের এক পাশে।

হঠাৎ পেছনে কাঁধের উপর দুটি পরিচিত নরম হাতের স্পর্শ অনুভব করে তিয়াষ। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করেই চুপচাপ বসে থাকে। জুঁই এবার তিয়াষের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। তিয়াষ তবু নির্বিকার। ভাবলেশহীন অভিব্যক্তির এক মূর্ত প্রতীক।

নীরবতা ভঙ্গ করে জুঁই বলে ওঠে - তিয়াষদা আমরা কাল সকালে চলে যাব। এবার যাবার পর তোমাকে খুব মিস্ করবো। তোমরা তাড়াতাড়ি চলে এসো।

তিয়াষ - জুঁই, তোর ছেলে মানুষি ছাড়। সব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ভালো নয়। আজ বড্ডো বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। মা, রাঙ্গামাসী কি ভাবলো বল্‌তো।

জুঁই - 'তোর কোলে একটু মাথা রেখে শুই' - একথা কি আমি বলেছিলাম? এখন আমার দোষ।

দু'টি পালক

তিয়াষ - তোর ইচ্ছে না হলে, তুই রাজী না হলে পারতিস, - 'এই আমি ঘুরে বসলাম। এবার তোমার ইচ্ছে পূরণ কর' - একথা কে বলেছিল ?

প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য তিয়াষই জুঁইকে বলে - তোকে একটা কথা বলবো জুঁই ? - একথা বলার আগে তোকে কথা দিতে হবে যে জীবনে তুই কাউকে আর একথা বলবি না।

জুঁই - কি বলবে বল। আমি কাউকে বলব না।

তিয়াষ - আমার গাঁ ছুঁয়ে বল, তুই কাউকে একথা বলবি না।

জুঁই - এই তোমার গাঁ ছুঁয়ে বললাম, কাউকে বলব না।

তিয়াষ বলতে শুরু করে - জানিস জুঁই, একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি মিলিদিদের বাড়ি গিয়েছিলাম। জেঠিমার কথা বলে মিলিদি আমায় যেতে বলে। তাঁদের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল বৃষ্টি নামে। ঘরে ঢুকে দেখি বাড়িতে মিলিদি ছাড়া আর কেউ নেই - না, আমার লজ্জা করছে রে, বলতে পারব না -

জুঁই - ঢং করোনা। কি বলবার আছে লজ্জা - ফজ্জা না করে বলে ফেল -

তিয়াষ - সত্যি বলছি। বড্ডো লজ্জা করছে। বলতে পারবো না। তোকে কথাটা কিভাবে বলি বলতো।

জুঁই - বলই না, শুনি।

তিয়াষ বলতে শুরু করে— আমি ঘরে গিয়ে বসেছি। মিলিদি আমায় ডেকে নিয়ে ভেতরের ঘরে বসাল। খেতে দিল। পায়েস আর মুড়ির মোয়া খেলাম। বৃষ্টি বন্ধ হচ্ছে না বলে যেতেও পারছি না। মিলিদি ভেতরের ঘরে গিয়ে পোশাক পাল্টে একটা সুন্দর শাড়ী পরে আমার সামনে দাঁড়াল। খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল মিলিদিকে। হঠাৎ মিলিদি কি করল জানিস,- শাড়ীটা হঠাৎ খুলে ফেলল। গায়ে আর কোন কাপড় নেই। পুরো উলঙ্গ হয়ে মিলিদি আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি নিজেকে সরিয়ে নিলাম। মিলিদি তবু কাপড় না পরে তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো। আমি মিলিদির নগ্নরূপের দিকে তাকিয়ে রইলাম। লজ্জা লাগছিল, কিন্তু চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। মিলিদিকে আমার মনে হচ্ছিল শিল্পীর হাতে গড়া কোন ভাস্কর্যমূর্তি। দেবশিল্পী বুঝি এক অপরূপ দেবী প্রতিমা গড়ে সেদিনের বৃষ্টি ঝরা শ্রাবণ সন্ধ্যায় পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমি মেয়েদের এমন নগ্নরূপ তো আগে কখনো দেখিনি। তোর কাছে সত্যি বলছি জুঁই, মিলিদির এই অনিন্দ্য নগ্ন সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ রূপ না দেখলে আমার জীবনের সাধ যে অপূর্ণ থেকে যেতো। মেয়েদের যে এমন রহস্যময়ী, মোহময়ী দেবীমূর্তির মতো তন্বী সুষমা হতে পারে, তা আমার স্বপ্ন কল্পনারও বাইরে।

তিয়াষের মুখে এই কাহিনী শুনে শিউরে ওঠে জুঁই। আবার মনে ভীষণ ঈর্ষাও

জাগে। বসা থেকে সোজা দাঁড়িয়ে গিয়ে বাম হাত কোমরে রেখে - ডান হাতের তর্জনী উঠিয়ে তিয়াষের দিকে তাকিয়ে জুঁই বলে - খবরদার, তোমাকে আমি সাবধান করে দিলাম, এমন লজ্জাহীন মেয়ের বাড়ি আর কোনদিন যাবে না। কি খারাপ মেয়ে দেখেছ বাবা! একটু লজ্জা শরম নেই -। ছিঃ ছিঃ।

তিয়াষ - নারে জুঁই, তুই যেমন ভাবছিস্ তেমন নয়। মিলিদি সত্যি বোকা আর ভালো মেয়ে রে। মিলিদি এখন পুরো পাল্টে গেছে রে -

জুঁই - তুমি কচু বোঝ! এমন দুমসো মেয়েরা না এমনই হয়। ওদের লজ্জা থাকে না। অমন মেয়েদের আমি দুচোখে দেখতে পারি না। মিলিদি মিলিদি বলে আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না। কি পিরিতি রে! আর যদি কখনো তাদের বাড়ি যাও না, তবে তোমার সঙ্গে আমার চিরকালের আড়ি।

তিয়াষ আর কথা বাড়ায় না। রাত বেড়ে যায়। মা খাবারের জন্য ডাক পেড়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে যাবার পরও অনেক রাত্র অবধি গল্প - আড্ডা চলতে থাকে। ইতিমধ্যে জুঁই ও তিয়াষ ঘুমিয়ে পড়েছে।

দশমীর পরদিন হিমাদ্রিরা সপরিবারে উদয়পুর ফিরে গেল। যথাবীতি লক্ষ্মীপূজার পর নন্দিতা ও তিয়াষ ও চলে আসে। পাখি ডাকে, ফুল ফোটে, ভোব হয়, দিন যায়, মাস যায় -। স্থির অনন্ত সময়কে পেছনে ফেলে বছর এগিয়ে যায়।



বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। তিয়াষের জায়গা বদল হয়নি। তবে সোহম ও পলাশ জায়গা বদল করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে। বছরের প্রথম থেকেই পড়াশুনোর চাপ। জুঁই ও মর্নিং স্কুল ছেড়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে এসে একই স্কুলে ভর্তি হয়েছে। সরস্বতী পুজোয় জুঁই তার নতুন বান্ধবীদের সঙ্গে এক সাথে সাদা শাড়ী পরে অঞ্জলি দিতে এসেছিল। ফেরার পথে তিয়াষদের বাসায় আসে। নন্দিতা জুঁইকে আর যেতে দেয়নি। মাধুরীকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে যে জুঁই তাদের বাসায় দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে বিকেলে যাবে।

জুঁই নন্দিতাকে বলে - মিষ্টি মাসী তোমরা আমাদের বাড়ি আগের মত যাও না

কেন?

নন্দিতা - সময় কোথায় রে মা। জানিস তো, হাট-বাজার রান্না-বান্না সবই যে এক হাতে করতে হয়। কাজের মাসী আজ সাতদিন পরে এসেছে। এছাড়া মাসে চার-পাঁচ দিন তো আসেই না। এখন আবার বলছে প্রতি রবিবার আসবে না। রবিবারে ছুটি দিতে হবে। সব কিছুই কেমন পাল্টে যাচ্ছে।

জুঁই - তিয়াষদাকে বলবে রবিবার বিকেলে আমাদের বাসায় যেতে।

নন্দিতা - তুই বল গে যা। আমি বলতে পারব না।

যাবার সময় জুঁই তিয়াষকে বলে - তিয়াষ দা, রবিবার বিকেলে আমাদের বাড়ি আসবে। অবশ্যই। মাসীমাকে বলেছি। মিষ্টিমাসী বলেছে - তুই রাজ পুত্তুরকে নিজে বলে যা।

রবিবারের বিকেলে তিয়াষ জুঁইদের বাসায় যায়। ঘরের দুয়ার খোলাই ছিল। রাঙ্গা মাসী - রাঙ্গা মাসী - বলেই ঘরের পরদা ঠেলে তিয়াষ ঘরে ঢুকে যায়। ঘরে ঢুকেই দেখে বেদীর উপর অপূর্ব সুন্দর সরস্বতী মূর্তি। তিয়াষ লক্ষ্য করে দেবীর অঙ্গে কোন বস্ত্র নেই। কালো চুলে দুই দিকের বুক ঢাকা। দেবীর নিরাবরণ দেহ আভরনহীন। চোখ দুটি স্বপ্নিল, অর্দ্ধ নিমীলিত। দেখতে অনেকটা জুঁইয়ের মতো। জুঁই নয় তো? জুঁই হলে তো নড়তো। কিন্তু মূর্তিটি যে স্থির। নড়া-চড়া নেই। জুঁইরা যে এমন সুন্দর মৃন্ময়ী মূর্তি এনেছে এবং বাসায় মূর্তি বসিয়ে পূজা করেছে - তারা তো কেউ তিয়াষদের জানায় নি। ঘরেও যে কেউ নেই। জুঁই কোথা গেল তাই বা কে জানে! ভাবে গদগদ হয়ে তিয়াষ ভক্তি পূর্ণ চিত্তে হাঁটু গেঁড়ে আভূমিনত হয়ে দেবীমূর্তিকে প্রণাম করে চোখ বুঝে প্রার্থনা জানায়। তারপর উঠে বসে হাতজোড় করে বেদীর দিকে তাকিয়ে দেখে বেদী শূন্য। কোন মূর্তি নেই। ভীষণ ধাঁধায় পড়ে যায় তিয়াষ। এমন অলৌকিক ঘটনায় তিয়াষ বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পড়ে। দুয়ার খোলা, চারদিকে তাকিয়ে কাউকে না দেখে তিয়াষের বিস্ময়ের সঙ্গে সংশয়ও দেখা দেয়। এ ঘর - ও ঘর উঁকি দিয়েও কাউকে দেখতে পায় না। তারপর ডাকতে থাকে - রাঙ্গা মাসী, রাঙ্গা মাসী - জুঁই - এ জুঁই । কোন সাড়া পায় না তিয়াষ।

তিয়াষ এবার এ ঘর থেকে ও ঘরে যায়। আর কাউকে দেখতে না পেয়ে স্বগোতক্তির মতো বলতে থাকে - এতো এক অবাক কাণ্ড বাবা! বাড়ি সুদ্ধু লোক গেল কোথায়? - একটু থমকে দাঁড়িয়েই তিয়াষ চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। এমন সময় দুটি হাত তিয়াষের কোমর জড়িয়ে ধরে। তিয়াষ মুহূর্তেই ঘুরে দাঁড়ায়। জুঁই আর তিয়াষ মুখোমুখি। জুঁইয়ের পরনে একটি মিষ্টি সবুজ রেশমী শাড়ী, ম্যাচ করা ব্লাউজ। কপালে টিয়া রঙের টিপ। অপূর্ব

দেখাচ্ছে জুঁইকে। পাতাল পুরীর রাজকন্যা যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। শাড়ীতে জুঁইকে বেশ লম্বা দেখাচ্ছে। পাতলা-লম্বা গড়ন জুঁইয়ের। এ বয়সেই পাঁচফুটের কাছাকাছি লম্বা।

তিয়াষ - এতক্ষণ ডাকাডাকি করছিলাম - সাড়া দিলি না কেন? এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

জুঁই - কাউকে না দেখতে পেয়ে তুমি কি কর, তাই পরীক্ষা করছিলাম। দাঁড়িয়ে না থেকে সোফায় গিয়ে বস। আমার দিকে অমন হাঁ করে চেয়ে থাকতে হবে না।

তিয়াষ ড্রয়িংরুমের সোফায় গিয়ে বসে। তারপর জুঁইয়ের দিকে চেয়ে বলে - হ্যাঁরে, কাকু আর রাঙ্গামাসী কোথায় রে? তাদের যে ঘরে দেখতে পাচ্ছি না।

জুঁই - বাবা সম্মেলনের কাজে টাউন হলে, মা কুট্টি মাসীর বাড়ি।

তিয়াষ - তুই ঘরে একা?

জুঁই - একাই তো। আমি কাউকে ভয় পাই নাকি? আমাদের ঘরে কেউ ঢুকবে? আমাকে তো জানে না - চটকিয়ে বেগুন পোড়া বানিয়ে ছাড়ব না।

তিয়াষরা যে কোয়ার্টারে থাকত, তা এখন খালি, বাকী দুটো কোয়ার্টারে অনেকবছর ধরেই দুটি পরিবার থাকে। এই দুই পরিবারের কেউই আর কারো সঙ্গে তেমন মেলা-মেশা করে না। তবে দুই পরিবারে খুবই মিল।

তিয়াষরা থাকতে এখানে যে একটা জম-জমাট পরিবেশ গড়ে উঠেছিল, তারা চলে যাবার পর তা যেন হারিয়ে গেছে। তিয়াষ বুঝতে পারে যে জুঁই সরস্বতী সেজে এইভাবে নগ্ন বেশে দাঁড়িয়েছিল। তিয়াষের মনে মনে হাসি পায় এবং সে বেশ কৌতুক বোধও করে। তারপর জুঁইয়ের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় - তা, মহারাণীর এতক্ষণ কোথায় থাকা হয়েছিল?

জুঁই - মহারাজের তো তা না জানার কথা নয়।

তিয়াষ - আমি ডাকার পরও উত্তর দিচ্ছিলি না কেন? বদ্‌মতলব এঁটেছিলে?

জুঁই - দেখছিলাম, তুমি এখানে ভূমিতে লুটিয়ে কাকে যেন প্রণাম করলে, আর চোখ বুঝে বিড়বিড় করে কি যেন বলছিলে?

তিয়াষ সবটা বুঝতে পেরেই কিছুই হয়নি এমন ভাব করে বলে - হ্যাঁরে জুঁই, তোরা যে মূর্তি গড়ে বাসায় সরস্বতী পূজা করলি, আমাদের জানালি না কেন?

জুঁই - কই, আমাদের বাড়িতে আমরা কোন পূজা করিনি তো।

তিয়াষ - তবে ঘরের মধ্যে পূজা বেদী এল কোথা থেকে?

জুঁই - পূজাবেদী? কোথায় দেখলে পূজা বেদী?

তিয়াষ - কেন? এখানেই তো একটা বেদী ছিল?

জুঁই - আজকাল কি তুমি চোখে সর্ষেফুল দেখতে শুরু করেছ? বেদী কোথায় দেখলে? ডাক্তারকে তোমার চোখ দেখানো দরকার। বেশী দেরী করো না। রোগ গভীর হলে কিন্তু চোখ সারবে না।

তিয়াষ দমবার পাত্র নয়। সে বুঝতে পারে, জুঁই তাকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে।

জুঁই আবার তিয়াষকে বলে - তা তুমি অমন হাঁটু গেঁড়ে বসে কাকে প্রণাম করলে বললে নাতো। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। তোমার কীর্তি আমি সব স্বচক্ষে দেখেছি। সবাইকে জানিয়ে দেব নাকি?

তিয়াষের প্রথমেই বোঝা উচিৎ ছিল যে জুঁই নিজেই নগ্ন হয়ে অমন সরস্বতীর মূর্তির ঢং-এ বেদীর উপর স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়েছিল। সে যখন আভূমি নত হয়ে প্রণাম করছিল, সেই সময় জুঁই সন্তর্পণে সরে যায়। আর সে যখন এ ঘর - ওঘর করে সবাইকে খুঁজছিল, সেই ফাঁকেই পূজা বেদীটা সরিয়ে ফেলে। বেদীটা তিয়াষের খুঁজে বের করতেই হবে। জুঁই বড় জোর এটাকে খাটের নীচে সরিয়ে দিয়েছে।

তিয়াষ - কি করছিলাম তোকে বলছি। আমার গলা শুকিয়ে গেছে। আমায় এক গ্লাস জল দে তো।

জুঁই তিয়াষের জন্য জল আনতে যায়। তিয়াষ খাটের তলা থেকে বেদীটা বের করে আগের জায়গায় রেখে দেয়।.গ্লাস ভর্তি জল এনে সামনে বেদীটা দেখেই জুঁই তিয়াষকে জল না দিয়ে নিজেই ঢক ঢক করে জল খেতে গিয়ে ঝিম খায়। - তিয়াষ তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে জুঁইয়ের মাথা চাপড়ে ষাট-ষাট বলতে থাকে। - তারপর বলে - আহা আঃ - মা সরস্বতীর এমন বিষম লেগে গেলে - ভক্তদের জানি কি হাল হবে - ?

ফিক্ করে হেসে ফেলে জুঁই। হাসি চেপে তারপর বলে - হঠাৎই দেখি আমার গলাটা একদম শুকিয়ে গেছে। গলায় কথা আটকে যাচ্ছিল। আর জলটাও গলায় কেমন আটকে গিয়েছিল - আর তাই কেমন বিষম খেলুম, দেখলে? - দাঁড়াও, তোমার জন্য জল নিয়ে আসছি।

তিয়াষ - আমার জন্য আর জল আনতে হবে না। তার চেয়ে বলুন তো - এই বেদীটা খাটের নীচে কেমন করে গেল?

জুঁই - যেমন করে ভক্তের সামনে থেকে দেবী অদৃশ্য হয়ে যায়, তেমন করে হয়তো

দেবীর সঙ্গে সঙ্গে বেদীও অদৃশ্য হয়।

তিয়াষ - দেবী, কেমন করে অদৃশ্য হয়ে যায়?

জুঁই - আমি কেমন করে বলব?

তিয়াষ - উলঙ্গ দেবীর তো অদৃশ্য না হয়ে উপায়ও ছিল না। তা দেবী সরস্বতীর মর্ত্যধামে এমন উলঙ্গ হয়ে আসবার ইচ্ছেটা কেমন করে হোল?

জুঁই - ওই, তোমাদের কি একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী আছেন না? মকবুল ফিদা হুসেন - তিনিই তো দেবী সরস্বতীকে নগ্ন করে এঁকেছিলেন। সেই থেকেই তো দেবী আর কাপড় পরবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন।

তিয়াষ - তা প্রতিজ্ঞাটা এখন ভঙ্গ হোল কেন? দেবী তো ওই ভঙ্গীতেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতেন।

জুঁই - দেবদেবীদের মনের কথা জানা তো আমার কম্ম নয়। তা তোমরা ভক্তবৃন্দের দল দেবীর কাছ থেকে তা জেনে নিও। তা দেবীর সামনে বিড়বিড় করে যে মন্ত্রটা পাঠ করেছিলে - তা শুনে দেবী তোমায় কোন বর-টর দেননি বুঝি? আহাবে - দেব-দেবীরাও আজকাল বড় সেয়ানা হয়ে গেছে। ভক্তের মনোবাঞ্ছা-টাঞ্ছা পূরণে আজকাল আগ্রহ কম। নিষ্ঠাবান ভক্তের আজকাল সত্যিই বড় অভাব।

তিয়াষ এতক্ষণের কৌতুক ছেড়ে দিয়ে সিরিয়াস মুডে জুঁইকে জিজ্ঞেস করে - তুই এইভাবে সরস্বতীর মূর্তির ঢংগে নেংটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলি কেন রে?

জুঁই - না হলে তুমি আমাকে কখনো এমনভাবে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে প্রণাম করতে? এখন বললে প্রণাম করবে? তোমার মিলিদিকে দেবী বানিয়ে যে প্রণাম করে এসেছিলে মনে আছে? আমি যা করেছি, ঠিক করেছি।

তিয়াষ - তোকে আমার প্রণাম করতে বয়ে গেছে।

জুঁই - প্রণাম তো করেইছ। এখন বড় বড় কথা বল না। বেকুবের হদ্দ। মূর্তি না জলজ্যান্ত মানুষ তাই ঠাওর করতে পারে না, আবার বড় বড় বিজ্ঞের মত কথা।

তিয়াষ - দাঁড়া, রাঙ্গামাসী আসুক, তোর সব কীর্তি ফাঁস করে দেব। এখন থেকে তোর সঙ্গে কথাই বলব না।

জুঁই - হাজার প্রতিজ্ঞা করেও তুমি আমার সঙ্গে কোনদিন কথা বন্ধ করে থাকতে পারবে না। মিলিদিকে দেবীর মতো লেগেছিল। কেন -? মিলিদি মা কালীর মতো নেংটো হয়ে উনার সামনে আবির্ভূতা হয়েছেন। আমাকে দেবী ভেবে প্রণামই সেরে ফেললেন? আমি ফিদা হুসেনের স্টাইলে সরস্বতী সেজেছি বলে। - তোমার কাছে দেবীরা নগ্ন রূপে

হাজির হন - আর তুমি মজে যাও। তোমার ব্যাপার খানা কি বলতে পার?

জুঁইয়ের কথায় চমকে ওঠে তিয়াষ। সত্যিই তো। তিয়াষের মানব-মানবীর আদিম নগ্নরূপ দেখার বাসনা জাগলো কেন? এটা কোন বিকৃতি নয় তো? এতো সত্যিই ভালো নয়। নিজেকে সংযত করে তিয়াষ। - হঠাৎই ঘরের মধ্যে নাচ জুড়ে দেয় জুঁই-

'উলঙ্গিনী নাচে রণ রঙ্গে'।

অসাধারণ দক্ষতায় নাচ শেষ করে জুঁই। বিস্মিত তিয়াষ। তারপর বলে - তুই এমন সুন্দর নাচতে পারিস জুঁই? কোনদিন বলিস নি।

জুঁই - তোমায় একদিন নাচ দেখাবো বলেই, কোনদিন বলিনি।

তিয়াষ - তুই এমন বিবস্ত্র হয়ে সরস্বতীর মূর্তির ঢংগে দাঁড়িয়েছিলি কেন?

জুঁই - তুমি তো আমার লজ্জাহরণ। তোমাকে আবার আমার লজ্জা কি? তোমার কাছে আমার আবরনের মূল্যই বা কি? তুমিই তো আমার সব আবরণ।

তারপর একটু থেমে বলে - তুমি মিলিদির চেয়ে কত ছোট। এত বড় মেয়ে হয়ে মিলিদির তোমার সামনে উলঙ্গ হতে লজ্জা পেল না। মিলিদির তো তুমি কোন দোষ দ্যাখনি। আমার ব্যাপারে এত দোষ খুঁজছ কেন? রামায়ণে পড়নি - ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির সামনেই - সুন্দরী রূপসী নগ্নিকা বারবণিতারা কেমন নিঃসঙ্কোচে স্নান করছিল। যেই তারা মুনির পিতৃদেবকে সেখানে আসতে দেখলেন - সকলেই লজ্জায় জলের মধ্যে গা ডুবিয়ে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামের গোপবালাদের সব কাপড় যে কদমগাছে তুলে রেখেছিল - তা ভুলে গেছ? ওই ব্রজনারীগণ যমুনার পারে তাদের অঙ্গের বসন খুলে রেখে নগ্ন হয়েই নদীতে স্নানে নেমেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রহরণ করে তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন যে নদীরও চোখ আছে। নদী তাদের নগ্নতা দেখতে পায়। এর আসল তাৎপর্য হলো - নিজের কাছেও নিজে কখনো নগ্ন হতে নেই।

তিয়াষ - তুই এত কথা জানলি কি করে?

জুঁই - আমার ঠাকুমা যে আমায় সব বলে। ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হলে কি হয় - এমন অনেক কথা বলেছে। ফুলশয্যার রাতে বরকে কিভাবে টাইট দিতে হয় তা ঠাকুমা আমায় শিখিয়ে দেবে বলেছে।

তিয়াষ - তাহলে তুই তোর ঠাকুমার কাছে বিয়ের কোর্সটা পাশ করে নে। ভবিষ্যতে অনেক কাজে লাগবে।

জুঁই - লাগবেই তো। তোমাদের মতো পুরুষ মানুষকে টিট্ করতে অবশ্যই তা

লাগবে।

- মুখ থেকে কথা পড়তে পারে না। বাপ্‌রে কী দজ্জাল মেয়ে - এ মেয়েকে কে জানি বিয়ে করবে? - বলে তিয়াষ।

জুঁই - মুখ লাগাবে না বলে দিচ্ছি। আমার বিয়ের কথা তোমায় ভাবতে হবে না। আমার বর ঠিক হয়ে আছে।

তিয়াষ - তোর বরটা যেন একটা মুখ পোড়া বাঁদর হয়।

জুঁই - তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে না। মুখটা তোমারই পুড়বে। - আমার কচু হবে। নিজেই মুখ দেখাতে পারবে না।

এমন সময় রিক্সা থেকে নামে মাধুরী। ঘরে ঢুকে দু'জনকে কথা বলতে দেখে ভারী খুশী হয়। এরপর বলে - তিয়াষ কখন এলি রে? অনেকদিন পরে এলি না?

তিয়াষ - অনেকক্ষণ হলো এসেছি। তোমার জন্যেই বসে আছি। এতক্ষণ হয়েছে খালি মুখে বসে আছি। এক গ্লাস জল পর্যন্ত দেয়নি। এ মেয়ে বিয়ের পর - বরকে না খাইয়ে মেরে ফেলবে।

মাধুরী - কিরে তিয়াষকে খেতে দিস্‌নি? এতক্ষণ না খাইয়ে বসিয়ে রেখেছিস? দ্যাখো মেয়ের কাণ্ড। দে, তিয়াষকে খেতে দে।

জুঁই - পেটুক কোথাকার। বাড়ি থেকে যেন না খেয়ে এসেছে। মাসী আসাব সঙ্গে সঙ্গেই নালিশ। আমিও দেখে নেব। আমার নামে নালিশ করা - আমি সুদে-আসলে তুলে ছাড়ব - তবেই আমার নাম জুঁই।

উঠেই রাগে গজ গজ করতে করতে ডাইনিংরুমে চলে যায়। তারপর ট্রেতে করে সাজিয়ে মিষ্টি, নাড়ু, পায়েস ও কমলা এনে তিয়াষের সামনে রেখে বলে - খাও। সবটাই খেতে হবে কিন্তু। আমি এখানে বসছি। তোমার খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠছিনা। আমি তো শুনতে চাইছিলুম যে - বাবু খেতে বলে কিনা। খাবার দিলে - এটা খাব না - ওটা খাবনা। আজ না খেয়ে এক পাও নড়তে পারবে না।

তিয়াষ - আমি ঘটোৎকচের বংশধর কিনা! আমার পেটতো বিরাট জালার মতো।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠে। জুঁই রিসিভার তুলে নেয়? হ্যালো - আমি বলছি -। কে মিষ্টি মাসী - কাকু এসেছে - মা এই মাত্র ফিরলো গো - তিয়াষদাকে দেবো - দিতে হবে না - তাড়াতাড়ি আসতে বলগে - ঠিক আছে - তুমি কেমন আছো - কাকুকে বলো যাবার আগে আমাদের বাসায় আসতে - রাখছি।

দু'টি পালক

তিয়াষ পায়েসটা খেয়ে কমলা লেবুটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। যাবার সময় মাধুরী একটা টিফিন বক্সে নাড়ু ভর্তি করে দিয়ে দেয়।

ইতিমধ্যে দুটি বড় ঘটনা ঘটে গেছে। জজসাহেব শশধর শিকদারের বৌ আত্মহত্যা করেছে। শোনা যায়। জজসাহেব সাব্রুম বদলী হবার পর অফিসের কাজের অজুহাত দেখিয়ে প্রায়শই উদয়পুর এসে রাত্রি বাস করতেন, তাঁরই এক সময়ের আপ্ত সহায়ক সুভদ্রা ভদ্রের সঙ্গে। সে খবর কে বা কারা জজসাহেবের স্ত্রীর কানে তুলে দিয়েছেন। জজসাহেবকে বারণ করা সত্ত্বেও তিনি তাতে কর্ণপাত করেন নি। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য চলতেই থাকে। একদিন নেশার ঝোঁকে স্ত্রীর গায়ে হাতও তোলেন। এরপর জজ শাহেবের স্ত্রী ঘুমের বড়ি খেয়ে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়েন। খবর পেয়ে নীতার মামার বাড়ির লোকজন ছুটে আসে। পুলিশি তদন্ত হয়। আত্মহত্যা বলে জজসাহেবের বিরুদ্ধে কোন মামলা রুজু হয় নাই। জজসাহেবও বেশী সময় হরণ না করে স্ত্রীর মৃত্যুর ছয়মাসের মাথায় সুভদ্রা ভদ্রকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসেন। বিয়ের খবর পাবার পর নীতাকে তার মামারা এসে নিয়ে যায়। এ নিয়ে জজসাহেবও বেশী বাড়াবাড়ি করেন নি। তবে মেয়ের জন্য মাসে মাসে মাসোহারা পাঠিয়ে দেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি মিলিদির বড়বোন লিলিদিকে নিয়ে। বি.এ. পড়ার সময় লিলিদি এক বি.এস.এফের হাবিলদারের প্রেমে পড়েন। তারপর তাদের মধ্যে বিয়েও হয়ে যায়। খবর নিয়ে জানা যায় সেই হাবিলদার কৃপাণ সিংহের পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরের বাড়িতে এক বিবাহিতা স্ত্রী ও দুটি ছেলে রয়েছে। খবর শোনার পর শৈলেশবাবুর বাড়িতে দিনরাত কান্না-কাটি চলছে। খবর শুনেই শৈলেশবাবুর স্ত্রী বিছানা নিয়েছেন। শৈলেশবাবু নীরব, নিথর। মিলির চোখের জল বাঁধন হারা। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও হিতৈষীরা এসে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছেন। আবার ঈর্ষা কাতর কিছু প্রতিবেশী সান্ত্বনার ছলে নানা তির্যক মন্তব্য করতেও ছাড়ছেন না। নন্দিতা খবর শুনেই তিয়াষকে নিয়ে তাদের বাড়ি এলেন। তিয়াষকে বুকে জড়িয়ে ধরে জেঠিমার সেই কী কান্না।

বন্ধু নয়, বান্ধব নয়, স্বজন নয়। প্রতিবেশী নয় - সমাজ নয়, - সময়। সময় সকলের মনেই তার সম্মোহনী সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে যায়। মানুষ ধীরে ধীরে বীতশোক হয়। ঘটমান অতীতকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলার সঞ্জীবনী মন্ত্রে মানুষ সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সমাজে রাষ্ট্রে নিয়ত সংগঠিত হয় নানা উত্থান-পতন। শাশ্বত সমাজ সত্তার দেহে চলতে থাকে নিয়ত পরিবর্তন। সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থায় দুরন্ত পরিবর্তনের ঝড় উঠেছে। যুগান্তকারী দিন বদলের হাওয়া। বিশ্বজগৎ দুর্নিবার দোলায় দুলছে। বিরাম নেই সেই অন্তহীন দোলার। সেই অন্তহীন চলার পথেই জন্ম-জরা-মৃত্যুর অবিনাশী কালচক্র ঘুরেই চলেছে।

জানে না বিরাম, নাই তার আরাম। নিঃশব্দে তার গমন - চলা। সেই চলাও আসলে এক বিরাট স্তব্ধতা। কান পাতলে সেই সুর জেগে উঠে। সেই সুরে কোন রাগ-রাগিনী নেই। সেই অশ্রুত নীরব সংগীতই মহাকালের জয়যাত্রার কোলাহলহীন চিরন্তন গীত। একদিকে মহাকাল মহাকোলাহলে নিত্যই আপন গতিপথ পাল্টে সামনের দিকে ধেয়ে চলেছ। এইরূপ কলরব মুখর। অচল সত্তা চির মৌন।

গতবছর কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় তপোধীর বাড়ি যায় নি। মায়ের খুব ইচ্ছা - এবারের লক্ষ্মী পুজোয় নাতি ও বৌমাকে নিয়ে তপোধীর বাড়ি আসুক। বৌমা ঘরের লক্ষ্মী। লক্ষ্মাপুজোর সময় নন্দিতা বাড়ি না গেলে মা বড় রাগ করে। এবার তপোধীর ঠিক করেছে মহালয়া থেকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত টানা কিছু দিন বাড়িতেই কাটাবে। লক্ষ্মীপুজোর আগেরদিন হিমাদ্রিরাও আসবে। এর আগেও তপোধীর হিমাদ্রিকে তাদের গ্রামের বাড়িতে বেড়ানোর আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কথা দিয়েছে এবার তারা সপরিবারে আসবে।

বহুদিন পর তপোধীর বাড়ি এসেছে। মাকে পেয়ে তার খুবই আনন্দ। পুরোণ বন্ধু-বান্ধবরা এসে দেখা-সাক্ষাৎ করছে। খোঁজ নিচ্ছে। গ্রামের মানুষের কাছে তপোধীরের আলাদা একটা মর্যাদা আছে। ভালো ছাত্র হিসাবে শৈশব থেকেই তপোধীর সকলের খুবই প্রিয়। তাদের গ্রামের ছেলে এখন এস.ডি.ও. হয়েছে - এটাও কম কথা নয়। গ্রামের মানুষের মধ্যে প্রাণ চাঞ্চল্য, পবস্পরের প্রতি একটা গভীর টান - শহরে এসব দেখা যায় না।

তপোধীরদের বাড়ি থেকে অল্প একটু দূবে বাংলাদেশ। দুই দেশকে ভাগ করে বয়ে চলেছে সীমান্ত নদী ফেনী। এই নদীকে নিয়ে শৈশব কৈশোব ও যৌবনের কত যে সুখ-দুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে তার কোন শেষ নেই। বাড়ি গেলেই একবার নদীর তীরে যাবেই তপোধীর। এখন আর সেই নদীর মুখ দেখার উপায় নেই। কাঁটা তারের বেড়া যাতায়াতের সব পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। বড়ো কষ্ট হয় তপোধীরের। বাঙ্গালী জাতির জীবনে দেশভাগের বিপর্যয় এখনো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। ঘরে - বাইরে তাড়া খেতে খেতে বাঙ্গালী সর্ব অর্থেই বিপন্ন। বিশ্ব বিধাতার অভিশাপে বাঙ্গালীর ভুবন আজ খণ্ড বিখণ্ড। ভাবতে ভাবতেই কৈশোরে পড়া সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা' কবিতাটি মনে পড়ে যায়। সমষ্টি বাঙ্গালীর জীবন সংস্কৃতি কঠিন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েও ব্যক্তি বাঙ্গালী আপন বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অনুসরণ করে তপোধীরের বলতে ইচ্ছে করে,

"বাঙ্গালীদের উচ্ছেদ করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছ তাদের ছড়ায়ে,
তাদের কীর্তি যশোগাথা দিক দিগন্তে প্রকাশি -

গলায় দিলে জয়ের মালা পরায়ে।"

একাকালে যেমন এদেশে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রামমোহন, বিদ্যাসাগর জন্মেছেন। একালেও তেমনি সত্যজিৎরায়, অমর্ত্য সেন, মহম্মদ ইউনিসরা জন্মেছেন। ভবিষ্যতে এই ধারায় আরো অনেক খ্যাতিমান কৃতি মানবের জন্ম হবে। কিন্তু সমষ্টি বাঙ্গালী অন্তরের ভালোবাসার ধন হারিয়ে আজ সম্পূর্ণ রিক্ত-নিঃস্ব। পরকে আপন করার সাধনা তারা ভুলে গেছে। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে ক্ষমতা লোভী নিষ্ঠুর বলদর্পীদের অঙ্গুলি হেলনে সামগ্রিক ভাবেই বাঙ্গালী জাতি আত্মঘাতী হানাহানিতে লিপ্ত। হতবুদ্ধি ওদের সমগ্র চেতনা গ্রাস করে ফেলেছে। হীন স্বার্থের জন্য নিছক কাঙ্গালীপনা ছাড়া এ আর কিছুই নয়।

এই নদী পথে একসময় পাল তোলা নৌকা আসা যাওয়া করতো। উজান থেকে বাঁশের ভেলা ভেসে যেত ভাটির পানে। মাঝিদের ভাটিয়ালী সুরের গান মনকে নাড়া দিত। আজ সে ফেনী নদী শুকিয়ে কাঠ। চৈত্র বৈশাখে বৃষ্টি না হলে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত দেখা যায় শুধু ধুধু বালির চর।

কে জানি কোথায় বাঁশী বাজাচ্ছে। ভাবনায় ছেদ পড়ে তপোধীরের। মুরারিদার কথা মনে পড়ে। সেই মুরারিদা, যার বাঁশীর সুরে মায়াজাল সৃষ্টি হতো। যাত্রাদলে বাঁশী বাজাতো মুবারিদা। দূর-দূরান্ত থেকে লোক ছুটে আসত মুরারিদার বাঁশী শোনার জন্য। কয়েক বছর হল মুরারিদা গত হয়েছেন।

তপোধীরদের বাড়ির সামনেই লীলাগড় চা বাগান। কর্তাদের ছিল। তারা বেচে দিয়েছেন। বহুদিন বন্ধ থাকার পর সমবায় সমিতি করে এখন কর্মীরাই বাগান পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে। চা বাগিচার আলাদা একটা নৈসর্গিক সৌন্দর্য রয়েছে। মনোরম ঢেউ খেলানো সবুজের অবাধ বিস্তৃতি দেখে মন যে আপনি জুড়িয়ে যায়।

তাদের বাড়ির দোল উৎসবের একটা আলাদা আমেজ ছিল। তপোধীর তখন ছোট। বাবা-জেঠা সহ বাড়ির ও প্রতিবেশী গুরুজনেরা দোল উৎসবে মেতে উঠত। তাদের সঙ্গে যোগ দিত ছোটরা। নারায়ণ শিলা আসনে বসিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দোলের গান গেয়ে কীর্তন চলতো। সন্ধ্যা থেকে রাত অবধি। গ্রামের প্রতিটি বাড়ির উঠানে নারায়ন শিলা সহ আবীর মণ্ডিত আসন রাখা হোত। বাড়ির বৌ-ঝি এবং সকলে প্রণাম করে ঠাকুরকে আবীর দিত। সেই সময় ছোটরা পিচকারী ভর্তি রঙ ছিটিয়ে দিত গায়ে। অনেকে নিষেধ করতো। আমরা শুনতাম না। পাড়ার বৌদিদের তো রঙ দিতে পারলে আমরা খুশী হতাম। দোলের পনর দিন আগে থেকেই বাঁশমুড়া থেকে মুলিবাঁশ কেটে পিচকারী বানাতাম। সেই আনন্দ-ঘন দিনগুলি যে কোথায় হারিয়ে গেল। সেই ঐতিহ্য বা সংস্কৃতির এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

দু'টি পালক

পৌষ সংক্রান্তির রাতে পোড়ানো হোত বুড়ির ঘর। তপোধীরদের বন্ধু-বান্ধবদের একটা দল ছিল। এরা সব কাজেই নেতৃত্ব দিত। নিমন্ত্রণ বাড়ি, শ্রাদ্ধ বাড়ি, বিয়ে বাড়ির যাবতীয় কাজ করতো। এরা যে সকলের খুবই প্রিয় ছিল। পাড়াতুতো দিদিমা, ঠাকুমা-বৌদিদের সঙ্গে রঙ্গ-তামাসা ঠাট্টা-কৌতুক - এ সবের একটা দারুণ আকর্ষণ ছিল। এর মধ্যে প্রাণ ছিল। আদি রসাত্মক সেই সব স্থূল রসিকতা হলেও - এ সবই ছিল জীবন-সঙ্গী। তপোধীর এখনও গুরুজনদের সঙ্গে দেখা হলে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। বাবা - কাকাদের বয়সী গ্রামের সেই সব প্রবীণ - প্রবীণারা কেউ জেঠা, কেউ কাকা, মামা - দাদা, মেসো - মাসী, পিশি - পিশে, কাকী, জেঠি, দিদি বৌদি - সেই সব শুধু সম্পর্কই নয়। একটা নিবিড় বন্ধন। এর মধ্যে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আন্তরিকতা, দুঃখে-সুখে সামিল হওয়া সেই নিবিড় আনন্দঘন দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেল ভেবে পায়না তপোধীর।

তাদের বাড়ির সীমানায় ছোট গোঁসাইর বাড়ি। তারা বৈষ্ণব। তাদের অনেক শিষ্য - শিষ্যা আছে। প্রায়ই তারা গুরু বাড়িতে আসেন। তখন ঘরে ঘরে বৈষ্ণব সেবার একটা রেওয়াজ ছিল। ফেনী থেকে দু'এক বছর পর পর বড় গোঁসাই আসতেন। সকলেই তাঁকে বড় গোঁসাই বলতেন। তাঁর নাম বেনু গোঁসাই। আমরা ছোটরা তাঁকে দাদা গোঁসাই - এবং দাদা গোঁসাইর ঠাকুরাইনকে দিদি গোঁসাই ডাকতাম। তারা ফেনী নদী দিয়ে নৌকা পথে আসা-যাওয়া করতেন। সদ্য দেশ ভাগ হয়েছে। এপার-ওপার যাতায়াতের তেমন কোন বিধি নিষেধ ছিল না। সবাই বিনা পাশপোর্টেই আসা - যাওয়া করতেন। দাদা গোঁসাই সুন্দর ভাগবৎ পাঠ করতেন। গীতা পড়তেন। আমরাও শুনতাম। দাদা গোঁসাই এলে কেমন একটা আনন্দ পেত সবাই। তখন বৈষ্ণব সেবার ধুম পড়ে যেত। দাদা গোঁসাই এলে এক দু'মাস থাকতেন। আমাদের বাড়িতেও বৈষ্ণব সেবা হতো। সেদিন আমাদের কারোরই রান্না ঘরে যাবার উপায় ছিল না। মা সকাল বেলা উঠেই গোবর দিয়ে উনুন থেকে শুরু করে সমস্ত ঘরদোর লেপে দিয়ে তুলসীর জল ছিঁটিয়ে দিতেন। বৈরাগী মাসীই সব সময় রাঁধতেন। অন্য কয়েকজন তাকে সাহায্য করতেন। একদিন খবর এলো দাদা গোঁসাই দেহ রক্ষা করেছেন। - সেদিন পাড়া জুড়ে কান্নার রোল উঠেছিল। তপোধীরও কেঁদেছিল।

পারুলদির কথা মনে পড়ে তপোধীরের। পারুলদিরাও বৈষ্ণব। পারুলদির জন্মের পর তার মা - বাবা তাকে নিয়ে বৈষ্ণব হয়ে যায়। পারুলদি বয়সে তপোধীরের দু'তিন বছরের বড়। গায়ের রঙ ফরসা। তপ্ত কাঞ্চনের মত। মাসে একবার পারুলদির মা - বাবা পারুলদিকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করতে বেরিয়ে পড়ত। খঞ্জনী বাজিয়ে গান গাইতো। অবাক লাগতো তপোধীরের। বড় হয়ে তপোধীর বুঝেছে যে অভাবের জন্যই তারা ভিক্ষে করত। পারুলদির বাবা লাই, টুকরি, ধুনুচি এসব তৈরী করে বিক্রি করত। খুব বেশী যে

আয় হতো তা নয়। কোনমতে চলে যেত। ঘরে রান্নার জন্য চাল না থাকলে মায়ের কাছে এসে ধার নিত। সে সময় সকলেরই ছিল ঘরে ঘরে অভাব। খুব কষ্টে মানুষকে দিন কাটাতে হতো। এখনকার মতো রেশন ব্যবস্থা সে সময় ছিলনা। সেই অভাবের দিন নিয়ে কি বলা যায়? কিন্তু চিরন্তন ক্ষুধার অভাব মানুষের সুখ - শান্তি - আনন্দ - স্নেহ - মমতা - ভালোবাসা হরণ করতে পারেনি। সে কালের পল্লী জীবনের এই মহৎ প্রাপ্তির তুলনা কোথায়? - অর্থ - বিত্ত - সমাজে বলীয়ান একালের মানুষ সুখ খুঁজতে গিয়ে লবনাক্ত দুঃখের সাগরে ডুবে মরছে। এরা দুঃখ ভুলে কেবল সুখ পেতে চায়, তাই সুখ এদের ধরা দেয় না।

মল্লিকার মৃত্যুতে বিষণ্ণ মনে তপোধীর চুপচাপ পুকুর ঘাটে বসেছিল। পারুলদি এসে চুপি চুপি তপোধীরের পাশে এসে বসে। - তারপর তাকে চমকে দিয়ে পারুলদি তাকে বলে - কি ভাবছিস রে তপু? মল্লিকার কথা। তপোধীর পারুলদির দিকে চোখ তুলে তাকায়। কোন কথা বলে না। পারুলদি আবার বলে - তপু, মল্লিকা আমাকে তোর কথা একদিন বলেছিল রে। একদিন আমি তোদের দু'জনকে আম গাছের ডালে বসে পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। তোরা আমায় দেখে জলে ডুব দিয়ে পালিয়েছিলি? মনে আছে তোব সেই কথা?

তপোধীর - ওর কথা আর বলোনা পারুলদি। কষ্ট হয় আমার। পারুলদি তবু বলে চলে - জানিস আমি মল্লিকাকে একদিন বলেছিলুম - তপু বড় ভালো ছেলেরে মল্লিকা। ওকে আটকাস না। ওকে পড়াশুনো কবতে দে। দেখিস ও একদিন অনেক বড় হবে। - জানিস, আমার কথা শুনে মল্লিকা কোন কথা বলেনি। আমায় জড়িয়ে ধরে কেবল কেঁদেছিল। মেয়েটির মুখটা আজো মনে পড়ে।

তপোধীরের বিয়ের কয়েক বছর পর ফের পারুলদির সঙ্গে দেখা। পারুলদি বাপের বাড়ি বেড়াতে এসেছে। তাদের সেই পুকুর ঘাটে দেখা। তপোধীরই পারুলদিকে জিগ্যেস করেছিল - পারুলদি কেমন আছ?

পারুলদি - বৌ এনেছিস তপু? দেখতে যাবো তোর বৌ কেমন হয়েছে?

তপোধীর - তোমার বর এসেছে পারুলদি? -

পারুলদি - নারে আসেনি। - এরে তপু, ছোট্ট বেলায় তো তুই ভারী দুষ্টু ছিলি রে। মেয়েদের নিয়ে খুব খুনসুটি করতিস। - তা তোর বৌকে আদর-টাদর করিস?

তপোধীর - এদিকে এসো পারুলদি। তোমার কানে কানে একটা কথা বলবো।

আসছি বলে তাদের ঘাটে বাসন - কোসন রেখে পারুলদি তপোধীরের কাছে এসে

বসে। - তারপর বলে - বল, কি বলবি?

তপোধীর - পারুলদি, তোমার নাম না বলে আমার বৌকে কিন্তু আমি একটা কথা বলে দিয়েছি।

পারুলদি - কি বলেছিস তোর বৌকে?

তপোধীর মুচকি হাসতে হাসতে বলে - তুমি যে বিয়ের আগে বুকের কাপড় খুলে দিয়ে তোমার বুকের স্তন জোর করে আমার মুখে পুরে দিয়ে আমায় চুষতে বলেছিলে - সে কথা বলে দিয়েছি। - তুমি যাই বল পারুলদি। সেদিন আমার বড্ডো লজ্জা করেছিল। তুমি একটা কাণ্ড করেছিলে না?

পারুলদি - তুই আসলে বড্ডো ফাজিল। সে কথা তোর এখনো মনে আছে? আর সে কথা বলতে আমায় এখানে ডেকেছিস?

তপোধীর - সে কথা ভোলা যায় নাকি?

পারুলদি - অনেক্ষণ তো চুষেছিলি। লজ্জা পেলেওতো ছাড়িসনি। আবার এক হাত দিয়ে তো বাকীটা ধরে রেখেছিলি। - সেই বয়সে তুই বড্ডো পেকে গিয়েছিলি। - তারপর মুখ টিপে হেসে ফেলে পারুলদি। এরপর আবার হাসতে হাসতে বলে - বৌয়ের মাঈটা খেতে বুঝি আমারটা খাবার কথা তোর মনে পড়েছিল?

এবার লজ্জা পেয়ে যায় তপোধীর। চুপ করে থাকে। - পারুলদি ফের বলে - তোর বৌকে গিয়ে বলে দেব তুই বিয়ের আগে আমার বুকের দুধ খেয়েছিলি।

তপোধীর - বলে দিও পারুলদি। ও খুব খুশি হবে। - তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বলে - পারুলদি, তোমার বর কি করে গো?

পারুলদি - কি আর করবে। জমি-জমা একটু আছে। ও টুকু চাষ-আবাদ করে। বাকী সময় অন্যের বাড়ি কাজ কর্ম করে। আমাদের আর কি বল?

তপোধীর - তোমার ছেলে-মেয়ে ক'জন?

পারুলদি - ওরা ভাই বোন দু'জন। ওরা এখন বড় হয়ে গেছে। মেয়েটা বড়। ছেলেটাকে নিয়ে এসেছি। ও আমাকে ছাড়া থাকে না। মেয়েটাকে রেখে এসেছি। তোর জামাইবাবুর রান্না করবে কে? মেয়েটাই করে। পড়াশুনো বেশী করাতে পারিনি। বিয়ের আলাপ আসছে। বিয়ে দিয়ে দেবো।

তপোধীরের কলেজে পড়ার সময় পারুলদির বিয়ে হয়ে যায়। বৈষ্ণব বরের কাছে পারুলদিকে বিয়ে না দিয়ে গৃহস্থ ঘরে বিয়ে দেয় তার বাবা। ভুরাতলী পারুলদির শ্বশুর বাড়ি। - তারপর এক সময় পারুলদির মা-বাবাও এখান থেকে চলে যায়। - তারপর আর

দু'টি পালক

কোনদিন পারুলদির সঙ্গে তপোধীরের দেখা হয়নি। কিন্তু স্মৃতির স্বভাব বড় মন্দ। নিঃসঙ্গতা পেলেই মানুষকে চেপে ধরে, অতীতকে জাগিয়ে দিয়ে বেদনাতুর করে তুলে। সুখস্মৃতির পরিবর্তে দুঃখের স্মৃতি নিয়ে খেলাতেই তার আনন্দ। দুঃখ দিয়ে কিংবা দুঃখ পেয়েও এক ধরণের আনন্দ হয়।

রাজ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে দুষণ চলছে, ফলে এ রাজ্যের মানুষে মানুষে, পাড়ায়-পাড়ায়, গ্রামে-গ্রামে যে সম্প্রীতির বাতাবরণ ছিল, তাতে ক্রমশঃ ফাটল ধরতে থাকে। যতই রাজনীতিতে মেরুকরণ চলতে থাকে, ততই পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির শাশ্বত বন্ধন ছিন্ন হতে থাকে, ধীরে ধীরে মানবিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যায়, পরিবর্তে প্রেম-ভালোবাসাহীন এক মেকীতুতো ভাই সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর মধ্যে মনের বা হৃদয়ের কোন বন্ধন নেই। শাসন ক্ষমতায় বসে রাজধর্ম পালনের ব্যর্থতার পাশাপাশি এককেন্দ্রিক স্বৈরতান্ত্রিক এক অদ্ভুত ছিক্কা রাজনীতির সূত্রপাত ঘটে। ছিক্কার মধ্যে পদে পদে শুধু গিঁট। সেই গিঁট একবার লেগে গেলে আর খোলা যায় না। এও ঠিক তেমনি। রাজনৈতিক এথিকস্ বলে কোন বস্তু আজ আর অবশিষ্ট নেই। বিগত পঁচিশ-ত্রিশ বছরে তা উধাও। পারিবারিক বা সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান যেমন বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, বৌ-ভাত ইত্যাকার আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণেও পারিবারিক আত্মীয়- পরিজন বা বন্ধু-বান্ধবদের পরিবর্তে তুতো ভাই বোনদের প্রাধানাই বেশী। দাদা-দিদিদের বাদ দিয়ে আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ হলে তাকে একঘরে বা সামাজিক বয়কটে পড়তে হয়। নগ্ন হীন রাজনৈতিক স্বার্থের সংঘাতে এ রাজ্যের সর্বত্র মানবিক সম্পর্কের ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। দলীয় রাজনীতি আজ এ রাজ্যের হাজার হাজার মানুষের পেশায় পরিণত। দল ক্ষমতায় থাকলে টু পাইস কামাই করা যায়। দুর্নীতির পঙ্ক-কুণ্ডে এরা সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত। ঘোমটার নীচে চলছে নির্লজ্জ খেমটা নাচ। মূল্যবোধ চরম বিপর্যস্ত। গণতন্ত্র প্রসারের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি ও মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করে এলাকা দখলের ধৃণ্য রাজনীতি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসেরই নামান্তর। বেতনভুক উর্দিধারী খর্বকায় পুলিশ- প্রশাসনের সহায়তার চলছে অত্যাচার। অপরাধীর কাছেই তার অপরাধের বিচার চাইতে হয়। ফলে 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'।

দল একটা মৌচাকের মত। তলা থেকে শীর্ষ পর্যন্ত অগুনতি মধুর বাসা। সব মৌচাকেই একটি করে মক্ষীরাণী, বেশ কিছু অকর্মণ্য পেট মোটা পুরুষ মৌমাছি, আর হাজার হাজার মধু সংগ্রহকারী শ্রমিক মধু-মাছির দল। মাঝে মাঝে কামড়া-কামড়ি শুরু হয়। বাসা ভেঙ্গে যায়। গড়ে ওঠে নতুন বাসা। মধুলোভে কতরকম প্রাণী যে ভীড় করে তার ইয়ত্তা নেই। সবগুলো মৌচাক যে আলাদা আলাদা, সবগুলিই মধুর ভাণ্ড। নেতা-নেতৃ-কর্মী-সমর্থক সকলেই কমবেশী সেই মধুর ভাগ পায়। এটাই আসল রাজনীতি। এটাই

সত্যিকারের অবস্থা। কোন অবস্থাই চিরস্থায়ী নয়। পরিবর্তনের ঝড়ে এরাও একদিন খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে। ঈশান কোণে কালো মেঘ জমেছে, বিদ্যুতের চমকে যে তারই সংকেত।

সকালবেলা চা খেয়ে ধানক্ষেত দেখতে চলে গিয়েছিল তপোধীর। ক্ষেতের আইলে আইলে ঘুরে ক্ষেতের শোভা দেখছিল। ধানের গোছা নুইয়ে পড়েছে। গিগজ ধানে সবে থোড় এসেছে। অনেকটা গর্ভবতী রমনীর মতো বড়ো হয়ে উঠেছে ধানের গর্ভাশয়। কার্তিকী ধানে রঙ ধরেছে। লক্ষী পূজায় মা ধানের ছড়া বেঁধে ঘরের চালে বেঁধে রাখবে। ধান ক্ষেত দেখে এসে তপোধীর পুকুরের ঘাটে এসে বসেছে। ততক্ষণে অনেক বেলা হয়েছে। তপোধীর বসে বসে এসব কথাই ভাবছিল, আর আনমনে মাঝে মাঝে পুকুরে একটা ঢিল মারছিল। মৌরালা মাছের ঝাঁক পুকুরে ভেসে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ডুব দিচ্ছে - আবাব ঝাঁক বেঁধে ভেসে উঠছে। হিমাদ্রিরা এলে পুকুরে জাল ফেলবে। কতদিন পুকুর থেকে ধবা তাজা মৌরালা মাছের চচ্চড়ি খায়নি তপোধীর। মাকে বলবে সর্ষে বাটা দিয়ে ঝাল ঝাল কবে মৌরালা মাছের চচ্চড়ি করতে।

এমন সময় মা এসে তপোধীরকে ডাক দিল - তপু, উদয়পুব থেকে কাবা আসাব কথা ছিল রে, তারা এসেছে। বৌমা তাদের বসতে দিয়েছে। তোকে ডাকছে। তাড়াতাড়ি আয়।

তপোধীর মায়ের ডাক শুনেই বাড়ি আসে। হিমাদ্রি ও মাধুরী এই প্রথম তাদেব বাড়ি এল। নন্দিতাই সকলের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিল। - বাড়িতে নতুন কবে আনন্দের হিল্লোল।

তপোধীরদের বিশাল বাড়ি, বিরাট উঠোন দেখে জুঁই বেশ বিস্মিত। তিয়াষ জুঁইকে সব ভাই বোনদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সকলেই অবাক হয়ে কেবল জুঁইকে দেখছে। তিয়াষ দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রথম সন্তান। সবদিকেই সেরা বলে সকলেই তিয়াষকে অন্য চোখে দেখে। কাকা-কাকী ও পিসিরাও তিয়াষকে খুব স্নেহ-আদর করে। সকলেই তিয়াষেব পাশে জুঁইকে দেখতে চায়। জুঁই যেন একটা ফুল-পরী। ঠাকুমা জুঁইকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে দেয়। মুহূর্তে পাড়ায় রটে যায়, কবিরাজ বাড়িতে উদয়পুর থেকে একটা ফুল-পরী এসেছে। দলে দলে পাড়ার বৌ-ঝিরা জুঁইকে দেখার জন্য একের পর এক আসতে থাকে। সবাই এসে পলকহীন চোখে জুঁইয়ের পানে তাকিয়ে থাকে। সিনেমায়ও যে এমন সুন্দরী মেয়ে দেখা যায় না। যেমন কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ, তেমনি মিষ্টি একটি মুখ, তারপর মাথায় ঘন কালো একরাশ চুল। যেন সত্যিকারের স্বর্গের অপ্সরাদের মেয়ে।

নন্দিতা মাধুরীকে নিয়ে তার জাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তপোধীররা ছয়

ভাই, তিন বোন। তপোধীর সবার বড়। সারা বাড়িতে আনন্দের ঢল নেমেছে। তপোধীর আসার পর এমনিতেই বাড়িতে আনন্দের প্লাবন বইছে। হিমাদ্রিদের আগমনে বাড়তি আনন্দ যুক্ত হলো। সংগঠনের কাজে হিমাদ্রি কয়েকবার সাব্রুম সদরে এলেও, ছোটখিলে এই তার প্রথম আসা।

ইতিমধ্যে চা এসে গেছে। চা খেতে খেতে তপোধীর হিমাদ্রিকে জিগ্যেস করে - তোমাদের আসতে কোন অসুবিধা হয়েছিল?

হিমাদ্রি - কি যে বলো তপোধীরদা। তোমার নির্দেশ মতো আমরা রানীগঞ্জ বাজারে নামলাম। নেমেই সামনে একজনকে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম - কবিরাজ বাড়ি যাবো, কোনদিকে বলতে পারেন। যাকে জিজ্ঞেস করলাম সে বলল - আইয়েন - তারপর আরো কিছু বলল, ঠিক মনে রাখতে পারলাম না।

তপোধীর অনুমান করতে পারে, কি বলেছে। তারপর বলেছে - তোমায় বলেছে - আইয়েন আঁর হঙ্গে। - ঠিক বললাম তো?

হিমাদ্রি - ঠিক। ঠিক এই কথাই শুনেছি।

তপোধীরের প্রশ্ন - তুমি কিছু বুঝতে পারলে এখন? - শুদ্ধ ভাষায় তর্জমা করলে হবে - আসুন আমার সঙ্গে। বুঝলে? ছোটখিল এসেছো, কিছু নোয়াখালি ভাষা শিখে যাও। কাজে লাগবে। আর তাছাড়া মাধুরী তো আছে। তোমার অসুবিধা হবার কথা নয়। নোয়াখালি মেয়ে বিয়ে করলে হিমাদ্রি। অথচ নোয়াখালি ভাষা বুঝতে পার না, এ তো বড়ো লজ্জার।

হিমাদ্রি - মাধুরী তো দু'একটা নোয়াখালি বলে। কিন্তু অমন টিপিক্যাল নোয়াখালি কোথাও শুনিনি তপোধীরদা। যেমনটা শুনেছি, তেমন হলে দু'দিন নয়, দু'মাসেও শিখতে পারব না।

জুঁই বিলোনীয়া মামার বাড়ি বহুবার গিয়েছে। কিন্তু এমন কথা শুনেনি। তাই এখানকার ছোটদের মুখে অদ্ভুত ভাষা শুনে জুঁইয়ের হাসিই বন্ধ হয় না।

তিয়াষের ছোট্ট খুড়তুতো বোন জুঁইকে বলেছিল - জুঁই দি, হুঁতি হড়েন, হুঁতি হড়েন।

- জুঁই কিছুই বুঝতে না পেরে মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে - মা তিয়াষদার বোন রুমি আমায় বলেছে - জুঁই দি হুঁতি হড়েন-হুঁতি হড়েন। আমায় কি করতে বলেছে মা।

মাধুরীরও পেট ফেটে হাসি বের হয়ে পড়ে - তারপর হাসতে হাসতেই বলে - তোকে শুয়ে পড়তে বলেছে।

জুঁই - মা, আমি একথা আর কক্ষনো ভুলব না। উদয়পুর গিয়ে এবার সবাইকে বলব তিয়াষের ছোট ছোট ভাই বোনেরা কি যে বলে - জুঁই বুঝতেই পারে না।

অন্তু এসে জিজ্ঞেস করে - জুঁই দি - আমনের গো বাড়ি কোন্ আনে?

জুঁই বুঝতে না পেরে তিয়াষকে বলে - ও কি বললো?

তিয়াষ বলে - বুঝতে পারলে না? ও তোমায় বলছে - হ্যোয়ার আর ইউর হাউজ?

জুঁই - আমি শুনলাম, ওরা বাংলা বলছে। তুমি ইংরেজী বলছ কেন?

তিয়াষ - নোয়াখালি ভাষা শেখা থেকে ইংরেজী শেখা অনেক সহজ। তোকে এসব শিখতে হবে না এখন। - তারপর ফোড়ন কেটে বলে - দেওর-ননদের ভাষা শুনে না শেষ পর্যন্ত দেশ ছেড়ে পালাতে হয়।

জুঁই প্রত্যুত্তরে বলে - গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। সে গুড়ে বালি।

পরদিন জুঁইকে নিয়ে ভাইবোনদের সহ তিয়াষ চা বাগান দেখতে যায়। বাবার কাছ থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে যায় তিয়াষ। সবাইকে দাঁড় করিয়ে চা গাছ সহ বেশ কয়েকটা ছবি তোলে। তারপর একসময় সকলকে নিয়ে বাড়ি এসে একটু পরে কৌশল করে জুঁইকে নিয়ে তিয়াষ আবার চা বাগানে চলে আসে। বিভিন্ন পোজে জুঁইয়ের কয়েকটি ছবি তোলে তিয়াষ। আবার জুঁইও তিয়াষের কয়েকটি ছবি ক্যামেরা বন্দী করে রাখে। এই প্রথম তারা নিসর্গ প্রকৃতির নিজস্ব সৌন্দর্য পুঞ্জে আপন মনে অবগাহনের সুযোগ পায়। একটা চা ঝোপের পাশে তারা দু'জন বসে। কিন্তু তাদের হৃদয় মন যে আপনা থেকেই গুটিয়ে আছে। জুঁইয়ের মধ্যেও যে আগের সেই চপলতা আর নেই। দুজনের মনেই অনেক না-বলা কথার ভিড় জমতে থাকে। প্রকৃতির শান্ত নীরবতায় তারাও বড় নীরব। নীরবতাও কি তবে কোন ভাষা? - তিয়াষের তার প্রিয় কবি কৃষ্ণধন নাথের কবিতার কথা মনে পড়ে যায়। একুশের খোঁজে কবিতায় তো এমনই নীরবতার ছবি ফুটে উঠেছে। যে নীরবতা কথা বলে। ভাবতে ভাবতেই দু'জনেই কাঠি দিয়ে লজ্জাবতী লতার পাতা ছোঁয়, পাতাটি গুটিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর জুঁই উঠে দাঁড়ায়। বলে - চল তিয়াষদা। বাড়ি যাই। মা ডাকবে। বলেই জুঁই হাঁটতে থাকে। পেছন পেছন তিয়াষও।

জুঁইয়ের অতর্কিত এই পরিবর্তনের কোন কারণ খুঁজে পায় না তিয়াষ। নতুন জায়গায় এলে কি মেয়েদের অমন পরিবর্তন হয় - কে জানে। তিয়াষ তো ছেলে মানুষ। মেয়েদের মনের কথা ও ভাববে কি করে?

সব কোলাহল শহরে, গ্রামে নেই, তা নয়। আসলে গ্রামের নির্জনতার মধ্যে আছে কোলাহল, আবার শহরের কোলাহলে আছে বিষণ্ণ নির্জনতা। তিয়াষ ভেবেছিল জুঁইকে নিয়ে প্রকৃতির শ্যামকুঞ্জবনে নীরমহলের মতোই হারিয়ে যাবে। কিন্তু হারাতে তো পারলো না। নির্জনতায় হারিয়ে যাওয়া আসলে সহজ নয়।

দু'টি পালক

স্নানের সময় জুঁইকে ডাকে তিয়াষ - চল্ পুকুরে স্নান করতে যাব। পুকুরে সাঁতার কাটবো। ভারী মজা হবে।

জুঁই যায় নি। বলেছিল - তোমরা যাও। আমি মা আর মিষ্টি মাসীর সঙ্গে যাব। তিয়াষ মনে মনে কত আশা করে রেখেছিল যে জুঁই এলে সে খুব আনন্দ করবে। নদীর ধারে নিয়ে যাবে, ধান ক্ষেত দেখাবে - আরো কত কিছু ভেবেছিল। কিন্তু তার উল্টোটাই ঘটছে। জুঁইয়ের সেই উদ্দাম চঞ্চলতা নেই। লজ্জাবতী লতার মতো জুঁই কেমন যেন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। ভাই বোনদের সঙ্গে হৈ চৈ করলেও তিয়াষের সঙ্গে কেমন যেন একটা দুরত্ব রেখেই চলছে। উদয়পুর ফিরে গিয়ে জুঁই হয়তো আগের মতোই স্বাভাবিক ব্যবহার কববে। তাদের দু'জনের মনের কথা যাতে কেউ বুঝতে না পারে - হয়তো এ কারনেই জুঁই এতটা সংযত।

লক্ষ্মীপুজোর পরদিন আর কারো ফেবা হলো না। মা কাউকে যেতে দিল না। বেড়জাল নামিয়ে পুকুর থেকে একটা চৌদ্দ-পনের কেজি ওজনের কাৎলা মাছ তোলা হোল। সঙ্গে প্রচুর ছোট ছোট রূপোর চাকতির মতো মৌরালা মাছ। মাছ দেখে সকলেই খুশী। বাড়ি আনার পর জুঁই আব তিয়াষ মাছটার গায়ে কেবলই হাত বোলাতে থাকে। বাড়িব সকলেই ভালো রাঁধুনী। আয়োজনও প্রচুর। মা মৌরালা মাছেব চচ্চড়ি ও পাতুড়ি করেছে। নন্দিতা আর মেজ বৌ মিলে মাছ কালিযা। - বিকেলে আস্ত একটা পাঁঠা কাটা হোল।

ঠাকুমা জুঁই-তিয়াষকে মাছ ধরেছে দেখে ডেকে বললো - হাতে গন্ধ কইরবো রে। মাছ গাঁডিছনা। সাবান দি হাত ধুই হ্যালা, অন গা হুকুরে যাইছ না। জল গাইন মাছ ধইরছে যে ঘোলা অই গ্যাছে। টেঙ্কির জল দি চান করি হ্যালাইছ। - তিয়াষ কথাগুলো বুঝলেও জুঁই দু'একটাব বেশী বুঝল না।

বহুদিন পর দাদা-বৌদি বাড়ি এসেছে শুনে সব বোন, বোন-জামাইদেরও খবর দিয়ে আনা হয়েছে। অনেকদিন পব সব ভাইবোনরা একত্রিত হওয়ায় আনন্দের এক জোয়ার বইছে। পুরো বাড়ি জম-জমাট। ভাই বোন ও তাদের ছেলেমেয়ে জামাই-বৌ মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন। তপোধীরের বাবা বেশ কয়েকবছর হলো গত হয়েছেন। সংসারে মা আছেন। মায়ের জন্য তপোধীরকে মাঝে মাঝে আসতে হয়। সন্ধ্যায় বাড়িতে জলসার আসর বসে। তপোধীরদের বিশাল উঠান। উঠানে একটা সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। পাড়া শুদ্ধ লোক হাজির। তিয়াষের এক কাকা মূর্তি-শিল্পী আবার কবিয়াল। মনসা মঙ্গল ও গাজনের গানও চমৎকার গায়। তার মেজো কাকাও গাইতে পারে। প্রথমে গাজন গান, তারপর মনসামঙ্গল। এরপর নন্দিতা ও মাধুরী একক ও দ্বৈতকণ্ঠে একের পর এক গান

শুনিয়ে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিল। জুঁই আর তিয়াষও তাদের মিষ্টি গলায় দুটি করে চারটি এবং দ্বৈত কণ্ঠে একটি রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করল। সবশেষে জুঁই তার নাচ দেখিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিল। আসর ভাঙ্গার পর খাওয়া-দাওয়া গল্প গুজবে মাঝরাত পেরিয়ে গেল। একসময় মনে হয়েছিল কোন বিয়েবাড়ির অধিবাস রাত্রি। কয়েক ঘন্টা ঘুমের পরই সবাই জেগে উঠল। অশ্রু ও বিষণ্নতা পেছনে ফেলে ভোরের গাড়িতে সবাই চলে এলো। সরকারী কর্তব্যের দায়-বদ্ধতার কাছে মানবিক স্নেহ-মায়া-বন্ধনের কোন মূল্যই নেই। কোন দায়িত্বশীল মানুষ তার উপর ন্যস্ত কর্তব্যের দায় এড়িয়ে চলতে পারে না।



দিনগুলি এক এক করে চলে যায়। এরই মধ্যে ফুবিয়ে গেছে পুজোব ছুটি। পুরোদমে ক্লাশ চলেছে। পবীক্ষার জোর প্রস্তুতি । স্কুল থেকে আসা-যাওয়াব পথে তিয়াষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হলেও কারোরই কথা বলার ফুরসৎ মিলছে না। জুঁই ও কেমন অবাক করাব মতো বদলে গেছে। আগের সেই চপল দুরন্ত জুঁই কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এখন আব এক জুঁই। পদ্মপুকুরে পদ্মের মতো যে ভেসে বেড়াতো কোথায সেই জুঁই, সারাক্ষণ তিয়াষের সঙ্গে খুনসুটি করতো যে জুঁই - সে এখন কোথায়? এ জুঁইকে সে চেনে না, কেমন শান্ত, আত্ম মগ্ন। পরীক্ষার পর এক ছুটির দিনে তিয়াষ জুঁইদের বাসায় গেল। তিয়াষ সরাসরি জুঁইদের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে ডাক দেয় - রাঙ্গা মাসী, ও রাঙ্গা মাসী -

জুঁই তিয়াষের ডাক শুনে এগিয়ে আসে। বলে - মা বাড়ি নেই তিয়াষদা, এসো - ঘরে এসে বসো। মা এক্ষুনি এসে পড়বে। সোফায বসতে বসতে তিয়াষ বলে - কাকু কোথায়?

জুঁই - বাবা ঘরে থাকে নাকি? তুমি জান না? খেয়েই তো বেরিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই সমিতি ঘরে। রাত সাতটা-আটটার আগে কি বাবা কখনো বাড়ি ফেরে?

তিয়াষ - রাঙ্গা মাসী কোথায় রে?

দু'টি পালক

জুঁই - আজ ক'দিন কাজের মাসী আসছে না, খবর নিতে গেছে।

তিয়াষ সোফায় বসলেও, জুঁই কিন্তু আগের মত তিয়াষের পাশে না বসে একটু দূরে খাটের উপর গিয়ে বসে। তারপর বলে - তোমাদের সাব্রুমের বাড়ি থেকে আসার পর এই কিন্তু আমাদের বাসায় এলে। - কেমন আছ তিয়াষদা। তোমার পরীক্ষা কেমন হয়েছে?

তিয়াষ - আমি ভালো আছি। আমার পরীক্ষাও ভালো হয়েছে। তোর খবর বল্।

জুঁই - অংক আর ইতিহাসটা একটু খারাপ হয়ে গেল। বাকীগুলো ভালোই।

কমপিটিশন তো খুব বেশী। ফল না বেরুলে বুঝবো না।

তিয়াষ আর কোন কথা বলে না। ভাবে। জুঁই গত ক'মাসে কেমন যেন বদলে গেছে।তিয়াষ যেন এক দূরতর দ্বীপ - আর জুঁই যেন সুদূর আকাশের ছায়াপথের ওপারের কোন এক নক্ষত্র - যে তার কাছ থেকে শত শত আলোক বর্ষ দূরে।

জুঁই ভাবছে আরেক কথা। তিয়াষদাকে নিয়েই তো সারাজীবন কাটাবে জুঁই। সে যে তিয়াষকে ছাড়া বাঁচবেই না। কিন্তু সে যে দুরন্ত কৈশোর পেরিয়ে এক পূর্ণ যৌবনা নারী। তার যৌবনে যে যৌবনের ফুল ফুটেছে। কয়েক মাস আগে ঘুমের মধ্যে অতর্কিতে তার পরিধেয় বস্ত্র ভিজে গিয়েছিল, ঘুমের মধ্যেই উঠে বসে জুঁই। আলো জ্বেলে বিছানায় রক্ত দেখে আঁৎকে ওঠে। সারা শরীর কাঁপতে থাকে। তারপর মাধুরীকে ডাকে - মা - মা, দেখতো আমার কী হয়েছে? - মাধুরী ঘুম থেকে জেগে ওঠে। হিমাদ্রিও। মাধুরী দেখেই বুঝতে পারে। হিমাদ্রিকে বলে - যাও। কিছু হয়নি। - হিমাদ্রি মাধুরীর কথার ইঙ্গিত বুঝে ঘুমিয়ে পড়ে। মাধুরী মেয়েকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে পরনের সব কাপড়-চোপড় পাল্টে দেয়। তারপর প্যাড বেঁধে দেয়। পরপর দুইদিন মেয়েকে আর স্কুলে পাঠায়নি মাধুরী। সেই থেকে প্রতিমাসেই কয়েকটা দিন জুঁইকে বড়ো অস্বস্তিতে কাটাতে হয়েছিল। এখন ধীরে ধীরে সবই স্বাভাবিক হয়ে গেছে - জুঁই তার নতুন জাগ্রত চেতনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। জুঁই ধীরে ধীরে বুঝে গেছে যে সে এখন আর কিশোরী নয়, যুবতী। এক কুসুমিতা নারী। এই অনিষ্ঠুর নীরব রক্তপাতই একটি কিশোরী মেয়েকে করে তোলে যুবতী রমণী। এরই মধ্যে রয়েছে নারী জন্মের সার্থক পরিচয়। এরপর জুঁইয়ের দেহে-মনে ও এসেছে বিপুল পরিবর্তন। এই সময় থেকেই মেয়েদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে। জুঁই এখন সতর্ক। স্নাতক। দ্বিতীয় জন্মের কারণে দ্বিজ। উপবীত ধারণ করে যেমন মানুষ দ্বিজত্ব অর্জন এও যেন তেমনই। এ যেন নারীর আত্ম উপনয়ন। মেয়েদের জীবনের এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। প্রতিটি নারীকেই এই সময় থেকে সংযমী হতে হয়। মাধুরীও মেয়ের ব্যাপারে সদা সচেতন। এখন মেয়েকে যে চোখে চোখে রাখতে হয়।

জুঁই যে তিয়াষকে তার নারী জীবনের এই গোপন কথা বলতে পারে না। সে যে

তিয়াষের থেকে দূরে বসে রয়েছে, তাতে যে তিয়াষের কাছে একটা ভুল বার্তা যাচ্ছে, তা তো ঠিক। কিন্তু জুঁইয়ের তো আর কোন উপায় নেই। অসতর্ক হওয়াতো নারী জীবনের ধর্ম নয়। মেয়েদের এই আত্মসচেতনতা সহজাত। পুরুষদের চেয়ে যে নারীদের জীবনের বাঁকে বাঁকে অনেক বেশী বিপদ লুকিয়ে থাকে। মেয়েদের রূপ-যৌবন এবং নরম মংসপিণ্ড খুবলিয়ে খুবলিয়ে রক্তাক্ত করার জন্য শ্বাপদের অভাব নেই। ঐশ্বরিক মহিমার মতোই নারীকে তার রূপ-যৌবন প্রকটিত না করে সদা সর্বদা সংবরণ করে রাখা উচিৎ। অন্তরের চিরন্তন মাধুর্যই নারী জীবনের প্রকৃত ঐশ্বর্য। আপন ভালোবাসার মানুষ যাতে কোনদিন বিপথগামী হতে না পারে, নারীকেই তার নিশ্চয়তা প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। জুঁইয়ের এই আচরণে তিয়াষ কেমন দমে যায়। সে তো এখন প্রায় সবই বোঝে। কিন্তু জুঁইয়েব এমন অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে তিয়াষ কেমন হতবাক। সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। নীরবতা ভঙ্গ করে তিয়াষ বলে - জুঁই, তুই যেন কেমন হয়ে যাচ্ছিস্? আমি ঠিক তোকে বুঝে উঠতে পারি না।

জুঁই - তিয়াষ দা, আমি একটুও বদলাই নি। মেয়েদের সব কথা যে আপন জনকেও বলা যায় না। মেয়েদের নারীত্বই যে সব। নারীর যে এ বড়ো গোপন অমূল্যধন। এ ধন লুট হলে যে তার আর কিছুই থাকে না। আমি এখন আগের জুঁই নেই তিয়াষ দা। আমি যে এখন অন্য এক নতুন জুঁই। এ জুঁই ও যে তোমারই। তুমি এ জুঁইকে শুধু আঁখি দিয়ে দেখবে, হৃদয় দিয়ে ভালোবাসবে, কিন্তু স্পর্শ করে কখনো মলিন করবে না। তাহলে দেখবে তোমাব জুঁই, একদিন তোমারই হবে। মেয়েদের সব কথা জানতে চেয়ো না তিয়াষ দা। সব কথা যে বলা যায় না।

তিয়াষ - তোর কথা আমার কেমন হেঁয়ালীর মতো লাগছে রে, জুঁই।

জুঁই - তোমার যেমনই লাগার লাগুক, আমি যা বলছি তা মিথ্যা নয়। আমার হৃদি পদ্মদলে তোমার মর্মর মূর্তি ছাড়া আর কোন দেবতারও ছবি নেই। আমাকে আমার মত করে বাঁচতে দাও, তাহলেই তুমি আর আমি কোন একদিন সত্য সত্যই আমরা হয়ে উঠবো। সময় তো দাঁড়িয়ে থাকে না। সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সময়ের স্রোতে ভাসতে জানতে হয়, না হলে কে কোথায় হারিয়ে যাবে কে জানে! - তুমি একটু বসো তিয়াষ দা, আমি এক্ষুনি আসছি।

তিয়াষ আসলেই বড় বোকা। হ্যাংলার মত মেয়েদের কথা জানতে চাইছে। গোপন কথা তো থাকতেই পারে। মৌর কথা কি সে কখনো জুঁইকে বলতে পেরেছে। পারেনি। জুঁইয়ের সঙ্গে তো তার একটা গভীর গোপন সম্পর্ক আছে। তিয়াষ তো সে কথা কাউকে বলতে পারে নি। বলতে পারবেও না। কৈশোরে কী কোন প্রেম হয়? কৈশোর প্রেমের কি

কোন স্থায়িত্ব থাকে? কৈশোর প্রেমের সমাজ স্বীকৃত কোন রূপ নেই। সমাজের এ এক বিরূপ নিষ্ঠুরতা। কিশোর-কিশোরীর কী কোন চাওয়া-পাওয়া থাকতে পারে না? কৈশোর তো ফুলের কোরকাবস্থা। ডালে কুঁড়ি না জাগলে ফুল কি ফুটতে পারে? কৈশোর প্রেম তো ফুল কুঁড়ির মতো। আর ফুল, সে তো ঝরা বকুল।

ভাবনায় ছেদ পড়ে তিয়াষের। এমন সময় মাধুরী ফিরে আসে। ঘরে ঢুকে দেখে তিয়াষ একা বসে।

তিয়াষকে দেখে মাধুরী বলে - কখন এলি রে তিয়াষ?

তিয়াষ - অনেকক্ষণ হলো তো। তুমি কোথায় গিয়েছিলে রাঙ্গা মাসী?

মাধুরী - আর বলিস না। কাজের মাসীটা না আজ ক'দিন আসছে না। অনেক খোঁজাখুঁজি করে বাড়ি বের করেছি। গিয়ে দেখি বাড়িতে নেই। বোনঝির বিয়েতে গিয়েছে তেপানিয়া। কবে আসবে ঠিক নেই। - জুঁই কোথায় রে?

তিয়াষ - এতক্ষণ তো এখানেই ছিল। আসছি বলে ভেতরে গেল। কিছু একটা করছে হয়তো।

মাধুরী - তোর বাবা আর আসেনি রে? তোর মা কেমন রে? অনেকদিন খোঁজ খবরও নিতে পারছি না। টেলিফোনটা ক'দিন ধরেই নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। ঠিক করার জন্য বলেছি। এখনো ঠিক করলো না। সামনের সপ্তাহে তো তোদের রেজাল্ট দেবে শুনেছি।

তিয়াষ - রাঙ্গা মাসী, তোমরা যাও না কেন গো। আমরা এখান থেকে চলে গেছি বলে পর হয়ে গেলাম?

মাধুরী তোরা কি আমাদের পর হতে পারিস রে?

তারপর মাধুরী মনে মনে বলে - শিব ঠাকুরের কাছে মানত করে কবেই তো জুঁইকে তোর হাতে সঁপে দিয়েছি। তোরা একদিন বড় হবি। সেদিন তোদের চার হাত এক করে দেবো। তোদের চার চক্ষুর মিলন হবে। সে দিনের জন্যই তো ঠাকুরের কাছে রোজ প্রার্থনা করছি। - কথাগুলি বলেই মাধুরী ঠাকুরের উদ্দেশ্যে দুই হাত জোড় করে প্রণতি জানায়।

তিয়াষ রাঙ্গা মাসী, কার উদ্দেশ্যে প্রণাম করলে গো?

মাধুরী - রোজই একবার ঠাকুরকে প্রণাম করি রে। আমার মনের গোপন বাসনার কথা জেনে তুই কি করবি? ঠাকুরের কাছে প্রার্থনার কথা তো কাউকে বলতে নেই রে। বললে যে তা ফলে না। - বলেই তিয়াষের পাশে বসে তিয়াষকে বুকে জড়িয়ে ধরে মাধুরী। তিয়াষও নিজের মায়ের মতোই রাঙ্গা মাসীর বুকে গভীর আবেগে মাথা রাখে। - মাধুরী

তিয়াষের মাথায় পরম স্নেহভরে হাত বুলিয়ে দেয়।

এমন সময় জুঁই তিয়াষের জন্য একটা ট্রেতে খাবার নিয়ে এসে দিতে গিয়ে দেখে মা, তিয়াষকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে।

জুঁই ট্রেটা টেবিলের উপর রেখে বলে - ঢং। বুড়ো ধাড়ী ছেলেকে আবার আদর। আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনে। দ্যাখো না কেমন আদর খাচ্ছে। লজ্জাও করে না।

তিয়াষ - রাঙ্গা মাসী। তুমি যে আমায় আদর করছ - তা মহারানীর কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না। হিংসুটে মেয়ে। - আহা হা কিংশুক - ভারী হিংসুক - বলেই গানের সুরে গেয়ে ওঠে তিয়াষ।

জুঁই - আমি হিংসুটে না? হিংসা না ছাই? আহ্লাদ যেন আকাশ থেকে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির মত ঝরে পড়ছে।

মাধুরী - আমি আমার ছেলেকে আদর করছি, তোমার বাপু এত কথা বলার দরকার কি?

তিয়াষ মাধুরীর বুক থেকে মাথা তুলে একটু সরে বসে। জুঁই এই সুযোগেই মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে। মাধুরীও মেয়েকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমো খায়। তারপর বলে - তুইও তো এখন অনেক বড় হয়েছিস্। - তারপর এক হাতে জুঁই, আর এক হাতে তিয়াষকে ধরে বলে - তোরা দু'জনেই যে আমার প্রাণ পাখিরে। তোদের দু'জনকে নিয়ে আমাদের দুই পরিবারের অনেক স্বপ্ন - অনেক প্রত্যাশা।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মাধুরী অনেকটা ইচ্ছে করেই আদরের ছলে তিয়াষ এবং জুঁইয়ের হাত দুটো নিজের হাতের মুঠোয় একসঙ্গে ধরে বলে - ঠাকুরের কাছে আমার প্রার্থনা তোরা যেন সারা জীবন সুখে থাকিস্। বলেই মাধুরী আবেগের আনন্দে কেঁদে ফেলে। দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

তিয়াষ ও জুঁইয়ের গালে গাল লেগে থাকে। তাদের চোখেও আবেগের বাস্প ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। তিয়াষ ও জুঁই দু'জনেই প্রথম হয়ে যথাক্রমে নাইন ও সেভেন উঠেছে।

তপোধীর আগেই ঠিক করে রেখেছিল যে তিয়াষ নবম শ্রেণীতে উঠলেই তাকে আগরতলার কোন ভালো স্কুলে ভর্তি করাবে। নন্দিতা ইতিমধ্যে মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে বদলী হয়ে এসেছে। তিয়াষ উমাকান্ত একাডেমীতে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। তারা ধলেশ্বরে কেন্দ্রীয় কারাগারের কাছে একটা বাড়ি ভাড়া করেছে। ইংরেজী

বছরের শুরু। বাসা পরিবর্তন ও সবকিছু গুছিয়ে নেবার জন্য তপোধীর দশদিনের ছুটি নিয়েছে। তপোধীরের ছোট ভাইয়েরা এসেছে। মালপত্র নিয়ে আসার ব্যাপারে তারাও অনেক সাহায্য করেছে। মালপত্র সব ট্রাকে তুলে দিয়ে তপোধীর নন্দিতা ও তিয়াষকে নিয়ে হিমাদ্রিদের সরকারী আবাসে বিদায় নেবার উদ্দেশ্যে দেখা করতে গেল।

তপোধীর হিমাদ্রিদের কোয়ার্টারে ঢুকেই জুঁইকে ডাকে - মামনি কোথায় রে, এদিকে আয়।

জুঁই সকাল থেকেই বিছানায় শুয়ে বুকে বালিশ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। তপোধীরের ডাক শুনে জুঁই এবার জোরে কেঁদে ওঠে। বিছানার কাছে গিয়ে জুঁইকে জোর করে তুলে আনে তপোধীর। জুঁই এবার তপোধীরের বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদেই চলে। তপোধীর তাকে আদর করতে করতে বলে - দূর পাগ্‌লি মেয়ে, কাঁদছিস কেন? আমরা এই দেশ থেকে চলে যাচ্ছি নাকি রে? উদয়পুর-আগরতলা তো একঘন্টা-সোয়া ঘন্টার রাস্তা। যখন খুশী বাবা-মা সহ চলে আসবি। আমরাও আসবো।

তিয়াষের চোখ ছলোছলো। নিজেকেও সে সংবরণ করতে পারে না। তাদের বাসায় তারা বেশীক্ষণ বসলো না। তিয়াষ হিমাদ্রি ও মাধুরীকে প্রণাম করে। জুঁই ও তপোধীর ও নন্দিতাকে প্রণাম করে। নন্দিতা জুঁইকে বুকে নিয়ে আদর করে দেয়। মাধুরী ও নন্দিতা দু'জন দু'জনকে ধরে এক প্রস্থ অশ্রু মোচন করেছে। হিমাদ্রি ও তপোধীরের মনেও গভীর বিষাদের ছায়া। পরস্পর পরস্পরের কাছে বিদায় নিয়ে তারা ট্যাক্সীতে উঠে বসে। জুঁই বা তিয়াষ কেউই কাউকে আজ এই বিদায় বেলায় কোন কথা বলতে পারে নি।

ট্যাক্সী ছেড়ে দেবার সময় কান্না জড়ানো গলাই জুঁই তিয়াষকে উদ্দেশ্য করে বলে - তিয়াষদা, মাঝে মাঝে এসো। বলতে বলতেই তার গলা ভারী হয়ে ওঠে। দুচোখে নামে অশ্রুধারা। তিয়াষ তার হাত বের করে হাত নাড়ায়। ট্যাক্সী ধনীসাগরের পথ ধরে ধীরে ধীরে চলতে থাকে। পেছনে পড়ে থাকে রাশি রাশি স্মৃতি।

আসার আগে তিয়াষ তার বন্ধু সোহম ও পলাশের সঙ্গে দেখা করেছে। মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের আশীর্বাদ নিয়ে এসেছে, তাদের প্রণাম করেছে। মৌলি দিদিমণি তিয়াষকে অনেকক্ষণ বুকে জড়িয়ে ধরে রেখে নীরবে কেঁদেছে। মিলিদিদের বাড়ির পরিবেশ আগের মতো নেই। জেঠিমা আঘাত সামলে উঠলেও প্রায়শই নিভৃতে বসে সকলের অলক্ষ্যে একা একা কাঁদে। মিলিদি পড়াশুনায় বেশ উন্নতি করেছে। টেস্ট পরীক্ষায় প্রথম পাঁচজনের মধ্যে উঠে এসেছে। তিয়াষ মৌদের বাড়ি গিয়ে মৌয়ের সঙ্গেও দেখা করে এসেছে। তিয়াষ আসার সময় মৌ অশ্রুভরা চোখে তার পথের পানে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। মৌ ভালোই জানে যে - তিয়াষ চিরকালই জুঁইয়ের। সব জেনেও মৌ তিয়াষকেই

ভালোবাসে। কোনদিন পাবে না জেনেও তিয়াষ ছাড়া আর কাউকে মনে ঠাঁই দিতে পারে না মৌ।

আসবার আগে তিয়াষ এক সন্ধ্যায় ধনীসাগরের পাড়ে দাঁড়িযে নিজের ফেলে আসা কৈশোরের দিনগুলিকে খুঁজেছিল। সেই ধনী সাগরের জল, যেই জলে রাশি রাশি শ্বেত পদ্ম ফোটে, যে জলে জুঁই সাঁতার কাটে, যে জলে জুঁইয়ের গায়ের সৌরভ মিশে থাকে - সেই জল স্পর্শ করে তিযাষ বলেছিল - হে কোটি কোটি জল বিন্দু, রাশি রাশি ঝরে পড়া পদ্ম ফুল - তোমরা আমার জুঁইকে দেখো। আকাশের পানে তাকিয়ে বলেছিল - হে চাঁদ - হে অগণিত তারা - তোমরা আমার জুঁইকে দেখো। গাছ-গাছালি, শিউলি ফুল - নাগকেশর - দোলন চাঁপা - তোমরা আমার জুঁইকে দেখো।

বিশ্রামগঞ্জ পেরিয়ে ট্যাক্সী এখন দ্রুততর হয়েছে। তপোধীর ও নন্দিতার বিষন্নতা এখনো কাটেনি। তিয়াষ সামনের সীটে। এক দৃষ্টিতে পথের পানে চেয়ে থাকে। পথ পেছনে এঁকে বেঁকে শায়িত। মানুষ পেছনে যা ফেলে আসে তার সবটাই কি পথ? মানুষ জীবনভর যা জমায় তা সবই জঞ্জাল, আর যা ফেলে আসে - সেইটাই পথ।

নতুন বাড়িতে সব কিছু গুছিয়ে নিতে কেটে যায় কয়েকটা দিন। সংসারের কাজের জন্য একটা ঠিকা ঝি পেয়েছে। মেয়েটির স্বামী মেয়েটিকে ফেলে কোথায় যেন চলে গেছে। মেয়েটির নাম ময়না। সঙ্গে একটা ছোট বাচ্চাও আছে। মেয়েটি বিশ্বাসী। সকালে আসে, বিকেলের কাজ করে দিয়ে চলে যায়। ইন্দ্রনগরে বাসা ভাড়া কবে থাকে। তিয়াষেব পড়ার চাপ বেড়েছে। নন্দিতার স্কুল। তিয়াষের মাষ্টার বাড়ি দৌড়াদৌড়ি। বাবা তিয়াষকে একটা বাই-সাইকেল কিনে দিয়েছে। তপোধীর সোনামুড়ার পাট চুকিয়ে জেলা শাসকের অফিসে বদলী হয়ে এসেছে। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে তিয়াষকে নিয়ে প্রত্যাশার পারদ চড়তে শুরু করেছে। তার অসাধারণ মেধার পরিচয় পেয়ে সকলেই বেশ উল্লসিত। এখানে এসে তার দু'জন বন্ধু জুটেছে। একজন সায়ন, অন্যজন তৃপন। সায়নদের বাড়ি কৃষ্ণনগর ঠাকুর পল্লী রোড। সায়নের বাবা অতনু দেববর্মা। তার বাবার মতোই একজন সিভিল সার্ভিস অফিসার। সায়নের মা বাঙ্গালী ঘরানার মেয়ে। বাবা রাজবাড়ির বংশধর। তৃপনের বাবা নেই। মা মহাকরণ কর্মচারী। এখন পর্যন্ত তৃপনই প্রথম এবং সায়ন স্কুলের দুই নম্বর ছাত্র। তিয়াষ পরীক্ষায় সকলকে পেছনে ফেলে সেরার আসন দখল করে নিল।

উদয়পুর যাওয়া হয়তো কোন সমস্যা নয়। তবু মানুষের প্রয়োজন না হলে যে মানুষ বাড়ির এ ঘর থেকে ও ঘরেও যায় না। এখানে আসার পর বেশ কিছুদিন তিয়াষের মনটা প্রবল শূন্যতায় কেবলই খাঁ খাঁ করতে থাকে। একটা স্বজন হারানো বেদনা সারাক্ষণ তিয়াষকে পীড়া দিতে থাকে। তার জীবনের সবকিছুই যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। নিজেকে

নিজের মধ্যে খুঁজে পেতে ও আপন সত্তায় স্থিত হতে তিয়াষের অনেক সময় চলে যায়।

তিয়াষরা যে বাড়িটি ভাড়া নিয়েছে, সেই বাড়ির মালকিন এখানে থাকে না। দোতালা বাড়ির নীচের ঘরে তারা থাকে। মালকিন দোতালায় থাকে। মহিলার এক ছেলে - এক মেয়ে। মেয়েটির কলকাতায় বিয়ে হয়েছে। ছেলে ইলেকট্রনিক্স্ ইঞ্জিনীয়ার। চেন্নাইতে বহু জাতিক কোম্পানীতে কাজ করে। মহিলা বেশীর ভাগ সময় ছেলের কাছেই থাকে। বছরে একবার বাড়ি আসে। দু'তিন মাস থেকে আবার চলে যায়। ফলে তিয়াষরা নিজের বাড়ির মতই থাকে।

রেজাল্টের পর হিমাদ্রি সপরিবারে পঁচিশে ডিসেম্বরের ছুটির দিনে তপোধীরদের বাসায় এসে বেড়িয়ে গেছে। রাত কাটায়নি। সন্ধ্যা নাগাদ আবার উদয়পুর ফিরে গেছে। জুঁই দেখতে আগের থেকেও সুন্দর হয়েছে। মাথাভর্তি কোঁকড়ানো কালো চুলে জুঁইকে দেখতে স্বর্গ সুন্দরীদের মতো মনে হয়। ভাদ্রের ভরা গাঙ্গের মতো সারা দেহে যৌবনের লাবণ্য ঝরে পড়ছে।

এখানে আসার পর তপোধীর একবার মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে সাব্রুম গিয়েছিল। এরপর মাকে বাসা বাড়িতে নিয়ে আসে। মা তপোধীরের কাছে থাকলে, সংসারটিকে তার কাছে স্বর্গ মনে হয়। কিন্তু মা এখানে বেশীদিন থাকতে চায় না।

তপোধীর ও নন্দিতা সারাক্ষণ ছেলের পেছনে পড়ে থাকে। তিয়াষের পড়াশুনোয় কোনরকম শিথিলতা ছিল না। ফলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বোর্ডের পরীক্ষায় প্রথম হলো তিয়াষ এবং রেকর্ড মার্কস পেয়ে। জুঁইও উদয়পুরের রমেশ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বোর্ডের পরীক্ষায় প্রথম। ফল প্রকাশের পর দুই পরিবারেই আনন্দের হিল্লোল। তিয়াষ জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষায় পিসিবি ও পিসিএম্ উভয় গ্রুপেই প্রথম। তপোধীর ও নন্দিতার ইচ্ছা তিয়াষ দেশের কোন সেরা কলেজে ডাক্তারী কিংবা ইঞ্জিনীয়ারিং কোর্স নিয়ে ভর্তি হোক। তিয়াষ গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসতে চাইল না। সে বেঁকে বসল। সে বলল - আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে পড়ব।

-তাকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা হলো। কিন্তু সে তার সিদ্ধান্তে অবিচল। তপোধীর শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তিয়াষকে প্রেসিডেন্সি কলেজেই ভর্তি করে দিল। তিয়াষের পথ ধরেই জুঁইও উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম হয়ে কলকাতার লেডি ব্রেবোন কলেজে ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে ভর্তি হোল।

কৈশোর প্রেমের দুরন্ত ঘূর্ণির দিনগুলো পার হয়ে যৌবনের ভেলায় পাল তুলে তারা ভেসে বেড়াতে লাগলো। এখানে নিষেধের কোন বন্ধন নেই। গ্রাম কিংবা আধাশহরের পরিচয়ের কৌতূহলী দৃষ্টির ভ্রূকুটি নেই। তারা এখন বিশ্বের অন্যতম মহানগর কলকাতার

অভিবাসী। এখানে শুধু প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির প্রতিযোগিতা। এখানে গতি আছে স্থিতি নেই, প্রীতি আছে স্বস্তি নেই, প্রেম আছে, হাসি নেই। বিস্ময়-বিভ্রান্তির অদ্ভুত যুগলবন্দী। বড় খেয়ালী এই মহানগর। একরাতেই এখানে কেউ ফকীর বনে যায়। আবার কেউ আমীর। এখানে নিঃশেষ এবং অশেষ হওয়ার সব উপকরণই অবাধ। সবকিছুই এখানে হাতের কাছে পাওয়া যায়। চাকভরা মধু আর বিষাক্ত হুল - দুইই পাওয়া যায়। মিছিল নগরী কলকাতা, আবার এখানেই নিত্য চলছে সংস্কৃতির নান্দীপাট। বৃহতের ধর্মই মহত্ব, মহত্বের ধর্ম ত্যাগ। মিথ্যা, প্রতারণা, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই, তোলাবাজি, প্রমোটারীরাজ, ঠক, জোচ্চোর, বাটপার - সবই আছে কলকাতায়। এখানে আকাশে চাঁদ আছে, কিন্তু পেলব মাটির ছোঁয়ায় জোছনার মিঠে আমেজ এখানে নেই। মহানগরীরর দুরন্ত গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে তারা এখনো চলতে শেখেনি।

নাগরিক জীবনের বাইরে ত্রিপুরার ছোট এক মফঃস্বল শহরে দুইটি কিশোর-কিশোরীর মনে প্রেমের যে ছোট্ট কুঁড়ির উন্মেষ ঘটেছিল, মহানগরীর হাজার ব্যস্ততার মাঝে তা ক্রমশঃ পাপড়ি মেলে চলেছে। তারা দুজনেই হোস্টেলে থাকে। তিয়াষ হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে, জুঁই পার্ক সার্কাস। ছুটির দিনে তাদের সাক্ষাৎ হয়। কফি হাউজে বসে কফি খায়, আড্ডা দেয়। তারা দু'জন কফি হাউজে ঢুকলে সকলেই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে। ইতিমধ্যে তিয়াষের দুইটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যিক মহলে বই দুটির বেশ প্রশংসা বেরিয়েছে। তিয়াষের লেখা নামী-দামী পত্রিকায়ও প্রকাশিত হচ্ছে। এ ছাড়া প্রেসিডেন্সির সেরা ছাত্রদের তালিকায় তিয়াষের নাম উঠে যাওয়ায় সকলে যথেষ্ট সমীহ করে। জুঁইয়ের অপরূপ রূপ লাবণ্যে ছেলে-বুড়ো সকলেরই চোখ ট্যারা হয়ে যায়। তারা কখনো নন্দন চত্বর, কখনো ভিক্টোরিয়া কিংবা দক্ষিণেশ্বর, দীঘা, শান্তি নিকেতন ঘুরে বেড়ায়, আর রচনা করে চলে আকাশ-কুসুমের মালা।

ছুটির দিন। বেলা থাকতেই মেট্রোতে চেপে দু'জনেই রবীন্দ্রসদন স্টেশনে নেমে পড়ে। তারপর পায়ে হেঁটে ঢুকে পড়ে নন্দন চত্বরে। কিন্তু কলকাতার ভীড়ে তাদের দু'জনেরই বড়ো অস্বস্তি। একটা নিরিবিলি বসার জায়গার সন্ধানে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে। জোড়ায় জোড়ায় যুবক-যুবতী দুপুর থেকেই নন্দন থেকে রবীন্দ্রসদন পর্যন্ত সব জায়গাই দখল করে বসে আছে। চলতে চলতেই তারা বুঝতে পারে যে জোড়া ভেঙ্গে কারোরই ওটার কোন তাড়া নাই। এদের দেখে মনে হয় -

সমাজ সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে

দু'টি পালক

হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব -
আঁধারে মিশে গেছে আর সব।

তাদের জায়গাটাও মন্দ নয়। কিন্তু পথচলতি মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে বসে থাকতে তাদের বড়োই অস্বস্তি হচ্ছিল। শেষ অব্দি নন্দন চত্তর ছেড়ে টিকিট কেটে ভিক্টোরিয়ার প্রাঙ্গনে ঢুকে পড়ে। বিকেলের দিকে এখানে ভীড় বেশ কম থাকে। তারপর লেকের ধারে ছায়াছন্ন একটা নাগকেশরের নিভৃত ছায়ায় দু'জন মুখোমুখি হাতে হাত রেখে বসে থাকে। সময়ের দিকে তাকিয়ে দেখে সময় এখানে স্থির।

কোন কথা খুঁজে না পেয়ে জুঁই বলে - নীরমহলের সেই ঘটনার কথা তোমার মনে পড়ে?

তিয়াষ - তোর জন্য জীবনে প্রথম কানটানা খেলাম। মনে পড়বে না?

জুঁই - আমি যে তোমার জন্য খেলাম, তাতে বুঝি কোন দোষ নেই?

তিয়াষ - তোর জন্যই আমি আমার ভাবী স্ত্রীর সামনে কানমলা খেয়েছি, সে অপমানের কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না।

জুঁই - ইস্, আমার যেন কোন মান সম্মান ছিল না। তুমি কিন্তু মিছে কথা বলবে না। আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমনোর কথা কে বলেছিল? আমি না তুমি?

তিয়াষ - আমিই বলেছি। তাতে কি দোষটা হলো? তুই রাজী হলি কেন?

জুঁই - রাজী হয়েছি, সুযোগ পেলে প্রতিশোধ নেব বলে।

তিয়াষ - কি করে প্রতিশোধ নিবি?

জুঁই - দেখবে - কি করে প্রতিশোধ নিতে হয়। তবে দেখ। বলেই জুঁই তিয়াষকে কোন সুযোগ না দিয়ে তিয়াষের কোলে মাথা রেখে আকাশের পানে তাকিয়ে চোখ বোঝে। জুঁই মনে মনে প্রতীক্ষা করছে তিয়াষ কখন তার মাথা রাখবে তার বুকে। তার সমস্ত সত্তা নিংড়ে নিজের সত্তায় লীন করে দেবে। বহু বছর পর নতুন করে তারা তাদের পুরোন দিন আবার ফিরে পেয়েছে। যেন একটি যুগের সঞ্চিত সমস্ত আবেগ, অনুরাগ, বিরহ-বেদনা, কষ্ট-যাতনা আগ্নেয় গিরির লাভার মতো উৎসারিত হতে চায়। বহুযুগের ওপার হতে জন্ম-জন্মান্তরের সব ভালোবাসা যেন নাগকেশরের পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে স্নিগ্ধ শিশিরকণার মতো তাদের উপর ঝরে পড়ছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। চারদিকে বিদ্যুতের আলো জ্বলে উঠেছে। নাগকেশরের ফুলে ফুলে যেন জোনাকীরা রঙ মশাল জ্বেলে তাদের ভালোবাসাকে স্বাগত জানাচ্ছে।

দু'টি পালক

তিয়াষ জুঁইয়ের এক রাশ কালো চুল দুই হাতে তুলে ধরে মুখের কাছে নিয়ে চুলের গন্ধে স্নাত হয়। দুরু দুরু উত্তেজনার অবসান হয় একসময়। তিয়াষ এবার মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বলে - তুই মা সরস্বতীর মতো ভঙ্গী করে সেবারের মতো একটু দাঁড়া না? - সে ভাবে যদি দাঁড়াতে পারিস তবে আজও তোকে একটা প্রণাম করবো।

তিয়াষের কথায় জুঁই লজ্জা পেয়ে যায়। তারপর বলে - সেদিন পারলেও আর কোনদিন ওভাবে তোমার সামনে আমি দাঁড়াতে পারবো না। এমনকি বিয়ের পরও পারবো না। তিয়াষদা, তুমিই বল না, তোমার সে বয়সের হৃদয়, মন - আঁখি - তোমার এ বয়সেও আছে? সে সময় তোমার মধ্যে যে নিরাসক্ত সৌন্দর্য অবলোকনের দৃষ্টি ছিল, সে দৃষ্টি তোমার আর নেই। তুমি নিজেও আর তাকিয়ে থাকতে পারবে না তিয়াষ দা। বসন যে শুধুই লজ্জা নিবারণের জন্যই পরতে হয়, এ বোধও সম্পূর্ণ ছিল না। তাই ওভাবে দাঁড়াতে পেরেছি। এখন তো আমরা সবাই সবকিছু বুঝি।

তিয়াষ - এ সমাজ একটা বিশাল পঙ্ককুণ্ড। কিন্তু মলিনতার মধ্যে থেকেও অমলিন থাকতে পারাটাই প্রকৃত মানবধর্ম। সাবান ময়লার মধ্যে থাকলেও, তা ময়লা পরিষ্কার করেই থাকে, ময়লা তাকে স্পর্শ করে না।

জুঁই - ঠিক কথা বলেছ তিয়াষ দা। রমনীর সৌন্দর্য তার মন। সুন্দর রূপ, সুন্দর যৌবন যে একটি নির্মল পরিচ্ছন্ন মনেরই প্রতিবিম্ব। তুমি একবার আমার হৃদয়টা ছুঁয়ে দেখবে তিয়াষ দা। - কবি কৃষ্ণধন নাথের কবিতার সেই পংক্তি তোমার মনে পড়ে -

এই তো আমার হৃদয় ছোঁয়া যায়

আজ তুমি সব কথা বলে যেতে পার।

তিয়াষ - জুঁই, তুই তেমনি আগের মত আছিস্, নারে?

জুঁই - তিয়াষ দা, মানুষ নিয়ত পরিবর্তিত হয়, বদলায় না, পাল্টায় না। কারণ সত্তা তো চিরন্তন। তিয়াষ দা, হৃদয় দিয়ে সব কিছু ছোঁয়া যায়, সব কিছু জয় করা যায়, কিন্তু হৃদয় যে কেনা-বেচা যায় না।

তিয়াষ - আমি কবি-সাহিত্যিক। তুই সাহিত্য সমালোচক। ভালোই হোল।

জুঁই - সেই জন্যই তো ইংরেজী সাহিত্য নিয়েছি। - চলো, তিয়াষ দা, এবার ফিরতে হবে। বড্ডো ফুচকা খেতে ইচ্ছে করছে। - খাবে?

তিয়াষ - কি করে যে ফুচকা খাস্ বাবা। ওটা আবার একটা খাবার জিনিষ হলো? - জানিস্, একদিন আমারও ফুচকা খাবার লোভ হলো। ধর্মতলা মেট্রোর সামনে দাঁড়িয়ে দু'টাকার ফুচকা কিনলাম। দুটো কোনমতে খেয়ে তাকে পুরো দু'টাকা দিয়ে পালিয়ে বেঁচে

ছিলাম। তোর ইচ্ছে হলে তুই খা, বাবা। আমি ঝাল মুড়ি খাবো।

জুঁই - তা হলে ফুচকা খাব না। দু'জনেই ঝালমুড়ি খাই চলো।

পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। তিয়াষ কেমিষ্ট্রি অনার্সে রেকর্ড নাম্বার পেয়ে ফার্স্ট ক্লাশ - ফার্স্ট। - কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হলো তিয়াষ। এম.এস.সি.তে আরো অনেকের সঙ্গে এক রাশিয়ান মেয়েও এসে ভর্তি হলো। মেয়েটির নাম নিনিকোভা সেবাস্তিনা। তার বাবা দিল্লী স্থিত ভারতীয় দূতাবাসে ফার্স্ট সেক্রেটারী হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছে। তারা দু'বোন। বড় বোন সানিকোভা রুশ মহাকাশ সংস্থার গবেষণা কর্মী। মেয়েটির লম্বা গড়ন। সুন্দর মুখশ্রী। মাথায় সোনালী চুল, নীল চোখ, লম্বায় প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট। স্লিম, তন্বী। কথাবার্তায় বেশ সপ্রতিভ। মিশুকে। দেশ-বিদেশের নানা খবরাখবর তার ঝুলিতে। নিনি ও তাদের পুরো পরিবার প্রেসিডেন্ট পুতিনের অন্ধ সমর্থক। রুশ সমাজ ব্যবস্থাকে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে পুতিনই বাঁচিয়ে দিয়েছে। লেনিনকে তারা শ্রদ্ধার চোখে দেখে। কিন্তু স্ট্যালিনের নামও শুনতে পারে না।

নিনিকোভার সঙ্গে কিছু দিনের মধ্যে তিয়াষের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তারা এক সঙ্গেই প্র্যাকটিকেল ক্লাশ করে। অবসর সময়ে লাইব্রেরী ঘরে বসে আড্ডা জমায়। নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলে।

কথা প্রসঙ্গে নিনিকোভা একদিন তিয়াষকে বলেছিল - জানো তিয়াষ, স্ট্যালিন লোকটা ছিল বড় নিষ্ঠুর। কারণে-অকারণে মানুষকে গুলি করে মেরেছে। জানো, ও আমার ঠাকুরদাকে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রকাশ্যে গুলি করে মেরেছে। বাবার বয়স তখন পাঁচ। লাশটা পর্যন্ত ফেরত দেয়নি। সে সময় আমাদের এলাকায় খাদ্যের দাবীতে একটা আন্দোলন হয়েছিল। আমার ঠাকুর্দা সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। সেই আন্দোলন দমন করতে গিয়ে স্ট্যালিন নিজে সেখানে হাজির হয়। সেদিন স্ট্যালিনের নির্দেশে রেড আর্মি নির্বিচারে গুলি চালিয়ে শত শত মানুষকে মেরে ফেলল। আমার ঠাকুমা সে কথা বলতে গিয়ে এখনো কেঁদে ফেলে। রাশিয়ার মানুষ দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পেয়ে পরম আনন্দে আছে। তারা চায় না সেই দুঃশাসনী রাজ আবার ফিরে আসুক।

তিয়াষ নিনিকোভাকে নিনি বলেই ডাকে। জুঁই আপাততঃ কলকাতায় নেই। হঠাৎ মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে উদয়পুর গিয়েছে। তিয়াষের কাছে খবর পাঠিয়েছে - আপাততঃ রাঙ্গা মাসী ভালোই আছে। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে কলকাতা ফিরে আসছে।

ইতিমধ্যে বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে। মিলিদি ডাক্তারী পাশ করে উদয়পুর জেলা হাসপাতালে পোস্টিং পেয়েছে। ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে মৌ চেন্নাইতে একটা বহুজাতিক কোম্পানীতে চাকুরী করছে। সোহম পণ্ডিচেরী মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়ছে। পলাশ

পুনেতে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে। সায়ন হায়দ্রাবাদে এম্-টেক্ করছে। তৃপন জোকায় এম.বি.এ. পড়ছে। তপোধীর ডিরেক্টর পদে পদোন্নতি পেয়েছে। নন্দিতাও প্রধান শিক্ষিকা পদে বৃত হয়েছে। হিমাদ্রি আগরতলায় হাইকোর্টের সেরেস্তাদের হিসাবে পদোন্নতি পেয়ে নতুন দায়িত্বে যোগ দিয়েছে। মাধুরী সি.ডি.পি.ও পদে প্রমোশন পেয়ে ডুকলি ব্লকে বদলী হয়েছে। তপোধীর ধলেশ্বরে জায়গা কিনে একটি নতুন বাড়ি তৈরী করে ভাড়াবাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। হিমাদ্রি সুপারি বাগানে সরকারী কোয়ার্টারে থাকে। কৃষ্ণ নগর বাদুড়তলীতে একটা জায়গা কিনেছে। জুঁইয়ের পড়াশুনোর পাট চুকে গেলে বাড়ির কাজে হাত দেবে।

তিয়াষ সত্যিকারের সরস্বতীর বরপুত্র। কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দু'একজন বাদ দিয়ে প্রায় সকলেই বহুজাতিক কোম্পানীতে চাকুরীর মোহিনী মায়ায় আকৃষ্ট হয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। বিশ্বায়নের দুরন্ত হাওয়ায় তারা মেতে উঠেছে। কৃতীদের থেকে তাদের মা-বাবারাই ভোগসর্বস্ব আধুনিক পুঁজিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তারাই তাদের ছেলে-মেয়েদের ঠেলে-ঠুলে বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সমাজের অর্থে দেশের পরিকাঠামোর সুযোগ নিয়ে ডিগ্রি অর্জন করে দেশ-দেশবাসীর সেবা না করে পাউণ্ড-ডলার-ইউরো-মার্কের লোভে যারা বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে - তিয়াষ তাদের ঘৃণা করে। সমাজের মহতী দানে যারা শিক্ষা অর্জন করলো, সমাজের কোন প্রয়োজনেই তাদের শিক্ষা প্রযুক্ত হলো না। এতো প্রতারণা - দেশদ্রোহিতার সমান। দেশের প্রকৃত মেধা এইভাবে নিঃসৃত হয়ে যাচ্ছে। পুঁজির বর্জ্যরূপে বেকারী বাড়ছে। স্কুল-কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত মেধাবী শিক্ষক-প্রশিক্ষকের অভাব ঘটছে। ফলশ্রুতি স্বরূপ চক্রাকারে সর্বত্রই তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেশের শিক্ষার মান ক্রমঃঅধোমুখী। দেশেব বিশাল মানব সম্পদেব অপচয় রোধ করা আশু প্রয়োজন। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এ দেশে মানুষের প্রয়োজনে সেই সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের প্রযুক্তি আবিষ্কার করে দেশ ও জাতির সেবা করাই যে আমাদের সকলের পরম কর্তব্য। তা না হলে যে দেশ-জাতির ঋণ কোনদিনই পরিশোধ করা যাবে না। তিয়াষ তাই চলতি হাওয়ার বাইরে গিয়ে রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে পড়ছে। বহুজাতিক কোম্পানীর লোভনীয় চাকুরীর জন্য প্রযুক্তি নির্ভর পাঠক্রমের বাইরে গিয়ে কোন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী বা তাদের বাবা-মা এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। তিয়াষ ব্যতিক্রমী পথের পথিক। তিয়াষের ইচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে গবেষণা করবে এবং তার ছোট্ট প্রিয় রাজ্য ত্রিপুরায় ফিরে এসে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেবে। সে তার মা-বাবার কাছে কৃতজ্ঞ যে তাঁরা তাকে লোভী পিতা-মাতার মতো অর্থের কাছে বলি দেয় নি। নিজের স্বাধীন লক্ষ্যকে তারা সম্মান জানিয়েছে। সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি গবেষণা পত্র সে জমা দিয়েছে। বিশেষতঃ গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন ও বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে তার ভিন্নধর্মী গবেষণা বিজ্ঞানী মহলে আলোড়ন তুলেছে। ভিয়েনায়

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেসে এই বিষয়ের উপর নিবন্ধ পাঠ করে সকলকেই সে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

অন্যদিকে জুঁই বেছে নিয়েছে ইংরেজী সাহিত্য। সাহ্যিত সমাজের প্রকৃত দর্পণ। ইংরেজী আন্তর্জাতিক ভাষা। বিশ্বকে নিবিড় করে জানার সবচেয়ে সমৃদ্ধ আর শ্রেষ্ঠ ভাষাই ইংরেজী। বিশেষত দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিস্ময়কর জ্ঞান ভাণ্ডার সঞ্চিত রয়েছে ইংরেজী ভাষায়। ইংরেজী সাহিত্যে জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যসহ সমগ্র বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারের চাবিকাঠি অচিরেই হাতের মুঠোয় এসে যায়। এরই পাশাপাশি জুঁই একটি ফরাসী ভাষা শিক্ষার কোচিং ক্লাশে ভর্তি হয়েছে। ফরাসী ভাষায়ও রয়েছে অন্যতম সমৃদ্ধ সাহিত্য সম্ভার। জনশ্রুতি রয়েছে যে আমেরিকানরা প্রেমে পড়লে হয় পোলিটিশিয়ান, ফরাসীরা প্রেমে পড়লে আর্টিষ্ট আর বাঙ্গালীরা কবি। ফরাসীরা বাঙ্গালীদের মতোই আবেগ প্রবণ। এই কোচিং ক্লাশেই এক ফরাসী যুবকের সঙ্গে জুঁইয়ের বেশ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কয়েক মাস যাবাব পর যুবকটি জুঁইকে একসময় প্রপোজড় করে বসে। নাম তাঁব আঁন্দ্রে লুই। সে কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্র। সুদর্শন, বুদ্ধিদীপ্ত চেহাবা। ফরাসী সাহিত্যের উপব অগাধ অধিকার। ফরাসী সাহিত্য নিয়ে দু'জনের সঙ্গে গভীব আলোচনা হয।

আঁন্দ্রেই একদিন জুঁইকে বলে - জুঁই তুমি প্যারিস যাবে? তোমায় আমি নিয়ে যেতে পাবি। যাবে কিনা বল?

জুঁই তাকে বলে - টাকা কোথায় পাবো ফরাসী দেশে যাবার?

এরপরই আঁন্দ্রে জুঁইকে বলে - তোমায় যদি আমি বিয়ে করে নিয়ে যাই। চমকে ওঠে জুঁই। এই ক'মাসেই এমন প্রস্তাব। সপ্রতিভ জুঁই বলে - আঁন্দ্রে - আমার বিয়ে পাকা হয়ে আছে। আমি আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না। তুমি আমায় ক্ষমা করো। তুমি আমার বন্ধু থেকো।

আশ্চর্যজনক ভাবে এর পরদিন থেকেই আঁন্দ্রে লুই কোচিং সেন্টারে আসা ছেড়ে দেয়। একদিন নিউমার্কেটে শপিং করার সময় অন্য একটি বিদেশী মেয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে ঘুরে ফিরতে দেখেছে জুঁই। ইচ্ছে করেই আর তার মুখোমুখি হয়নি।

জুঁই আগরতলা থেকে এখনো ফিরে আসেনি। ইতিমধ্যে নিনিকোভা তিয়াষের বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। নিনিকোভাই একদিন ছুটির সন্ধ্যায় তিয়াষকে নিয়ে একটি বার কাম রেষ্টুরেন্টের নির্জন প্রকোষ্ঠ বুকিং করে ঢুকে পড়লো। পরিচিত বার। এর আগেও নিনি একা অনেকবারই এসেছে। সে এখানকার মাংস-বিরিয়ানীর বড়ো ভক্ত। রাশিয়ান

ভোট্‌কা তার প্রিয় ড্রিঙ্কস্‌। তিয়াষ দীর্ঘদিন কলকাতা মহনগরীতে বাস করলেও কফি হাউজ, দু'চারটে নামী-দামী রেস্টুরেন্ট আর ফুটপাতের পরিচিত খাবার-দাবারই সচরাচর পছন্দ করে। একদিন বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে ধর্মতলার একটা বারে ঢুকেছিল। বিশেষতঃ সোমনাথ, অলকেশ, সুশান্তই তাকে পীড়াপীড়ি করছিল। অনেক জোরাজুরির পর তিয়াষ বীয়ার খেতে রাজী হোল। সঙ্গে মাংস-বিরিয়ানী। অন্যেরা হুইস্কি খেল। সোমনাথ বড় লোকের ছেলে। সেই পুরো বিল পেমেন্ট করেছিল। বড়লোকের ছেলে হলেও সোমনাথের মনটা বড়ো ভালো। সে খুবই মুডি। নিজের খেয়ালে চলে। পড়াশুনোয় ভালো। নাটক-সিনেমার প্রতি বড়ো ঝোঁক। বড়লোকের সুদর্শন ছেলে বলে মেয়েরা তার পেছন পেছন ঘুর ঘুর করে। সোমনাথ মেয়েদের খুব একটা পাত্তা দেয় না। তিয়াষকে তো ইউনিভারসিটির প্রায় অর্দ্ধেক মেয়েই ভালোবাসে। বেশ কয়েকজন তো তাকে প্রপোজড় করেছিল। তিয়াষ সরাসরি কাউকে প্রত্যাখ্যান না করে শুধু নীরবে এড়িয়ে গেছে। তার কঠোর নীরবতার কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে কয়েকজন তাকে ফাঁদে ফেলারও চেষ্টা করেছে। কিন্তু সংযত ও সতর্ক তিয়াষ সব চক্রান্তই সুকৌশলে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। কিন্তু কেন জানি নিনিকোভাকে সে এড়িয়ে যেতে পারল না।

নিনিকোভা বার বয়কে ডেকে পাঠাল। বয় এলে তাকে দুই প্লেইট কসা মাংস ও বিরিয়ানী দিতে বলল। সঙ্গে এক পাত্রে বীয়ার ও অন্য পাত্রে দুই পেগ ভোটকার অর্ডার। ইতিমধ্যে স্যুপ এসে গেছে। এই বারের চিকেন স্যুপ খুবই উপাদেয়। স্যুপের বাটি থেকে নুডল, ব্রুকোলা দু'জনেই মুখে তুল্লে দিল। খেতে খেতেই নিনি তিয়াষকে বলে - জানো তিয়াষ, আমি ভারতীয় সংস্কৃতির বড়ো ভক্ত। আমি আমার বাবার কাছ থেকে তোমাদের দেশের উদার মানবতাবাদ সম্পর্কে অনেক জেনেছি। ভারত সংস্কৃতি সম্পর্কে ফরাসী লেখক রোমা রঁলার রুশ অনুবাদ আমি পড়েছি। আমার বাবা অ্যানথ্রোপোলজির উপর ডক্টরেট করেছে। বাবার থিসিসের বিষয় ছিল ভারত-সংস্কৃতি। বাবার পরামর্শে আমি এ দেশের শিল্প-সংস্কৃতি-কৃষ্টি-ঐতিহ্য সম্পর্কে অনেক পড়াশুনো করেছি। আমার বাবাই আমাকে সব সময় উৎসাহ দিয়েছে। বাবাই আমাকে কলকাতা পড়ার আগ্রহ জাগিয়েছে। বলেছে পড়লে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে। এখানে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা যেমন দেওয়া হয়, তেমনি বিশ্বমানবতা বোধেরও জাগরণ ঘটে। আমার বাবা বিশ্বের সব বড় বড় মহানগরেই কাটিয়ে এসেছে। কলকাতায়ও অনেকবার এসেছে। এখানকার গ্র্যাণ্ড হোটেলে বাবা থেকেছে।

তিয়াষ - নিনিকোভাকে -নিনি বলেই ডাকে। তিয়াষ বলে - জানো নিনি, আমি কলকাতা শহরের টানেই এখানে পড়তে এসেছি। এখানে আমার চার বছর হলো। আমার

মনে হয় কি জান - আমি হাজার বছর ধরে এই শহরে আছি। এই শহরের টান বড়ো অমোঘ। কলকাতা একবার এলেই এখানে বার বার আসতে ইচ্ছে করে। - কলকাতার নাটক তো দ্যাখোনি। তোমাকে নাটক দেখাতে নিয়ে যাবো।

নিনি - পড়াশুনো শেষ করে কি করবে ভেবেছ?

তিয়াষ - আমি কিন্তু আমার রাজ্য ত্রিপুরাকে ভালোবাসি। আমি আমার রাজ্য ত্রিপুরার আগাছা-পরগাছা নই। আমরা উদ্বাস্তু নই। আমার জন্ম এই রাজ্যে। আমার বাপ-ঠাকুর্দাও এই রাজ্যেরই মানুষ। বিশ্বের মানচিত্রে আমার বাজ্যটাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি চাই আমার রাজ্যটাকে বিশ্ববাসী জানুক। আমি আমার রাজ্য ও রাজ্যবাসীর কাছে দায়বদ্ধ। রাজ্যের টাকায় আমি পড়াশুনো করছি। তাই আমার রাজ্যের উন্নয়নের জন্য আমি আমৃত্যু চেষ্টা করে যাব।

নিনি - তোমাদের ওখানে আমাকে নেবে?

তিয়াষ - তুমি যাবে ত্রিপুরায়? যখন যেতে চাও, তখন নিয়ে যাবো।

নিনি - সত্যি বলছ? আমায় নেবে তোমার রাজ্যে?

তিয়াষ - নেবো না কেন? নিশ্চয়ই নেবো। এতে সত্য মিথ্যার কিছু নেই তো।

নিনি - তিয়াষ, তুমি আমায় ভালোবাস?

তিয়াষ - তুমি তো আমার বন্ধু, নিনি। ভালোবাসা না থাকলে কখনো বন্ধুত্ব হয়? হয় না। তুমি আমায় ভালোবাস না?

নিনি - তোমায় যে সত্যিই আমি ভালোবাসি।

বলেই নিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। রুমের ভেতরের দিকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এবার তিয়াষের পাশাপাশি বসে। এতক্ষণ দু'জন টেবিলের দুইদিকে মুখোমুখি বসেছিল। - অকস্মাৎ নিনি তিয়াষকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার মুখে কিস করতে থাকে। তিয়াষ অপ্রস্তুত। কিছু বুঝে উঠবার আগেই ঘটে যায় এ ঘটনা। তিয়াষ নিনির বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। তারপর বলে - নিনি - এ তুমি ভালো করনি।

নিনি - আমি ভালো-মন্দ বুঝি না তিয়াষ। আমি তোমায় আমার প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। আমি যে তোমায় চাই তিয়াষ। আমি তোমার উপযুক্ত হবার চেষ্টা করবো। আমায় তো তুমি কিস্ করলে না তিয়াষ। তোমাকে কিন্তু কিস্ করতেই হবে। না হলে বের হতে পারবে না।

তিয়াষ - এ সব কি হচ্ছে নিনি? আমার ভালো লাগছে না। আমি চলে যাব।

আমায় যেতে দাও। বলতে বলতেই উঠে দাঁড়ায় তিয়াষ।

. কিন্তু নিনিকোভাকে অতিক্রম করে যাবার কোন উপায় নেই। তিয়াষ দাঁড়িয়ে থাকে। নিনিও উঠে দাঁড়ায়। নিনি অপলক নেত্রে তিয়াষের পানে তাকিয়ে থাকে। তারপর আবার জড়িয়ে ধরে তিয়াষকে। - নিনির উষ্ণ পরশে তিয়াষের এতক্ষণের সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। রক্তে উজান স্রোত বইতে থাকে। যন্ত্র চালিতের মতো বিদেশিনী বান্ধবীকে আপন বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরে তিয়াষ। এবার দু'জনই দু'জনের আলিঙ্গনাবদ্ধ। দু'জনই দু'জনকে কামনার আগুনে নির্জিত করে তোলে। একসময় নিনিকোভার পরনের অন্তর্বাস খুলে যায়। জীবনে এই প্রথম তিয়াষ কোন এক যুবতী রমনীর আবেদন অগ্রাহ্য করতে পারল না। স্বপ্নময় বিদ্যুতের স্বল্পালোকে রুদ্ধদ্বার কক্ষে ভল্গার শীতল জলে উত্তাপের কলরোল ওঠে।

নারী যেন,

নিবিড় নয়ন তার নাস্তিময় তমসায় গড়া,

কামুক ঝর্না যেন আমোদিত শিলার ঘর্ষণে।"

ভল্গা এখন ক্লান্ত। উৎফুল্ল, আমোদিত, তৃপ্ত। তিয়াষ স্তব্ধ, নির্বাক। নিনিকোভা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে টিস্যু পেপার দিয়ে নির্গত পিচ্ছিল নির্যাস মুছে ফেলে । তিয়াসেব হাতেও একটা টিস্যু পেপার দেয়। লজ্জায় অধোবদনে তিয়াষও মুছে ফেলল। নিনি তার অন্তর্বাস সামলে নিল। এতক্ষণ কেবিনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। নিনি উঠে দবজা খুলে দিয়ে আগের জায়গায় গিয়ে বসে - কলিং বেলে টিপ দেয়। বেয়ারা এলে পঞ্চাশ রুবলের একটা নোট তার হাতে ধরিয়ে দেয়। বেয়ারা কাউন্টাব থেকে ভারতীয় মুদ্রায় বাকী টাকা ফেরৎ দেয়। তারপর দু'জনই বার থেকে বেরিয়ে আসে। বাথরুম যাওয়া দরকার। নিনি একটা ট্যাক্সী ডেকে নেয়। সে আনন্দে ডগমগ। গাড়ীতে উঠেই নিনি তার নিজের এবং তিয়াষের গায়ে সুগন্ধি বডি স্প্রে ছিটিয়ে দেয়। গাড়ী চলতে থাকে। - তিয়াষ ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত, গভীর অনুতপ্ত। তিয়াষকে তার হোস্টেলেব সামনে নামিয়ে দিয়ে নিনি তার নিজের হোস্টেলে চলে যায়।

এমন আকস্মিক অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য তিয়াষ কোনদিনই প্রস্তুত ছিল না। তিয়াষ যে এতদিন নিজেকে অন্যরকম ভাবত! তিয়াষের এই ভাবনা ঠিক নয়? রমণীরূপী অগ্নির দহনে তিয়াষরূপী পতঙ্গেরা কি চিরকালই এমন আকস্মিক ভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যায়? তিয়াষের এত কালের শিক্ষা-দীক্ষা রুচি - সব নিঃশেষ হয়ে গেল? - নাকি এ তার পুরুষকারের পরীক্ষা? যে পরীক্ষায় তিয়াষ কৃতকার্য ও সার্থক। এখানেই কি পুরুষের পুরুষত্ব? নারী কি চিরকাল এভাবেই তৃপ্ত?

কিন্তু জুঁই? জুঁইয়ের কাছে তিয়াষ কেমন ভেঙ্গেচুরে যাচ্ছে? সোজা হয়ে আর দাঁড়াতে পারছে না যেন। তিয়াষ জুঁইকে সামনে দেখছে। আর তিয়াষ যেন সরীসৃপের মতো হিলহিল করতে করতে অন্ধকার বিবর খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ কি করলো তিয়াষ? কেনইবা সে এমন করল? বিদেশিনি রূপসী রমণীর যৌবনের দুরন্ত আহ্বানে তিয়াষের সমগ্র পৌরুষ সত্তায় নবজাগরণের সাড়া। এও তো জীবনের এক নবজাগরণ - নবজাগৃতি বা রেঁনেসাঁ। নবজাগৃতির ঢেউ যেমন একটি সমাজকে মর্মস্থলে তীব্র নাড়া দিয়ে যায়। এও যেন তেমনি, চেতনাব মর্মমূলে নাড়া দিয়ে স্থবির চৈতন্য সত্তাকে জাগিয়ে দিয়ে গেল। কুলকুণ্ডলিনী জাগলে যেমন সাধকের মধ্যে শুরু হয় তীব্র আলোড়ন, এও তো ঠিক তেমনি। কুল-কুণ্ডলিনী জাগরণের আনন্দ থেকে তো এই আনন্দ কম নয়। তবু তিয়াষের হৃদয় শান্ত হয়ে চায় না।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে একবার অনুতাপ আর একবার উত্তাপে সারারাত শুধু এপাশ-ওপাশ করেছে। আধোঘুম আধো জাগরণে কেটে গেল বিভাবরী। তবু অশান্ত হৃদয় যে শান্ত হয় না তিযাষের।

নিনিব দুর্বার আকর্ষণ এড়াতে পারে না তিয়াষ। ছুটির দিনে নিনিকে কলকাতা যাদুঘর দেখাতে নিয়ে যায় তিয়াষ। মিউজিয়াম দেখতে দেখতেই তারা দু'জন একটা নিভৃত জাযগায বসে। এবপব তিয়াষ নিনিকে বলে - নিনি আমবা কি সেদিন খুব ভালো করলাম? এতো ভিখিরিব মতো ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবৃত্ত করার মতো ঘটনা।

নিনি - তুমি এতসব ভাবছ কেন? এটা কি কোন ব্যাপার হলো? আমরা দু'জনেই এখন মেচিউরড্। আমরা দু'জনেই বন্ধু। এই বয়সে একটু - আধটু সেক্স কিন্তু দবকাব। এটুকু না হলে যে পুরুষের পৌরুষত্বই থাকেনা। পুরুষ ছাড়া নারীর নারীত্বের যেমন পরীক্ষা সম্ভব নয়, তেমনি নাবী নামক নদীতে স্নাত না হলে পুরুষের পৌরুষত্বও কখনো বিকশিত হয় না। তুমি আমার কাছে এক সম্পূর্ণ সক্ষম পুরুষ, আর তোমার কাছে আমি সম্পূর্ণ সার্থক এক নারী। আমরা কোন অন্যায় করিনি।

তিয়াষ - এ তুমি কি বলছ নিনি?

নিনি - আমি কি কোন অন্যায় বলেছি? আই অ্যাম ভেবি প্র'উড অফ্ ইউ তিয়াষ। সেদিন তুমি ভীষণ তৃপ্ত করেছ, ভীষণ তৃপ্ত। আমার জীবনে তুমিই প্রথম পুরুষ। আমার নিজের দেশেও কোন যুবককে আমি এমন নিবিড় করে পাইনি। ব্যক্তিত্বহীন ম্যাড় ম্যাড় ছেলেদের আমাদের একদম পছন্দ নয়। - এজন্য কাউকে কোনদিন আমার ভালোও লাগেনি। তোমাকে ভালো লেগেছে। তাই নারী জীবনের সেরা উপহার তোমাকে উজাড় করে দিতে আমার কোন দ্বিধা হয়নি। এখনো নেই। - তুমি আমার শরীরী ভাষায় তা কি বুঝতে পার না?

দু'টি পালক

তিয়াষ - নিনি, তুমি তো শুধু তোমাকে নিয়ে ভাবছ? আমার কথা তো তুমি ভাবছ না। আমি তো এমনভাবে কিছু পেতে চাই নি। সহজে যা পাওয়া যায়। সহজেই যে তা হারিয়ে যায় নিনি। ঝড় নিমেষে আসে, সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে কিন্তু নিমিষেই চলে যায়। যা ভেঙ্গে চুরে দিয়ে যায়, তা পুনর্বার গড়তে গড়তেই হয়তো সারাজীবন চলে যায়। - নিমেষের ভুল, সেও তো ভুল, ক্ষণিকের অন্যায়, সেও তো অন্যায়।

একটু থেমে তিয়াষ আবার বলে - নিনি তুমি আমার একটা কথা রাখবে?

নিনি - কি কথা?

তিয়াষ - তোমার এই বন্ধন থেকে আমায় মুক্তি দিতে হবে নিনি।

নিনি - তুমি কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছ আমাকে তোমাদের দেশে নেবে।

তিয়াষ - আমি তো সে কথা অস্বীকার করছি না।

নিনি - তবে মুক্তি চাইছ কেন? আমাকে যখন নিয়ে যাবে বলেছ - নিয়ে চল। কিন্তু কি পরিচয়ে তুমি আমাকে তোমার দেশে নিয়ে যাবে?

তিয়াষ - কেন, তুমি আমার বন্ধু। আমার বন্ধুর পরিচয়ে তুমি যাবে। আর আমার মা-বাবা পুরো সংস্কার মুক্ত। আমরা কেউই অর্থোডক্স নই।

নিনি - তাহলে তো কথাই নেই। তুমি আমায় বিয়ে করে নিয়ে চল।

নিনির কথা শুনে চমকে ওঠে তিয়াষ। বিয়ে? নিনিকে? কোন কথা বলতে পারে না তিয়াষ। - নিনি বলেই চলে - আমাদের রাশিয়ান মেয়েদের অনেকেরই বিয়ে হয় না। রাশিয়াতে পুরুষ শিশুর তুলনায় নারী শিশুর জন্ম হার বেশী। প্রতি হাজারে প্রায় এগারশ চল্লিশ। ফলে রাশিয়ায় এখন জন্ম হার কমতির দিকে। আর আমি শুনেছি বাঙ্গালী ছেলেরা নাকি বড্ডো বেশী ওয়াইফ্ লাভিং। আর তুমি তো বেশ স্মার্ট। হ্যাণ্ডসাম ইয়ূথ। পড়াশুনোয় সেরা। তোমার মতো ছেলে আমাদের মেয়েরা পেলে কিছুতেই ছাড়বে না। আমি আর আমার দেশে ফিরে যেতে চাই না। তোমাকে বিয়ে করে তোমার কাছেই থেকে যাব।

তিয়াষ - আমি যে তোমায় বিয়ে করতে পারব না নিনি। আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসি। তাকে আমি কথা দিয়েছি। তাকে ছাড়া যে আমি আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না নিনি? আমি একটি মেয়ের জীবনের দাম অন্যভাবে চুকাতে পারবো না নিনি। তুমি আমায় ক্ষমা করো। তুমি আমার বন্ধু, বন্ধু হয়েই থাকবে। এর বেশী প্রত্যাশা করা ঠিক হবে না। ওকে আমি কিছুতেই বঞ্চিত করতে পারব না।

নিনি - তুমি তো তাকে বিয়ে করনি? কথা দিয়েছ মাত্র। এখন তাকে আমার কথা বলে দেবে।

দু'টি পালক

তিয়াষ - নিনি, তুমি যত সহজে কথাটা বলতে পারলে, অত সহজ যে বিষয়টা নয়। আমাদের শৈশব থেকে যে সম্পর্ক। এই সম্পর্কের বয়স যে কোন অবস্থাতেই পনর বছরের কম নয়। এক নিমিষে সে সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়া যায় না। আমাকে টেনো না নিনি। আমাকে আমার মতো বাঁচতে দাও।

নিনি - আমি কি নিয়ে বাঁচবো তিয়াষ! তোমাকে নিয়ে তো আমি একটা স্বপ্ন তৈরী করেছিলাম। আমার সেই স্বপ্ন যে হারিয়ে গেল। আমাকে একটু ভাবতে দাও। আমাকে কয়েকটা দিন সময় দাও।

নিনি একটু সরে গিয়ে অন্য একটা চেয়ারে বসে একটা টেবিলের উপর মাথা রেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তারপর আবার তিয়াষের কাছে ফিরে আসে। বলে - জানো তিয়াষ, স্ট্যালিনের আমলে নির্বিচারে যুবশ্রেণীকে হত্যা করা হয়েছে। সেই সময় থেকে এ দেশে নারী-পুরুষের সংখ্যার যে ব্যবধান রচিত হয়, তা আজো ঘোচেনি। আমরা রাশিয়ান মেয়েরা স্বামীদের বড়ো ভালোবাসি। আমরা বার বার স্বামী পাল্টাইনা। তোমাকে আমি মনে মনে স্বামী হিসাবে বরণ করে নিয়েছি। তুমি আমায় সিক্ত করেছ। আমার জীবনের উর্বর ভূমিতে তোমার বীজ ধারণ করেছি। আমি সেই তৃপ্তি নিয়েই সমস্ত জীবন বেঁচে থাকব। আমি আর কোনোদিন বিয়ে করব না। তুমি বাঙ্গালী। আমি বাঙ্গালী বধূর মতই সারা জীবন শাড়ী শাঁখা-সিঁদুর পরে কাটিয়ে যাবো। অপেক্ষা করব পর জন্মের। সেই জন্মে যেন তোমাকে আমি স্বামী হিসাবে পাই। আজ হোস্টেলে ফিরে যাই চল।

কয়েকদিন পর নিনিকোভা লাইব্রেরীর একটি নিভৃত কক্ষে তিয়াষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সেখানে তিয়াষকে সে বলে - আমি আমার বাবার সঙ্গে কথা বলেছি। আমি আগামী পরশু দিন দিল্লী ফিরে যাচ্ছি। রাত্র আটটায় জেট এয়ার ওয়েজের ফ্লাইট। আমি বাবাকে বলেছি কলকাতা আমার ভালো লাগছে না। আমি জহরলাল নেহেরু ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হবো। আমার ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট আমি আজই নিয়ে নিয়েছি। কালই আমি হোস্টেল ছেড়ে দিচ্ছি। তিয়াষ নিনির কথা শুনে নির্বাক হয়ে যায়। হৃদয়টা মোচড় দিয়ে উঠে। কোন কথা বলতে পারে না। এতক্ষণ নিনিকোভার মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনছিল। এবার চোখ নামিয়ে নেয়। তারপর বলে - আমাকে না জানিয়ে এত বড় সিদ্ধান্তটা নিয়ে নিলে নিনি? আমার উপর তোমার এত অভিমান?

নিনি - আর তো কোন পথ খোলা ছিল না তিয়াষ। এখন তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

তিয়াষ - কি অনুরোধ বল?

নিনি - বাইপাসের কাছে সোনার বাংলা হোটেলে একটা স্যুইট ভাড়া করেছি। কাল

দুপুরে সেখানে উঠে যাবো। উড্ ইউ প্লিজ অ্যাকোমপ্যানি মি? - এরপর আর কোনদিন তোমায় বিরক্ত করবো না।

তিয়াষ - তোমার সঙ্গে যেতে আমার কোন আপত্তি নেই। অবশ্যই যাবো।

নিনি - তুমি তাহলে রেডি থেকো। কাল সকাল এগারটায় তোমার হোস্টেলের সামনে থেকে তোমাকে পিকআপ করবো। - এখন চলি।

নিনি একবুক হতাশা নিয়ে লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে যায়। তিয়াষ গভীর বেদনাভরা বুকে চুপচাপ লাইব্রেরীতে বসে থাকে। কোন ভাবনাই ভাবতে পারে না। সমস্ত চেতনা যেন অবলুপ্ত। সে যেন মিউজিয়ামে সুপ্ত কোন প্রাচীন কালের মমি হয়ে গেছে। জীবন্ত মানবের কোন অনুভূতিই তিয়াষের মাঝে আজ আর সক্রিয় নয়। কখন সন্ধ্যা হয়েছে, কখন হোস্টেলে ফিরে এসেছে, কখন খেয়েছে, কখন ঘুম এসেছে - কিছুই যেন ভাবতে পারছে না।

পরদিন দুইটা বড় বড় ব্যাগ আর একটি সুদৃশ্য লেদারের স্যুটকেশ নিয়ে নিনিকোভা তিয়াষ সহ দুপুর নাগাদ সোনার বাংলা হোটেলে এসে ওঠে। রুম আগে ভাগেই বুক করা থাকায় কোন অসুবিধা হয়নি। হোটেলের ডাইনিং হলে দুপুরের লাঞ্চ তারা খেয়ে নেয়। তিয়াষ ভেবেছিল নিনিকে হোটেলে সী-অফ্ করে চলে আসবে। কিন্তু নিনি তিয়াষকে থেকে যেতে বাধ্য করল। অগত্যা নিনিকোভার সঙ্গে একই স্যুটে রাত্রি যাপনের জন্য থেকে যায় তিয়াষ। রাতের খাবার স্যুটের আউট হাউজে দিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে রাখে নিনিকোভা।

তিয়াষ টি.ভি. দেখছে। মাঝে মাঝে দু'জনে কথা বলছে। তিয়াষের কোনদিকে খেয়াল নেই। নিনি স্যুটের অ্যান্টি চেম্বারে ঢুকে নব বধূর বেশে সেজে আসে। পরনে লাল টুকটুকে একটা বেনারসী। দু কানে দুটি হীরের দুল। গলায় সুন্দর সোনার নেকলেস। এক হাতে বালা, অন্যহাতে একটি চূড়। এই অপূর্ব সুন্দর সালংকারা বেনারসীর সাজে নিনিকোভাকে দেখে তিয়াষ কিছুতেই তার চোখ ফেরাতে পারছিল না। তিয়াষ নিনিকে জিজ্ঞেস করে - তোমার এই বধূ বেশ কেন?

নিনি কোন কথা না বলে কালীঘাটের কালীর একটি ছবি বের করে একটা টেবিলের উপর রেখে গলায় একটা জবাফুলের মালা পরিয়ে দেয়। ছবির পাশে জ্বালিয়ে দিল দুটো বড়ো বড়ো মোমবাতি। সঙ্গে কয়েকটি সুগন্ধি ধূপকাঠি। - পার্লারে গিয়ে আগেই হাতে মেহেন্দি করে এসেছে, পায়ে সুন্দর করে আলতা পরা।

এরপর নিনিকেভা তিয়াষকে একটি প্যাকেট দিয়ে বলে - এর ভেতরে ধুতি-পাঞ্জাবী রয়েছে। পরে নাও। আমার কাজ শেষ। এখন সব কাজই তোমার। তিয়াষ অবাক

হয়। এরপর নিনিকোভাকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় - এসব কি করছ নিনি?

নিনিকোভা - এখনো বুঝতে পারছ না? - না বুঝলেও কোন ক্ষতি নেই। আপাততঃ ধুতি-পাঞ্জাবী পরে নাও। - তিয়াষ আর কোন প্রশ্ন না করে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে আসে। - বলে - বলো আমায় কি করতে হবে?

নিনিকোভা - মা কালীকে সাক্ষী রেখে আজ তুমি আমায় হিন্দুমতে বিবাহ করবে। আমার হাতে পরিয়ে দেবে শাঁখা। সিঁথিতে পরিয়ে দেবে সিঁদুর। এরপর আমার গলায় পরিয়ে দেবে মালা। তোমাদের বিয়েতে তো গায়ে হলুদ দিতে হয়। ওই কোটোতে হলুদের গুঁড়ো রাখা আছে। তুমি আমাব মুখে একটু হলুদ লাগিয়ে দাও।

একটু থেমে নিনি আবার বলে - তোমাকে কেন আসতে বলেছি এবং কেন এত আয়োজন, নিশ্চিয়ই বুঝতে পেবেছ। তোমার আমার মধ্যে বিবাহ বন্ধনের মধ্য দিয়ে আমার স্বপ্নকে আমি সত্য করতে চাই।

বিস্মিত তিয়াষ। এই বিদেশিনী রমণীর এমন অপ্রত্যাশিত আত্মত্যাগে সত্যিই সে বিহ্বল হয়ে পড়ে। এরপর বলে - নিনি, তুমি এমন করে আমায় ভালোবেসে অকারণে তোমার জীবনটাকে নষ্ট করে দিওনা। আমার সত্যিই কোন উপায় নেই। না হলে তোমায় আমি বিয়ে করে চিরকালেব জন্য আমার স্ত্রী করে তোমাকে আমার কাছেই রেখে দিতাম। নিনি, আমার একান্ত অনুরোধ - তুমি অমন ছেলে মানুষী করো না।

নিনিকোভা আমি জন্মান্তর বাদ বিশ্বাস করি। আমি রুশ ভাষায় বহু জাতকের কাহিনী পড়েছি। তোমাব সঙ্গে আমাব কোটি জন্মের সম্পর্ক। হয়তো এ কারণেই আমার কলকাতা আসা। এ আমার বিধিলিপি। তোমাদের রাধাও তো শ্রীকৃষ্ণকে স্বামী হিসাবে পায়নি। তাই তো এই মহতী প্রেমেব মৃত্যু নেই। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম চির মধুর - চির নবীন। আমার জন্য কোন দুঃখ কবো না। - শুধু তুমি আমায় শাঁখা-সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে আমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দাও। - তোমার কাছে আমাব শুধু এটুকুই প্রার্থনা।

সম্মোহিতের মতো তিয়াষ বরবেশে বধূ বেশী বিদেশিনী সর্ব ত্যাগী প্রণয়িনী নিনিকোভার হাতে শাঁখা ও সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিল। শক্তিরূপিনী জগজ্জননী মা কালিকার পটচিত্রের সম্মুখে তিয়াষ নিনিকে স্ত্রীর মর্যাদা প্রদান করলো। দেবী মূর্তিকে সাক্ষী রেখে তারা সাত পাক প্রদক্ষিণ করলো। করলো মালা বদল। উচ্চারিত হলো না বৈদিক মন্ত্র, বাজলো না সানাই, দেওয়া হলো না উলুধ্বনি। তবু বিয়ে হলো। পরস্পর পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রী রূপে বরণ করে নিল। আনুষ্ঠানিকতার শেষে নিনি আভূমি নত হয়ে তিয়াষের দু'পায়ে মাথা ঠেকায়। বিষাদ-মধুর আনন্দ-বেদনায় আপ্লুত তিয়াষ ও নিনিকোভা দু'জনেই দু'জনের বাহুবন্ধনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়। দু'জনের চোখই বাষ্পাকুল। সেল্ফ লোডিং ভিডিও

ক্যামেরার সাহায্যে নিনি তাদের বিবাহের সব অনুষ্ঠানই ক্যামেরা বন্দী করে রাখে। অটো শাটার ক্যামেরার সাহায্যে বেশ কিছু স্টিল ফটোও তারা তুলে নিল।

বেয়ারা ঘরে খাবার রেখে গিয়েছিল। খাওয়া-দাওয়া শেষ। এবার শুরু হলো ফুলশয্যার আয়োজন। একই রাতে বিয়ে এবং ফুলশয্যা। নিনি অনেক ফুল নিয়ে এসেছিল। সবই রজনীগন্ধা। ফুল দিয়ে দু'জনেই বাসর সাজাল। অনেক রাত পর্যন্ত চলল কথাবার্তা। মা কালীর ছবির সামনে ধূপকাঠির গুচ্ছ নিভে ছাই হয়ে গেছে। একটু আগে মোমবাতিও নিভে গেলো। জোরালো টিউবলাইট গুলো তারা নিভিয়ে দিলো। শুধু স্বল্প ওয়াটের একটি মিষ্টি স্নিগ্ধ আলো ঘরের ভেতরে তৈরী করেছে এক স্বপ্নময় আবেশ। বাসর শয্যায় দুইটি যুবক-যুবতী গভীর আবেগে প্রবল অভিকর্ষের শক্তিতে আপন আপন কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে। অভিকর্ষ বলের আকর্ষণে দুগ্ধ ফেননিভ কোমল শয্যায় উঠছে ভল্গার ঢেউ। নদী উদ্বেলিত, হিন্দোলিত। ভল্গার স্নিগ্ধ জলে অভিজ্ঞ নাবিকের মতো সাঁতার কেটে চলে তিয়াষ। একসময় নদী শান্ত হয়। স্নিগ্ধ তটভূমির স্পর্শে তিয়াষের চেতনাও যেন লুপ্ত। নিষিক্ত পলি ধারণ করে উর্বর নদী ক্ষেত্র আপন গর্ভে সম্ভাবনার বীজ বহন করে আপন ভাবেই বয়ে চলে।

নিনিকে বলেই তিয়াষ কয়েক ঘন্টার জন্য কলকাতায় আসে। এ.টি.এম. থেকে কিছু টাকা তুলে নিল। সোমনাথের নিকট থেকে কিছু টাকা ধার করল। তিয়াষ নিনির জন্য বাংলার তাঁতের এবং রেশমের বেশ কয়টা ভালো দামী শাড়ী কিনল। ম্যাচিং ব্লাউজ, পেটিকোট। এক জোড়া লেটেস্ট ডিজাইনের বেনারসী, রূপোর সিঁদুর কোটা, একটা সোনার নেকলেস, একটা হীরের আংটি কিনে নিল। কালীঘাটে গিয়ে নিনির নামে পূজা দিল। মায়ের চরণ স্পর্শ করা সিঁদুর নিয়ে ফিরে গেল হোটেলে। কয়েকঘন্টা পর নিনি উড়ে যাবে দিল্লী। তারপর হয়তো একদিন রাশিয়ায়। জীবনে হয়তো আর কোনদিন দেখাই হবে না। এক বিপর্যস্ত বেদনা বিধুর স্মৃতি বয়ে বয়ে বেড়াতে হবে বাকী জীবন। উপহার পেয়ে নিনি গভীর ভাবে আপ্লুত। তিয়াষই নিনির আঙ্গুলে পরিয়ে দিল হীরের আংটি। বিয়ের পর বৌকে অন্ন-বস্ত্র দিতে হয়। সে কথা মাথায় রেখে তিয়াষ মধ্যাহ্নের আগেই সব সেরে নিল। নিনিকোভা আগেই তিয়াষের জন্য এনেছিল হীরের আংটি এবং হীরে বসানো সোনার বোতাম। তিয়াষের আঙ্গুলে আংটি পরিয়ে দিয়ে নিনি বলে - আমার এই স্মৃতিটুকু তুমি রেখে দিও। এ অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়। শকুন্তলার স্মৃতি। ভুলতে গেলেই তোমাকে আমার কথা মনে করিয়ে দেবে।

তিয়াষ - তুমি দেখি কালিদাসও পাড়ছো।

নিনি - পড়িনি। বাবার কাছে দুষ্যন্ত শকুন্তলার কাহিনী শুনেছি। শকুন্তলার ছেলে

ভরতের নামেই তো তোমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ।

তিয়াষ - ফরাসী আর জার্মানীরাও ভারত সম্পর্কে গভীর আগ্রহী। প্রসঙ্গ পাল্টে নিনি আবার বলে - বিয়ের পর রাত্রিটিকে তোমাদের বাঙ্গালীরা কালরাত্রি বলে। সে রাত্রে স্বামী স্ত্রীর মুখ দেখাদেখি শুভ নয়। - তাই না?

তিয়াষ - আমাদের এত রীতি-নীতি তো আমিও জানি না। তুমি এত সব কবে জানলে? কেমন করে জানলে?

নিনি - পড়াশুনো, সিনেমা আর নানাজনেব সঙ্গে কথা-বার্তা বলে এসব জেনেছি। সূর্যাস্তের আগেই আমরা এয়ার পোর্ট চলে যাবো। আমি লাউঞ্জে ঢুকে গেলে তুমি চলে এসো।

মহাকালের যবনিকার অন্তরালে তিয়াষ এবং নিনিকোভার জীবনে সংগঠিত ইতিহাসের খবর কে রাখে। প্রতিদিন বিশ্বের কোথাও না কোথাও তো এমন ঘটনা ঘটতেই পারে। সে খবর তো কেউ রাখে না। নিনির চলে যাবার কথা মনে হতেই তিয়াষের হৃদয়ে শুরু হয় স্বাভাবিক বিক্ষোভ। পাশাপাশি সোফায় বসে দু'জনেই কপোত-কপোতীর মতো একটানা কূজন কবে চলে। তিয়াষের কোলে মাথা রেখে কান্নায় একসময় ভেঙ্গে পড়ে নিনি। তিয়াষ তার সোনালী চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গীতার সেই মূল্যবান শ্লোক উদ্বৃত করে নিনিকে স্থিতধী হবার উপদেশ দান করে। সে বলে - নিনি সুখে-দুঃখে নির্বিকার থাকবে। তবেই লাভ করবে পরম আনন্দ, পরম সুখ। আমাদের গীতায় বলেছে,

"দুঃখে ষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগত স্পৃহঃ।
বীতরাগ ভায় ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।।"

নিনি অশ্রু সম্বরণ করে বলে - তত্ত্ব যা পালন করতে হয় না। সংগঠিত বাস্তব তত্ত্বের সংজ্ঞা মেনে চলেনা। তত্ত্ব কিংবা দর্শন অস্বীকার করি না। জৈবিক প্রয়োজন বড়ো নির্মম। এর থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না। সেই প্রয়োজন যখন নিরাবরণ রূপে প্রকাশ পায়, তখন তা পাশবিকতায় পর্যবসিত হয়, আর যখন নীতি-আদর্শের আবরণে আবরিত হয়ে নিজেকে উন্মোচিত করে তবেই তা পরিণত হয় সুষমায়, সৌন্দর্যে।

তিয়াষ - সবই মানলাম। তবু মানুষ শোক নিয়ে বাঁচে না, তাকে আনন্দ নিয়ে, স্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে হয়। মানুষ সেই আনন্দঘন জীবনের সন্ধানে চির অন্বিষ্ট।

নিনি এবার প্রসঙ্গ পাল্টে কৌতুকের সুরে বলে - তোমার ভাবী বৌকে আমার কথা বলবে নাকি? বলো না। বাঙ্গালী মেয়ে তো। বড়ো দুর্বল। শুনে হয়তো হার্ট ফেল করে মরবে। আমাদের রাশিয়ান মেয়েদের হার্ট বড়ো শক্ত। আমরা মরব না। আমরা সবকিছুই

সহ্য করতে পারি। - আবার পরক্ষণেই কেঁদে ফেলে বলে - তোমার সঙ্গে কি আমার আর কখনো দেখা হবে না তিয়াষ?

তিয়াষ অনেকক্ষণ নীরব থেকে বলে - জানি না, আমি কিচ্ছু জানিনা। নিনি, তুমি যে আমার চিরজীবনের - চিরজনমের - জন্মজন্মান্তরের। আশা নিয়েই তো বেঁচে থাকা। সেই আশা নিয়ে বেঁচে থাকতে দাও। জীবন তরুর দুইটি শাখা। একটি আনন্দের, অন্যটি দুঃখের। প্রতি ডালে দুটি পাখি, একটি আশা ও স্বপ্নের, অন্যটিতে বেদনা ও হতাশার। এই নিয়েই তো জীবন।

তাদের ট্যাক্সী হোটেল সোনার বাংলার প্রাঙ্গন ছাড়িয়ে ভি.আই.পি. রোডে চলতে শুরু করেছে। ট্যাক্সীতে নববধূর বেশে নিনি সারাক্ষণই তিয়াষের বুকে মাথা রেখে অশ্রুমোচন করেছে। তিয়াষ তার বাম হাত দিয়ে নিনির মাথা বুকে চেপে ধরে। তার চোখেও জল। ট্রলি এনে নিনির ব্যাগ দুটি তুলে দিল তিয়াষ। সূর্য অস্তাচলের পথে। গোধূলির লালিমা ধরনীর মাটি স্পর্শ করলেই নেমে আসবে সন্ধ্যা। তার আগেই ফিরে যাবে তিয়াষ। লাউঞ্জে ঢুকবার আগে শেষবারের মত তিয়াষের সামনে এসে দাঁড়ায় নিনি। পরনে তিয়াষের দেওয়া হাল্কা তুঁত রঙের বেনারসী। মাথায় নববধূর ঘোমটা। সিঁথিতে জ্বল জ্বল করছে লাল টুকটুকে সিঁদুর। লাউঞ্জে ঢুকবার মুখে অগণিত কৌতূহলী মানুষের সামনেই আভূমিনত হয়ে তিয়াষকে শেষবারের মতো প্রণাম জানিয়ে লাউঞ্জে ঢুকে যায় নিনি। তিয়াষ অবাঞ্ছিত ব্যথা বুকে নিয়ে নির্নিমেষে নিনির অপসৃয়মান যাত্রাপথের পানে তাকিয়ে থাকে।

এভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তিয়াষ তার খেয়াল নেই। কেউ একজন এসে তিয়াষকে জিজ্ঞেস করে - ও দাদা! এখানে দেখছি একইভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ আসবে বুঝি?

সম্বিৎ ফেরে তিয়াষের। কোন উত্তর না দিয়ে একটা ট্যাক্সী ডেকে উঠে পড়ে। কলকাতার আকাশে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। বিদ্যুতের আলোয় সন্ধ্যার উপস্থিতি বোঝা যায় না। হোস্টেলে ফিরতে ইচ্ছে করে না তিয়াষের। রবীন্দ্রসদনের সামনে ট্যাক্সী থেকে নেমে যায়। একাডেমী অফ্ ফাইন আর্টসের প্রেক্ষাগৃহে নাটক চলছে। কাছের মানুষ। এতক্ষণে নাটক শুরু হয়ে গেছে। টিকিট কাউন্টারও বন্ধ। একজন দর্শক একটি টিকিট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উনি দেখবেন না। জরুরী খবর পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন। তিয়াষকে হতোদ্যম হয়ে ফিরতে দেখে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করে - নাটক দেখতে এসেছিলেন? টিকিট পান নি? আমার টিকিটটা নিয়ে দেখে ফেলুন। আমি দেখব না। মিনিট পাঁচেক গেছে - কিছু হয়নি। তাড়াতাড়ি চলে যান। তিয়াষ ইতস্ততঃ করে টিকিটটা নিল। তারপর ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করে - কত দিতে হবে?

দু'টি পালক

লোকটি বলল - পঁচিশ টাকায় কিনেছিলাম। আপনি আমায় কুড়ি টাকা দিয়ে দিন। তিয়াষ টাকাটা দিয়ে নাটক দেখতে ঢুকে পড়ে। নাটকের মুখ্য চরিত্র দাদাসাহেব পুরোহিত নিঃসঙ্গ, বিপত্নীক, পঙ্গু, গোঁড়া মানসিকতার মানুষ, বর্ণবাদী, দলিতদের প্রতি তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঘৃনা, জাত ক্রোধ সহ ধর্মীয় সংস্কার বর্তমান। অন্যদিকে অহল্যা বাঈ রূপবর্তে একজন দলিত, দাদাসাহেবের গৃহ চিকিৎসক। তাঁর সেবায় দাদাসাহেবের শারীরিক পুনর্জন্ম ঘটে, উত্তরণ ঘটে তাঁর মনোজগতেরও। চিকিৎসার পর তিনি সংস্কার মুক্ত মানুষ। - দাদাসাহেবের মতো তিয়াষের মধ্যেও অন্য এক নিঃসঙ্গতার জন্ম হয়। তিয়াষেরও মধ্যে ঘটে যায় অন্য এক উত্তরণ। নবলব্ধ অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ এক মানুষ তিয়াষ। সে এক পূর্ণ পুরুষ। স্বামী। প্রেমিক নয়, প্রণয়ী নয়। কোন পরকীয়া প্রেম নয়। সে প্রকৃতই খনিজ ভাণ্ডারের অনন্য অধীশ্বর। স্বামী - যার হাতে নির্ভাবনায় আপন ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের মণি মঞ্জুষার কুঞ্জি কাঠিখানি নারী অনায়াসে তুলে দিয়ে লাভ করে স্ত্রী অভিধা। তিয়াষ আজ সেই গোপন কুঞ্জিকাঠির অধিকারী।

রাতে হোস্টেলে ফিরে আসে তিয়াষ। হাঁটতে, চলতে কিংবা চোখ বুজলে - তিয়াষের সঙ্গে অনুক্ষণ ঘুরে বেড়ায় এক স্বপ্নসুন্দরী। যে এই মুহূর্তে আকাশের বুক চিরে উড়ে চলেছে দিল্লীগামী বিমানে। ক'মাসেরই বা পরিচয়! এই ক'মাসের মধ্যে তিয়াষের জীবনে বয়ে গেল একটা ভয়ংঙ্কর বিধ্বংসী ঝড়। তিয়াষ ভাবতেই পারছে না যে এক বিদেশিনী নারী স্বল্প পরিচয়ে তাকে ভালোবেসে তার সমগ্র জীবন তার জন্যই উৎসর্গ করে গেল। নিনি দিল্লী ফিরে গিয়ে তার পৌঁছ সংবাদ এস.এম.এস. করে তিয়াষের মোবাইলে জানিয়ে দিল। তিয়াষ বহুবার চেষ্টা করেও নিনির মোবাইলে কথা বলতে ব্যর্থ হোল। এস.এম.এস.ও পাঠানো যায় নি। নিনি কি তবে তার মোবাইলের সুইচ অফ করে রেখেছে? না সিম কার্ড পাল্টে ফেলেছে। মোবাইল সেট বার বারই এই ধরনের নম্বর নেই বলে জানান দিচ্ছে। নিনি কি তবে তিয়াষের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না। কিন্তু কেন?

দু'টি পালক



জুঁই এখনো ফিরে আসেনি। সুস্থ হয়ে ওঠার পর আবারো রাঙ্গা মাসী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। শারদীয়া পূজার ছুটি শুরু হয়েছে। তিয়াষ ভেবেছিল জুঁই সহ এবার পূজার ছুটি শান্তি নিকেতনে গিয়ে কাটাবে। রাঙ্গামাসী সুস্থ না হলে জুঁই আর আপাততঃ ফিরছে না। নিনি চলে গেল যে প্রায় একমাস হতে চলল। বিরহ বেদনা কিম্বা বিচ্ছেদ দহন, কোন কিছুর জন্যই সময় অনন্তকাল প্রতীক্ষা করে না। কালের গভীর যাত্রাপথে প্রতীক্ষার কোন স্থান নেই। দুর্যোগ থেমে গেলে বিশ্ব প্রকৃতি যেমন দুঃখ জয় করে ধীরে ধীরে শান্ত সমাহিত ভাব ফিরে পায়, তিয়াষও নিজের মধ্যে এক সময় থিতু হয়। 'এ জীবন ধীরে ধীরে বীতশোক হয়'। ইহাই এ জগতের অমোঘ নিয়ম। এ ভাবেই ঢেউয়ের মতো একটি স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। আবার নতুনতর স্বপ্নের সৃষ্টি হয়। ফুল ঝরে গেলে, ডালে নতুন কুঁড়ি জাগে। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবিস্মরণীয় কবিতা,

"জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।"

তিয়াষের জীবনেও কি এমনি পূজা অর্ধসমাপ্ত রয়ে গেল। পূজার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। আগরতলাও অনেকদিন যায়নি তিয়াষ। তবে বাবার সঙ্গে কয়েকবার দেখা করেছে। বাবা সরকারী কাজে দিল্লী কিংবা কলকাতা এলে তিয়াষ ত্রিপুরা ভবনে গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করে। - এরই মধ্যে জুঁই ফিরে এসেছে। ইংলিশ অনার্সের পার্ট-টু ফাইনাল। জুঁইয়েরও অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে। রাঙ্গা মাসী সুস্থ হয়ে উঠেছে। জুঁই ফিরে আসার খবর পেয়েও তিয়াষ একটি বারের জন্যও জুঁইয়ের সঙ্গে দেখা করেনি। প্রায়শই মোবাইল বেজে যায়। উত্তর আসে না। জুঁই বেশ কটি এস.এম.এস. পাঠিয়েছে, তিয়াষ কোন উত্তর দেয়নি। তিয়াষের কোন প্রকার রেসপন্স না পেয়ে জুঁই শংকিত হয়ে পড়ে। - আগরতলা থাকাকালীন কয়েকদিন কথা হলেও এখন কোন সাড়াই পাচ্ছে না। - তিয়াষ একদিন প্রসঙ্গ ক্রমে জুঁইকে তার রাশিয়ান বান্ধবীর কথা বলেছিল। মেয়েটি নাকি ভারী অমায়িক, বুদ্ধিমতী, সুন্দরী - অপরূপা তুলনাহীনা। - বলেছিল - সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে / দেখেছি

পথে যেতে তুলনাহীনারে। - তিয়াষ কি তবে সেই বিদেশিনীর রূপে মোহিত হয়ে জুঁইকে ভুলে যাচ্ছে? তিয়াষ দা কিএতই স্বার্থপর - এতই নির্দয় - নিষ্ঠুর। ভাবতে পারে না জুঁই। তার চোখে জল এসে যায়।

জুঁইও ছাড়বার পাত্র নয়। একদিন সে তার তিন বান্ধবীকে নিয়ে সরাসরি তিয়াষের হোস্টেলে হানা দেয়। গিয়ে দেখে রুমের দারজায় তালা দেওয়া। খোঁজ খবর করার পরও কেউই তিয়াষ সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে পারে না। তিয়াষের মোবাইলে ফোন করে। মোবাইলের স্যুইচ অফ্। বান্ধবীদের মোবাইল থেকেও ফোন করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু একইরকম ভাবে সাড়া এলো - সুইচ অফ্।

হতাশ জুঁই সঙ্গে সঙ্গে নন্দিতার মোবাইলে ফোন ধরে। অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসে নন্দিতার গলা। - হ্যালো জুঁই - হ্যাঁ - বল। - আসার পর তিয়াষদার সঙ্গে দেখা হয়নি - তিয়াষদা আমায় এড়িয়ে যাচ্ছে। ফোন করলে - ফোন ওঠায় না। - কোথায় গেছে বলতে পার? - কেন - সে তো কলকাতায় - ওই তো ঘন্টা খানেক আগে কথা হোল। কোথায় যেন বেরিয়েছে বললো। আজ রাতে ফিরবে না। আগামীকাল সন্ধ্যায় ফিরে আসবে - না, আর কিছু বলেনি - তোর কথা জিজ্ঞেস করলুম - কিছু বললো না - লাইন কেটে দিল না কেটে গেল বুঝলাম না - আব কথা হয়নি -। ঠিক আছে - ও কথা বললে আমি জিজ্ঞেস করবো - এখন রাখি।

জুঁই রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে-অভিমানে-অপমানে বান্ধবীদের সামনেই কেঁদে ফেলে। তিয়াষকে বার বার ধরবার চেষ্টা করে। মোবাইল জানিয়ে দেয় - নট রিচেবল। জুঁই তার অন্তরের উপলব্ধির দ্বারা বুঝবার চেষ্টা করে যে তিয়াষদার জীবনে নিশ্চিতই অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটেছে, যার জন্য ও আমার নিকট থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে? জুঁইয়ের মুখোমুখি হবার সাহস পাচ্ছে না?

জুঁই স্বগতোক্তির মতো বলে - সারা জীবন আমি ঠাকুরের পুজো করেছি। উপোস করে শিব ঠাকুরের ব্রত করেছি, ঠাকুরের মাথায় বেলপাতা দিয়েছি। আমার তপস্যা যে রাত্রির তপস্যা। আমার তপস্যা উমার তপস্যা। পালিয়ে বেশী দূর যেতে পারবে না তিয়াষ দা।

জুঁইয়ের সঙ্গে একই সময়ে ভর্তি হয়েছে নিনা, এলিনা টমাস, ডোরা স্মিথ। নিনা মেদিনীপুরের মেয়ে, এলিনা কেরালার আর ডোরার বাড়ি ইংল্যাণ্ড। এরা সবাই জুঁইয়ের খুব ভালো বন্ধু।

জুঁই একদিন ডোরাকে জিজ্ঞেস করেছিল - ডোরা, তুমি লণ্ডনে এত ভালো ভালো ইউনিভারসিটি থাকতে কলকাতায় পড়তে এলে কেন?

দুপটি পালক

ডোরা তখন বলে - আমার জীবনটা বড়ো বিচিত্র। আমার মা আইরিশ। বাবা ইংরেজ। লণ্ডনের বাসিন্দা। জাহাজের ক্যাপ্টেন। বাবা জাহাজে জাহাজে এদেশ - ও দেশ ঘুরে বেড়াতেন। সেবার বাবা রেঙ্গুন যান। সেখান থেকেই এক বার্মিজ মহিলাকে বিয়ে করে নিয়ে আসেন। আমার পাঁচ বছর বয়সে মা আমাকে ফেলে এক মিলিটারী অফিসারকে বিয়ে করে চলে যায়। আমার ঠাকুমা আমার সব দায়িত্ব নেন। আমার ঠাকুর্দা - ঠাকুমার এক ছেলে - এক মেয়ে। আমার আন্টি খুব ভালো। আমি আন্টির কাছেও গিয়ে থাকি। - আমার ঠাকুমা আমার বাবার বার্মিজ বৌকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি। বাবা ওই বৌটাকে নিয়ে কোথায় থাকে তা জানিও না। আমার ঠাকুর্দা অধ্যাপক। বেশ ক'বার ভিজিটিং অধ্যাপক হিসাবে কলকাতা এসেছেন। সঙ্গে ঠাকুমাকেও নিয়ে এসেছিলেন। সেই সময় থেকে তাঁদের কলকাতার প্রতি একটা মোহ জন্মে। আমার ঠাকুর্দা - ঠাকুমা তাদের সব বিষয় সম্পত্তি আমাকে উইল করে দিয়েছে। কলকাতা তাঁরাই আমাকে জোর করে পাঠিয়েছে। আবার আসার সময় বলে দিয়েছে - বাঙ্গালী ছেলেরা খুব ভালো। ওরা খুব হোম লাভিং। ওরা বৌকে নাকি খুব আদর করে। ঠাকুমা বলে দিয়েছে ভালো ছেলে পেলে বিয়ে করে নিয়ে যেতে। আমার পছন্দের ছেলেকে তারা মেনে নেবে।

জুঁই - তোমাদের দেশে তো বুড়ো - বুড়িরও বিয়ে হয়। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতো বিখ্যাত লোকও তো আশি বছর বয়সে নাকি চতুর্থবারের মতো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তুমি তোমার ঠাকুমাকে বলো এ দেশে এসে একটা বাঙ্গালী ছেলে বিয়ে করতে। আমরা নিজেরা বর খুঁজে দেবো। কি বলিস এলিনা?

জুঁইয়ের কথা শুনে সকলেই হো হো করে হেসে ওঠে। এর পর নিনা বলে - ডোরা, তুই কি পড়তে এসেছিস, না আমাদের বাঙ্গালী ছেলে ধরতে এসেছিস? এসব করিস না, পরে কিডন্যাপ কেইসে ফেঁসে যাবি।

এলনি - ডোরা, তোর ঠাকুর্দা ডাইভোর্স করতে রাজী হবে রে?

ডোরা - তবে কি তুই আমার ঠাকুর্দাকে বিয়ে করতিস্? লাভ হবে না, সব সম্পত্তি আমার নামে উইল করা।

নিনা - তোর ঠাকুর্দাকে বিয়ে করলে তো লণ্ডন যাওয়া যাবে। সেটাই বা আমাদের কম কী?

ডোরা - বাঙ্গালী বিয়ে করলে আমি আর লণ্ডনে স্থায়ী ভাবে ফিরবোনা। আমাদের পূর্ব পুরুষ জব চার্ণকের মতো এদেশেই ঘর বাঁধবো, এখানেই থেকে যাবো।

জুঁই এবার এলিনাকে বলে - তুই কি করবি এলিনা? তোরও কি এই মত?

এলিনা - আমার আপাততঃ কোন মত নেই। পড়া শেষ করে আমার একটা চাকুরী যোগাড় করতে হবে। আমাদের রাজ্য কেরালায় মেয়েদের বিয়ে দেওয়া খুবই কঠিন, আর ভীষণ ব্যয় বহুল। আমাকে বিয়ে দেবার মতো অত টাকা আমার বাবার নেই। এ নিয়ে আমার কোন ভাবনা চিন্তাও নেই। বিয়ে করতে হবে এমন বাধ্য-বাধকতাও নেই। বিয়ে তো অকারণ বন্ধন। ইচ্ছে করে হাতে-পায়ে বেড়ি পরা। পুরুষের দাসত্ব করা। বিয়েতে আমার অত উৎসাহও নেই। - এবার নিনার প্রতি মুখ ফিরেয়ে এলিনা বলে - নিনা, তুই কি ভাবছিস্? কোথাও জুটেছে তোর কেউ?

নিনা - জুটলে তো জানতিস্। আমারও আপাততঃ কোন সিদ্ধান্ত নেই। পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাববো। আর আমাদের বাড়ির অবস্থা তো তোদের সকলের চেয়ে খারাপ। বাবার একটা ছোট দোকান আছে। মা একটা প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকুরী করে। - ছোট ভাই এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। আর আমার মতো কালো মেয়েকে কে বিয়ে করবে বল?

জুঁই - কালো তো বাইরের রূপ। নারী তাব অন্তরের রূপেই আসল সুন্দরী। তুই কত ভালো মেয়ে। তোর বরের অভাব হবেনা।

জুঁইয়ের কথা শুনে সবাই চুপ করে যায়। আবহাওয়া একটু ভারী হয়ে ওঠায় ডোরা পরিবেশটাকে হাল্কা কবার জন্য জুঁইকে বলে - জুঁই, এবাব তোর কথা বল।

জুঁই - আমার কথা তো আমি তোদের বলেছি।

নিনা - বলেছিস, একজনকে ভালোবাসিস। আর তো কিছু বলিসনি।

জুঁই - আজ তো তোদের দেখাবো বলে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওতো নেই। কি করবো বল?

এলিনা - কবে থেকে তোদের সম্পর্ক রে? সে তো কিছু বলিস নি।

জুঁই - ছোটবেলা থেকেই আমরা একজন একজনকে ভালোবাসি। প্রেম-ভালোবাসার ব্যাপারটা সে বয়সে তেমন ভাবে না বুঝলেও - আমরা একজন আরেক জনকে না দেখলে থাকতে পারতাম না। এগার - বার বছর বয়স থেকে ধীরে ধীরে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ধারণা স্পষ্ট হয়। আর সে সময় থেকেই আমাদের ভালোবাসার শিকড় ক্রমশঃ প্রসারিত হতে থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা গভীর থেকে গভীরতর হয়। সে সময় একদিন আমি শিবঠাকুরকে পুজো দিয়ে ওর গলায় মালা পরিয়ে দিই। ওকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করতে পারবোনা। ওরই জন্য আমি কলকাতায় পড়তে এসেছি। ওকে না দেখলে আমি থাকতে পারিনা। সে যে আমার জীবনের 'সব পেয়েছির দেশ'। আমি যে

তপস্বীনি উমা। শিবের সঙ্গে উমা ছাড়া আর কারো বিয়ে হয়না, হতে পারে না। আমি বিরহিনি রাধিকা সাজতে পারবোনা - আমি সত্যভামা।

নিনা - সেই কবে থেকে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস - আর আমাদের বললি মাত্র এবার বাড়ি থেকে এসে। তুই কেমন স্বার্থপর একবার ভাব্ তো।

জুঁই - প্রেম করিস নি তো। তাই প্রেমের বেদনা বুঝতে পারবিনা। প্রেমের ব্যাপারে সব মেয়েরাই স্বার্থপর হয়। সব সময় একটা 'হারাই হারাই' ভাব থাকে।

ডোরা - তোর প্রেমিককে একদিনও দেখালিনা? কি রকম মেয়েরে তুই?

জুঁই - আমি তোদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলুম, আর তোরা যদি ভাগিয়ে নিয়ে যাস - তখন আমার অবস্থা কি হবে ?

নিনা - তার উপর তোর বুঝি কোন আস্থা নেই - বিশ্বাস নেই?

জুঁই - টাকা আর পুরুষ মানুষকে কোনদিন বিশ্বাস নেই। দুটোকেই শক্ত মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতে হয়। মুঠো শিথিল করলেই বিপদ। যে কোন সময় পালিয়ে যেতে পারে।

নিনা - আমরা তো এত কথা জানিনা। তুই এত কথা জানলি কেমন করে?

জুঁই - প্রেম করলেই জানতে পারবি।

এলিনা - তোর প্রেমিক পালিয়ে গেলে কি করবি? ও যদি সত্যি সত্যিই পালিয়ে যায়?

জুঁই - আমি যদি ওকে খুঁজে না পাই, তবে আমার অবস্থা হবে জ্ঞানদাসের রাধার মতো। বলেই জুঁই বিষাদ মাখা গলায় গেয়ে ওঠে,

"গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে
যেখানে নিঠুর হরি।
মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিব যোগিনী হইঞা -
যদি কারু ঘরে মিলে গুননিধি
বাঁধিব বসন দিয়া।"

গাইতে গাইতে কেঁদে ফেলে জুঁই। তিনজনই একসঙ্গে জড়িয়ে ধরে তাকে। সান্ত্বনা

দিতে দিতে বলে - তোর প্রেমিক তোরই থাকবে। যাবে কোথায়? তোকে পরীক্ষা করে দেখছে, তোর তার প্রতি সত্যিকারের টান কতটুকু।

জুঁই - কিসের পরীক্ষা রে? জীবনে তো কত পরীক্ষাই দিয়ে এলুম। আর পরীক্ষা দিতে পারবনা।

বলেই জুঁই ফের কেঁদে ফেলে।

ডোরা - চিন্তা করিস না জুঁই। তোদের এতদিনের প্রেম ব্যর্থ হতে পারে না। সাহিত্যে পড়িস নি - বিরহের আগুনে পুড়ে প্রেম নিখাদ সোনা হয়।

ইতিমধ্যে আরো সাত-আটদিন কেটে গেছে। জুঁই রাগ করে আর তিয়াষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টাই করেনি। তিয়াষ নিজে থেকে জুঁইয়ের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ করছে না। জুঁই বিগত কিছুদিন ধরেই উদাস, উদভ্রান্ত। খাওয়া-দাওয়ার প্রতিও কেমন যেন অরুচি অরুচি। পড়াশুনোয় মন বসছে না। পরীক্ষারও খুব একটা দেরী নেই। শেষে জুঁইয়ের তিন বান্ধবীই তিয়াষকে পাকড়ানোর ব্যবস্থা করলো। তিয়াষের মোবাইল নাম্বার তাদের কাছে ছিল। সেদিন তাদের তিন বান্ধবীকে দিয়েই তিয়াষের কাছে ফোন করেছিল। জুঁইয়ের কাছ থেকে তিয়াষের একটা ছবি অনেক কষ্টে তারা যোগাড় করল। তারপর তিনজনই গোয়েন্দা গিরিতে নেমে পড়ল।

তারা তিন বান্ধবী যুক্তি করে ঠিক করলো যে এলিনা ও ডোরা তিয়াষের সঙ্গে দেখা করবে। নিনা যাবে না। নিনা বাঙ্গালী। নিনা গেলে তিয়াষ সন্দেহ করতে পারে। অনেক চিন্তা ভাবনা করে তারা একটি পাব্লিক টেলিফোন বুথে ঢুকে তিয়াষকে তার মোবাইলে ফোন করে। - অচেনা নাম্বার দেখে তিয়াষ প্রথমে মোবাইলের কানেকশান কাট করে দেয়। ডোরা বুঝতে পারে তিয়াষ স্টেশনেই আছে। অচেনা নাম্বার দেখে কল রেসপন্স করেনি। আবার ফোন করে ডোরা। এবার ওপার থেকে সাড়া মেলে - হ্যালো! কে বলছেন?

ডোরা - প্লিজ স্পিক ইন ইংলিশ। আই অ্যাম ডোরা স্মিথ ফ্রম লণ্ডন। নাউ আই অ্যাম হিয়ার ইন ক্যালকাটা।

তিয়াষ - ও, কে। লেট মি নো হোয়াই ইউ কলড্ মি?

ডোরা - আই উড লাইক টু টেক অ্যাডমিশন ইন সি.ইউ। উড ইউ কাইণ্ডলি হেল্প .মি?

তিয়াষ - হ্যোয়াট ফেভার ডু ইউ নিড?

ডোরা - ক্যান আই মিট ইউ? ক্যান আই?

তিয়াষ - ওহ্! অফকোর্স!

ডোরা - হ্যোয়ার উই উড মিট?

তিয়াষ - প্লিজ কাম টুমরো অ্যাট ফাইভ পি.এম.। আই শেল বি অ্যাট্ কফি হাউজ। ডু ইউ নো কফি হাউস?

ডোরা - আই মাস্ট ফাইণ্ড ইট আউট। বাট হাউ আই উড আইডেন্টিফাই য়্যু।

তিয়াষ - কামিং হিয়ার মেক অ্যা কল টু মাই মোবাইল। আই উড পিক য়্যু আপ। ও.কে.।

ডোরা - ও. কে. মেনি মেনি থ্যাঙ্কস্। বাই।

বলেই রিসিভার রেখে দেয়। তাদের পরিকল্পনায় তারা সার্থক হওয়ায় বেশ খুশী। ঠিক হলো ডোরা একাই তিয়াষের সঙ্গে দেখা করবে। তবে তারা চারজনই কফি হাউজের উদ্দেশ্যে একসঙ্গে যাবে। কফি হাউজ তাদের প্রত্যেকেরই চেনা। জুঁই, নিনা ও এলিনা কফি হাউজের বাইরে বুক স্টলের সামনে অপেক্ষা করবে। পরিকল্পনা মত চারজনই সময়মতো কফি হাউজের সামনের গলিতে একটা ট্যাক্সী করে নেমে পড়ে। বিদেশিনী ডোরা এর আগেও বার কয় কফি হাউজে এসেছে। একা একা টোষ্ট কফি খেয়ে বেরিয়ে গেছে। উপযাচক হয়ে কখনো কখনো দু'একটা ছেলে-মেয়ে কথা বলেছে। হাল্কা উত্তর দিয়ে ডোরা এড়িয়ে গেছে।

ডোরা একটা চেয়ারে বসে পড়ে। যাতে যে কোন আগন্তুককে দেখতে পায়। ডোরা সময়ের একটু আগেই এসে গেছে। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে তিয়াষের ছবিটা বের করে বার কয় চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার রেখে দেয়। বেয়ারাকে এক কাপ কফির অর্ডার দেয় ডোরা। জুঁইয়ের বর্ণনা মত এবং ভ্যানিটি ব্যাগের ছবির মুখের আদলে যে যুবকটি কফি হাউজে পাঁচটার মুখে ঢুকল, সে যথার্থ অর্থেই হ্যাণ্ডসাম, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। চেহারায় মেধা ও বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট। একটা টেবিলের সামনে গিয়ে বসে পড়ে সে। এদিকে বেয়ারা ডোরাকে কফি দিয়ে গেছে। স্পুনটা নাড়তে নাড়তে আড়চোখে তিয়াষকে দেখছিল ডোরা আর মনে মনে জুঁইয়ের প্রতি তার খুবই ঈর্ষা হতে লাগল। তিয়াষকে দেখামাত্রই যে কোন যুবতী মেয়ের হার্ট থ্রব হতে বাধ্য। ডোরা সত্যিই তার নিজের হৃদয় সংবরণ করতে পারছিল না। তিয়াষ অধৈর্যের মতো বার বার গেইটের দিকে তাকাচ্ছিল আর ঘড়ি দেখছিল। কফির কাপ শেষ করে তিয়াষের টেবিলের কাছে এগিয়ে যায় ডোরা। - তারপর তিয়াষকে জিজ্ঞেস করে - প্লিজ, এক্সকিউজ মি।

তিয়াষ বলে - ইয়েস প্লিজ।

দু'টি পালক

ডোরা - আর য়্যু তিয়াষ? আই অ্যাম ডোরা স্মিথ।

তিয়াষ - ও, ইয়েস। আই অ্যাম ওয়েটিং ফর য়্যু। দ্যান, হাউ ক্যান আই হেল্প য়্যু?

ঠিক এ সময় এলিনা এসে প্রবেশ করে। উজ্জ্বল শ্যামলা। সপ্রতিভ। স্লিম। বেশ লম্বা। একরাশ কালো চুল। চেহারায় দক্ষিণ ভারতীয় ছাপ স্পষ্ট। ডোরার সামনে গিয়ে বলে। - ওহ ডোরা! হাউ সিলি! হোয়াই য়্যু লেফ্‌ট মি এলোন?

ডোরা এবার এলিনাকে তিয়াষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে - শী ইজ মাই ফ্রেণ্ড এলিনা টমাস।

তিয়াষ - প্লিজ বী সীটেড। টী, কাফি অর কোল্ড ড্রিংকস।

ডোরা - জাস্ট আই হ্যাভ টেকেন কাফি। ডু য়্যু এলিনা?

এমন সময় জুঁই ও নিনা প্রবেশ করে।

নিনা বলে - তোরা এখানে। আর তোদের আমরা খুঁজে খুঁজে হয়রান।

ডোরা বলে - নিনা, ইনি মিঃ তিয়াষ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রির ছাত্র। থার্ড সেমিস্টারের প্রিপারেশন নিচ্ছেন।

নিনা - হাই। আই অ্যাম নিনা। ও আমাদের বন্ধু বিপাশা।

জুঁই কোন কথা বলে না। জুঁইয়ের চোখে রোদ চশমা। রঙিন কাচের মধ্য দিয়ে জুঁই সব দিক দেখছে।

তিয়াষের পুরো ব্যাপারটা বুঝতে আর বাকী রইলো না। তিয়াষের খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল। জুঁইয়ের সামনে এমন বিব্রতকর অবস্থায় তাকে পড়তে হবে তা সে ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি।

ডোরা - মিঃ তিয়াষ! আপনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন কেন? কিছু একটা বলুন।

তিয়াষ মাথা নীচু করে বসে থাকে। তাকাতে পারে না। জুঁইয়ের সামনে ধরা পড়ে তিয়াষ বড়ো অসহায় বোধ করছে।

নিনা বলে - মিঃ তিয়াষ, আপনার কোন অসুবিধা না থাকলে আমরা অন্য কোথাও গিয়ে বসতে পারি। কোন হোটেল, রেস্টুরেন্ট। বেটার, আমরা ভিক্টোরিয়ার সামনে গিয়ে বসি।

এলিনা - সেই ভালো।

ডোরা - বিপাশা (জুঁই), তুই তো কিছু বলছিস্ না।

নিনা - আমরা ওখানে গিয়ে ফুচকা খাবো। মিঃ তিয়াষ, আপনার তো আবার পছন্দ ঝালমুড়ি। ঠিক বললাম তো?

অস্বস্তি কাটিয়ে তিয়াষ বলে - সেই ভালো। এখন তো ভিক্টোরিয়ার ভেতরে ঢুকতে দেবে না। আমরা বরং খোলা মাঠে গিয়ে বসি।

বিপাশা বেশী জুঁই খুব মজা পাচ্ছিল। সে একেবারে চুপ। কোন কথাই বলছে না।

এলিনা - বিপাশা, তুই গিয়ে একটা ট্যাক্সী ঠিক করে ফেল। ঠিক আছে আমিও তোর সঙ্গে আসছি। চলুন মিঃ তিয়াষ, তবে আমরা বরং বেরিয়ে পড়ি।

সকলেই তিয়াষকে এসকর্ট করে বেরিয়ে পড়ে কফি হাউজ থেকে। তাদের নিষ্ক্রমণ দৃশ্য সকলেই উপভোগ করছিল। কেউ কেউ আড়চোখে তাকালেও কোন মন্তব্য করে না। কলকাতার ইহাই সবচেয়ে বড়ো নাগরিক শিষ্টাচার। কেউই কারো ব্যাপারে একেবারেই নাক গলাতে চায় না। কার ছেলে - কার মেয়ে - কোথাকার কে - এসব নিয়ে কারো কোন মাথাব্যথা নেই। সকলেই একটা ট্যাক্সী নিয়ে উঠে পড়ে।

যেতে যেতে ডোরা কৌতুকের স্বরে বলে - এতকাল শোনা যেত ছেলেরা মেয়েদের কিডন্যাপ করে। এবার তো উল্টোটা ঘটছে। এবার মেয়েরা ছেলেদের কিডন্যাপ করবে। - কেমন লাগছে আপনার - মিঃ তিয়াষ?

ট্যাক্সীতে ওঠার পর তিয়াষ মনে মনে বেশ মজা পাচ্ছিল। কোন উত্তর না দিলেও অনেকদিন পর জুঁইয়ের সান্নিধ্যে এসে তিয়াষ বেশ হাল্কা বোধ করে। যে আত্মকৃত বাধা এতকাল তিয়াষকে জুঁইয়ের থেকে আলাদা করে রেখেছিল, তা দূর হওয়ায় তিয়াষ মনে মনে বেশ স্বস্তি বোধ করে। এমনটা না হলে যে তিয়াষকে আরো কিছুদিন হয়তো এমনি পালিয়ে বেড়াতে হতো। যে আত্মগ্লানির বেদনা বোধ তিয়াষকে ভেঙ্গে চুরে দিয়ে গেছে, আজ এক নিবিড় সন্ধ্যার বিহ্বল মাধুর্যে যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। ট্যাক্সী ভাড়া ডোরাই মিটিয়ে দিল। ভিক্টোরিয়াতে ঢোকার জন্য তখনো টিকিট দিচ্ছিল। - তারা পাঁচটা টিকিট নিয়ে চাঁদ ও বিদ্যুতের আলো মেশানো নুড়ি বিছানো পথ পেরিয়ে লেকের ধারে একটা নাগকেশরের ছায়ায় গিয়ে বসে। ওখান থেকে নাগচম্পার গাছটা চোখে পড়ছে।

জুঁই তার চোখের রোদ চশমা খুলে তিয়াষের মুখের দিকে তাকিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করে - তিয়াষদা, তুমি আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? - জুঁইয়ের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তিয়াষ মাথা নীচু করে চুপ হয়ে থাকে। - জুঁই তিয়াষের নীরবতার প্রতি ইঙ্গিত করে আবার বলে - তুমি চুপ করে থাকলে তোমায় আমি ছেড়ে দেব, তা তুমি ভেবো না। - আমি তোমায় কোনদিন ছাড়ব না। আমি ছাড়লেও আমার এই বান্ধবীদের দেখছ - এরা

তোমায় ছাড়বে না। আমি এদের কাছে সব কথা বলে দিয়েছি।

নিনা এবার তিয়াষকে ফোড়ন কেটে বলে - মিঃ তিয়াষ, মা সরস্বতীকে সেদিন যখন আপনি আভূমি নত হয়ে প্রণাম করলেন - দেবী সরস্বতী আপনাকে কোন রকম আশীর্বাদ না করেই হাওয়া হয়ে গেলেন। - শুনেছি আপনি চোখ বুঝে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলেছিলেন। - আপনি মাটির মূর্তি আর একটা জলজ্যান্ত মানুষের মধ্যেও কোন ফারাক বুঝতে পারলেন না? আশ্চর্য মানুষ তো আপনি।

তিয়াষ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। তারপর জুঁইয়ের বান্ধবীদের উদ্দেশ্যে বলে - আপনাদের সকলকে সত্যিই ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাদের যোগদানের জন্য। সত্যিই অসাধারণ চিত্রনাট্য আপনাদের। সিনেমা-সিরিয়ালকে হার মানাবে। আর সর্বোপরি আপনাদের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।

এলিনা - এ সবই ডোরার বুদ্ধি। ওরই প্ল্যান।

তিযাষ - আপনি বরং স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যোগ দিন। আপনি লেডি শার্লক হোমস হিসাবে বেশ সুনাম কুড়োবেন।

এবার জুঁই বলে - তিয়াষ দা, আমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখনো দাও নি।

তিয়াষ এবার জুঁইকে বলে - জুঁই, তোমে আমি সব কথা বলতে পারব না। তুই কখনো সে সব কথা জানতেও চাস না। তোর বাড়ি যাওয়া ও আসার ফাঁকে এই সময়ে আমার জীবনে প্রবল ঝড় বয়ে গেছে। সেই ঝড়ে আমার সমস্ত অস্তিত্ব কেমন যেন বিপন্ন, আমি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত।

জুঁই তিয়াষের দিকে চোখ তুলে চায়। সন্ধ্যার আলোয় স্পষ্ট না দেখা না গেলেও জুঁই বুঝতে পারে যে তিয়াষের আগের চেহারা নেই। আসলে এ কী চেহারা হয়েছে তিয়াষের। সেই উজ্জ্বল গভীর চাউনি অস্তমিত। শরীর কেমন ভেঙ্গে গেছে। চুল উস্‌কো-খুস্‌কো। এক উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা।

জুঁই - তুমি আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন তিয়াষ দা? তুমি তো কোনদিন আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করনি। তোমাকে ছাড়া তো আমি বাঁচব না। আমাকে তুমি কষ্ট দিও না তিয়াষ দা।

তিয়াষ - তোকে আমি কষ্ট দিতে পারব না বলেই তো আমি এত কষ্ট পাচ্ছি রে।

জুঁই - বল না তিয়াষ দা কি হয়েছে তোমার। দুঃখটা জানলে যে আমিও ভাগ করে নিতে পারি।

জুঁই আর তিয়াষ যখন কথা বলছিল, তাদের কথা বলার সুযোগ দিয়ে নিনা, ডোরা

ও এলিনা উঠে গিয়ে লেকের অন্যদিকে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায়।

তিয়াষ - আমার দুঃখ আমাকে বইতে দে। দুঃখের কোন চিরস্থায়ী আকার হয় না। সবই একদিন থিতিয়ে যাবে, আবার সবই আগের মতো হয়ে যাবে রে। ভাবিস না আমি তোকে ফেলে কোথাও যাবো । কোথাও যেতে হলে তোকে নিয়েই যাবো।

ইতিমধ্যে জুঁইয়ের বান্ধবীরা ফিরে এসেছে। তারা সবাই চারদিকে ঘাসের উপর বসে পড়ে। জুঁই তিয়াষকে লক্ষ্য করে বলে - এরা সবাই আমার ভালো বন্ধু তিয়াষ দা। এ হলো ডোরা, ওর বাড়ি সত্যই লণ্ডন। ও এলিনা - কেরালার মেয়ে, ও নিনা - ওর বাড়ি মেদিনীপুর।

জুঁইয়ের কথা শেষ হতে না হতেই নিনা বলে - আমরা সবাই লেডী ব্রেবোন কলেজের ইংরেজী অনার্সের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। আমরা সবাই এবার থেকে তোমাকে তিয়াষ দা বলেই ডাকব। তুমি কিন্তু আমাদের নাম ধরেই ডাকবে। কোন আপত্তি করবে নাতো।

তিয়াষ - তাই হবে।

সেদিন থেকে তারা সবাই স্বাভাবিক হয়ে যায়। জুঁই হোস্টেলে ফিরেই নন্দিতাকে তিয়াষের সম্পর্কে সব জানায়। খবর পেয়ে দু'দিন পরই তপোধীর কলকাতায় চলে আসে। যথারীতি প্রিটোরিয়া স্ট্রীটের ত্রিপুরা ভবনেই ওঠে। তপোধীর আসার আগেই তিয়াষকে তার আসার কথা জানায়। তিয়াষ এয়ারপোর্ট না গিয়ে সোজা ত্রিপুরা ভবনে চলে আসে। তিয়াষের চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে কিছু একটা ঘটেছে। তিয়াষকে দেখলেই মনে হয় ঝড়ে ভেজা পাখি। কিন্তু তিয়াষ তপোধীরকেও কোনা কথা জানায় না।

তপোধীরই তিয়াষকে জিজ্ঞেস করে - বাবুন তোর কি হয়েছে রে ? কোন গোলমাল ? বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কোন ঝামেলা ?

তিয়াষ - বাবা, তোমাদের উদ্বিগ্ন হওয়া বা দুশ্চিন্তা করার মতো কিছু ঘটেনি। অন্য ঝামেলা গেছে। তোমায় বলতে পারব না। জিজ্ঞেস করো না। এখন ভালো আছি। সব চুকিয়ে ফেলেছি। আমার রেজাল্ট নিয়েও কিছু ভেবো না। কিছু ক্ষতি তো হয়েছে। পুষিয়ে নেবো।

জুঁইও তপোধীরের আসার খবব পেয়েছিল। জুঁই ও তার প্রমীলা ব্রিগেড নিয়ে হাজির হলো। তপোধীরের সঙ্গে কথা বলে সবাই বেশ খুশী। তপোধীর মার্জিত রুচির এক হিরন্ময় ব্যক্তিত্ব। প্রখর জ্ঞান ও বাস্তবতার সঙ্গে মিলেছে শালীনতা বোধ। ধর্ম, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি-অর্থনীতি, সমাজ-সাহিত্য বিষয়ে যেন এক জীবন্ত বিশ্ব কোষ। সর্বোপরি তিনি সুলেখক ও দক্ষ প্রশাসক। প্রকৃত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। তার সঙ্গে সকলেই

জমিয়ে আড্ডায় মেতে উঠলো। তপোধীর সকলকেই দুপুরে তার সঙ্গে ত্রিপুরা ভবনেই লাঞ্চ সেরে নিতে বলল। কিচেনের সুপকারকে বলে দু'একটি স্পেশাল মেনুও করিয়ে নিল।

খেতে খেতেই ডোরা প্রস্তাব দেয় - আঙ্কেল, আমাদের নিয়ে কিন্তু তোমার বেড়াতে যেতে হবে। টাকা-পয়সার কথা ভাববে না। আসা-যাওয়া, থাকা-খাওয়ার সব খরচই আমার। আমার ঠাকুর্দা পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ডের মালিক। তারপর লণ্ডন শহরে টেমস নদীর পারে বিশাল বাড়ি। আমিই সবকিছুর বৈধ উত্তরাধিকারী। তুমি ব্যবস্থা কর, কোথায় যাব ঠিক করে নাও।

তপোধীর - আমায় একটু ভাবতে দাও। আমি তো সেভাবে প্রস্তুত হয়ে আসিনি। আচ্ছা তোমাদের উইনটার ব্রেক কবে থেকে শুরু হচ্ছে? এলিনাই উত্তর দিল - দু সপ্তাহের ব্রেক। ছাব্বিশে ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে। কলকাতায় তো এই জমাটি ডিসেম্বরেও শীত নেই। আসলে প্রকৃতিতে প্রতিটি মুহূর্তে ভয়ংকর রকমের পরিবর্তন ঘটে চলেছে। শীতে শীত নেই, বর্ষায় বৃষ্টি নেই, শরতের নান্দনিক সৌন্দর্য নেই, বসন্তের আগমনের কোন সংকেত পাওয়া যায় না। সারা বছর ধরেই উষ্ণতা, ভ্যাপসা গরম। মানুষের মধ্যেও তার প্রতিক্রিয়া - তার ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। এই অতি উত্তাপের কারণেই যে মানুষের মধ্যে হিংসা-বিভেদ-অসূয়া বেড়ে চলেছে। অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে। অরণ্যের প্রশান্তি ভঙ্গের মতো মানব সমাজের শান্তি-সুস্থিতিও আজ সমান তালে বিঘ্নিত হচ্ছে। শীত মানুষের মধ্যে শীতলতা এনে দেয়। মানুষের ক্রোধকে প্রশমিত করে। গ্রীষ্মে বিষাক্ত সরীসৃপের আনাগোনা বেড়ে যায়। বিশ্ব উষ্ণায়নের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ব জুড়ে ক্রমশঃ হিংসা হানাহানি বেড়ে চলেছে। বিশ্বের সমগ্র জাতিসত্তা-সমগ্র মানবজাতির এ বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করার সময় এসে গেছে। উষ্ণায়ন যেমন মানবসভ্যতাকে অনিবার্য ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে চলেছে, তেমনি বহু মানুষের সম্পর্কও কালাগ্নির মতো হিংসার কুটিল আবর্তে নিত্যই নির্জিত হচ্ছে। মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের আগুনে পুড়ছে শষ্য-শ্যামলা এই সুন্দর মাটির পৃথিবী - সর্বংসহা মৌনী বসুন্ধরা।

তপোধীরের কথা শুনতে শুনতে সকলেই কেমন অভিভূত হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে লাঞ্চ হয়ে গেছে। তপোধীর হিসাব করে দেখে আজ বাইশে ডিসেম্বর। তপোধীর মনে মনে ঠিক করে নেয় - কয়েক দিনের জন্য পুরী যাওয়াই ভালো। নন্দিতা ও হিমাদ্রিদের খবর দিয়ে আনতে গেলেও দুই-তিন দিন সময় লেগে যাবে। তাছাড়া তপোধীরকে ছুটি বাড়ানোর জন্য দরখাস্ত করতে হবে। তপোধীর সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে - আজ তো তোমরা কেউই কলেজ গেলে না। কাল-পরশু ক্লাস করে নাও। আমি আপাততঃ পঁচিশ পর্যন্ত

এখানে আছি। এ দু'দিন আমার কিছু অফিসিয়াল কাজ আছে। দু'দিন পর আমার সিদ্ধান্ত জানাবো। আজ তোমাদের ভাবনা চিন্তা কি বল?

নিনা বলে - সন্ধ্যায় আমরা নাটক দেখতে পারি না আঙ্কেল? অথবা মেট্রোতে বা প্যারাডাইসে কোন সিনেমা? একাডেমী অফ্ ফাইন আর্টসে শাঁওলা মিত্রের 'নাথবতী অনাথবৎ' মঞ্চস্থ হবে। তিয়াষ টিকিট কাটতে যাবে। না পেলে যে কোন হলে সিনেমা। - তিয়াষ আগে ভাগে চলে গেল টিকিট আনতে। পেলো না। শেষ পর্যন্ত নন্দনে সিনেমা দেখলো। কাঁটা তারের বেড়া। ভালোই লাগল। বেরিয়ে ধর্মতলার একটি রেস্টুরেন্টে সকলেই ডিনার সেরে নিল। মেয়েরা সকলেই ডিনার শেষে তাদের হোস্টেলে চলে গেল। তিয়াষ রাত্রে আর হোস্টেলে না ফিরে বাবার সঙ্গে ত্রিপুরা ভবনে চলে এলো। অনেক রাত পর্যন্ত পিতা-পুত্রে অনেক কথা হোল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। মাথার উপর ফুল স্পীডে পাখা চলছে। মাঝরাতে উঠে তপোধীর পাখা বন্ধ করে দিল। শেষ রাতের দিকে হঠাৎ করেই শীত পড়লো। কম্বলটা ঘুমের মধ্যে গায়ে টেনে নিল।

ভোররাতে ঘুমের ঘোরে তিয়াষ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলো। তারা সবাই দল বেঁধে কোথায় যেন বেড়াতে চলেছে। ট্রেনের ঝকর-ঝক্-ঝকর-ঝক্ শব্দে সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ প্রবল বৃষ্টি। বৃষ্টির তোড়ে তাদের ট্রেনের বগীটা লাইন চ্যুত হয়ে রেলরাস্তার একপাশে পড়ে গেল। তখনো কারো ঘুম ভাঙ্গে নি। তিয়াষ একা কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। বাইরের অবস্থা দেখার জন্য বগীর দরজা খুলে সে বাইরে এসে দাঁড়ালো। হঠাৎ কোথা থেকে প্রবল তোড়ে ধেয়ে এলো বিপুল জলরাশি, আর তিয়াষকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। অতিকষ্টে মাথা তুলে স্রোতের উপর ভেসে উঠল তিয়াষ। প্রচণ্ড আত্মশক্তিতে স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটতে লাগলো। কিন্তু ঢেউ এর প্রবল টানে কেবলই পিছিয়ে যেতে থাকে। হঠাৎ আকাশ থেকে দুই দিক থেকে দুটো হাত নেমে এলো। তিয়াষ তার দুই হাত দিয়ে হাত দুটো ধরলো। আর হাত দুটো অক্লেশে ঢেউ এর উপর দিয়ে তিয়াষকে টেনে নিয়ে তীরে পৌঁছে দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। নির্জন বেলাভূমিতে তিয়াষ একা। জ্ঞান ফিরে এলে তিয়াষ চোখ মেলে তাকায়। দেখে এক অপূর্ব সুন্দরী বিবস্ত্রা রমনী আকাশ থেকে একগুচ্ছ পারিজাত ফুল নিয়ে নেমে এসে তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সেই দিব্যকান্তিললনা তিয়াষের দিকে অশ্রুপূর্ণ চোখে তাকিয়ে বলে-তুমি আমায় চিনতে পারছ না- তিয়াষ দা, আমি যে তোমার জুঁই।

হঠাৎই কলিং বেলের আওয়াজে নিদ্রা টুটে যায়। বিছানা ছেড়ে ঘুম জড়ানো চোখে উঠে দরজাটা খুলে দেয় তিয়াষ। দেখে পত্রিকার হকার দাঁড়িয়ে। একটি প্রভাতী দৈনিক নিয়ে পত্রিকার দামটা দিয়ে দেয় তিয়াষ। বাবা হয়তো প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছে। বাথরুম

সেরে পত্রিকাটা নিয়ে বসে তিয়াষ। - হঠাৎ আপাত সাদৃশ্যহীন স্বপ্নের মানে খুঁজতে গিয়ে কোন সঙ্গতি বা পারম্পর্য খুঁজে পায় না তিয়াষ।

সকালে তপোধীর বেরিয়ে নন্দিতা ও হিমাদ্রির সঙ্গে কথা বলে নিল। তাদের বললো - দিন দশেকের ছুটি নিয়ে কলকাতায় চলে আসতে। সবাই মিলে শীতের মরশুমে ক'দিন পুরী বেড়িয়ে আসবে। তপোধীরের কথায় সবাই একবাক্যে রাজী হয়ে গেল। চব্বিশে ডিসেম্বর সন্ধ্যার ফ্লাইটে তারা তিনজন কলকাতায় চলে এলো। তপোধীর পুরী এক্সপ্রেসে আসা-যাওয়ার টিকিট কেটে নিল। ছাব্বিশে সন্ধ্যা আটটায় ট্রেন ছাড়বে। পুরীতে তিন দিনের প্রোগ্রাম।

জুঁইকে খবর দেওয়া হলো তার বাবা-মা ও নন্দিতা আসছে। খবর শুনে সবাই খুবই আনন্দিত। দল বেঁধে তাঁদের এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করে আনা হোল। তপোধীর ত্রিপুরা ভবনে তাদের জন্য আলাদা রুম ভাড়া করে রেখেছিল। ফলে কারো কোন অসুবিধা হলো না।

সকলেই একসঙ্গে জড়ো হওয়ার পর তপোধীর তাদের পুরী ভ্রমণের খবর ঘোষণা করল। আনন্দে সবাই - হিপ্ - হিপ্ - হুরবে বলে একসঙ্গে চীৎকার করে উঠলো। স্বর্গদ্বারে তারা যথারীতি একটা ভালো হোটেল পেয়ে গেল। তাদের ন'জনের জন্য তারা থ্রি-সিটেড তিনটি ভালো স্যুইট বুক করলো। হোটেল আপ্যায়ন। মালিক-ম্যানেজার উভয়েই বাঙ্গালী। থাকা-খাওয়ার ভালো ব্যবস্থা রয়েছে।

সাতাশে ডিসেম্বর ভোর বেলা তারা পুরী স্টেশনে গিয়ে নামল। ভোর চারটে। শীতের পুরী স্টেশন। কুয়াশার চাদর দিয়ে মোড়া। সকলেরই গায়ে হাল্কা শীতবস্ত্র। কুলীর সাহায্যে মালপত্র নামিয়ে তারা স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এলো। ট্যাক্সী আগেই বুক করা ছিল। একটি ছেলে তপোধীরের নাম লেখা প্লেকার্ড নিয়ে স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। তপোধীর পরিচয় দিয়ে দুটো ট্যাক্সীতে ভাগ করে উঠে পড়ল। নির্ধারিত হোটেলে পৌঁছে তারা গীজার চালিয়ে দিয়ে গরম জলে স্নান করে ফ্রেস হয়ে নিয়ে জগন্নাথ দর্শনের জন্য তৈরী হয়ে নিল। ডোরাও শাড়ী পরে নিল। জীবনে এই প্রথম তার শাড়ী পরা। শাড়ী পরে চলতে ফিরতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল তার। জগন্নাথ দর্শনে গিয়ে তারা এক নতুন অপ্রত্যাশিত বিভ্রাটে পড়ল। শ্বেতাঙ্গিনী ডোরাকে তারা কিছুতেই মন্দিরে ঢুকতে দেবে না। জগন্নাথের মন্দিরে বিধর্মীর প্রবেশ নিষেধ। এলিনাও খ্রীষ্টান। তাই সে নিজে থেকেই নিজেকে বিরত করল। ডোরা বা এলিনা মনে কিছু করলো না। তপোধীর ও তিয়াষ ও বেঁকে বসল। জুঁইও ডোরা এবং এলিনাকে ফেলে যাবে না। এই অবস্থায় পাণ্ডার অবস্থা খুবই খারাপ। তার আজকের দিনের শাঁসালো রোজগার নষ্ট হতে চলল। অগত্যা পাণ্ডাই বিকল্প ব্যবস্থা করে দিল।

সকলেই মন্দিরে গিয়ে পুজো দিতে পারবে। কিন্তু ডোরা ও এলিনা জগন্নাথের বেদী স্পর্শ করতে পারবে না। এই শর্তে কারো আপত্তি রইলো না। সকালেই তাদের জগন্নাথ দর্শন হয়ে গেলে তারা হোটেলে ফিরে ব্রেকফাস্ট সেরেই চিল্কার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল।

চিল্কার ঘোলা জল কেটে স্পীড বোট তর তর করে এগিয়ে যায়। কেউ ফিরে আসছে, কেউ যাচ্ছে। চিল্কার মাথার উপর রোদের চাদর। বোটে হাওয়ার আমেজ। ডোরা তার ভিডিও ক্যামেরায় দৃশ্য বন্দী করে চলেছে। সকলের হাতেই ক্যামেরা। তিয়াষ একটি ডিজিটাল ক্যামেরা কিনেছে। বোট থেকে তারা যেখানে গিয়ে নামে - সেটা সমুদ্র সৈকত। বালু বেলার উপর অস্থায়ী ছাউনি খাটিয়ে কয়েকটা দোকান। চা, তেলেভাজা, নরম পানীয়, বোতল বন্দী জল। সবই পাওয়া যাচ্ছে। কয়েকটি স্টলে গরম গরম চিংড়ি ভেজে বিক্রি করছে। তিনটি দশ টাকা। তাদের দলটি বড়ো বলে সবাই টানাটানি করছে। তারা সবাই ফাঁকা পেয়ে একটা ছাউনি ঘেরা স্টলের সামনে বসে পড়ল। সকলেই পরম তৃপ্তি সহকারে গরম গরম চিংড়ি ভাজা খেল। কয়েকটি ছেলে মাথায় জীবন্ত ঝিনুকের ডেকচি নিয়ে ঘুরছে। ঝিনুক ভেঙ্গে পেট থেকে বের করে দিচ্ছে তাজা মুক্তো। যার থেকে যেমন পারছে দাম নিচ্ছে। এক একটি পিস ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা। পর্যটকদের পকেট কাটার কেমন সুন্দর ব্যবস্থা। তপোধীরদের দলের সকলেই কিনে নিল মুক্তো। আর কবে আসা হবে কে জানে! আদৌ আসা হবে কিনা তারও তো কোন ঠিক নেই। প্রতিটি অনাঘ্রাত ফুল যেমন নতুন, প্রতিটি অদেখা স্থানই নতুন। - বিশ্বের সবই চিরনতুন। নবীনের সঙ্গে নবীনের পরিচয় ঘটে ভ্রমণের মধ্যে। ভ্রমণ মানেই তো নবীন আনন্দে চিরনতুনের খোঁজে ঘুরে বেড়ানো।

নিনা এবং জুঁইয়ের এই প্রথম সমুদ্র দেখার অভিজ্ঞতা। ডোরা জন্মাবধি সমুদ্র দেখে আসছে। এলিনাদের বাড়ি সমুদ্র পারের অদূরের এক গ্রামে। তিয়াষ সোমনাথের সঙ্গে একবার দীঘা ও আরেকবার শঙ্করপুর গিয়েছিল। পুরী আসা প্রায় সকলেরই প্রথম। ব্যতিক্রম শুধু তপোধীর। পুরীতে তপোধীরের এই দ্বিতীয় বার আসা হোল। তবে চিল্কা ভ্রমণ এই প্রথম। তিয়াষের দীঘার ঝাউবন ভালো লাগলেও এখানকার ঝাউবনের নয়নাভিরাম মধ্যাহ্নের দৃশ্য বড়োই হৃদয়গ্রাহী। দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের নীল জলরাশি, পাশে সবুজ ঝাউবন। আকাশের নীল, সাগরের নীল, ঝাউবনের শ্যামলিমা, চিল্কার খোলা জল রাশি, জেলেদের মাছ ধরা, শঙ্খচিলের দুরন্ত ভেসে বেড়ানো, বাজপাখির বুকফাটা আর্তনাদ, তাজা চিংড়ি ভাজার গরম গরম রসনা তৃপ্তিকর গন্ধ - সব মিলিয়ে অশ্রুত সুরের অর্কেস্ট্রা মনকে কেমন বিষণ্ন উদাস করে তোলে।

এছাড়া ভ্রমণের একটা চিরন্তন আবেদন তো থাকেই। ইহাই ভ্রমণের নিজস্বতা।

তাতে আবার দল বেঁধে ভ্রমণের আনন্দের তো বিশ্বে কোন তুলনাই হয় না। ঝাউবনের স্যুটিং শেষ করে তারা আবার বোটে উঠে বসে। ফেরার পথে বোট চলে এলো ডলফিন পার্কে। ডলফিনের ছবি তোলার জন্য সবাই ক্যামেরা তাক করে বসে থাকে। কিন্তু ডলফিনের কোন দেখা নেই।

বোটের চালক কুনির অক্লান্ত চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সকলেই ডলফিনের অস্তিত্ব টের পেল। বোট বার বার ঘুরে ফিরে ছুটছে। জলের মধ্যে ঘুর্ণি উড়িয়ে চলতে চলতেই ডলফিনের সাক্ষাৎ মিলল। তবে সেটা অন্ধের হস্তী দর্শনের মতোই ব্যাপার। কখনো বা ডলফিনের লেজের একটু অংশ, কখনো পিঠ, কখনো বা মাথা। একটা ডলফিনের তো দেহের তিনটাই মূল অংশ, মাথা, বুক বা পিঠ এবং লেজ। সেই অর্থেই সবাই ডলফিন দেখতে দেখতে হাস্য পরিহাসই করছিল। এক কথায় ডলফিন দেখে কেউই তৃপ্ত হলো না। সত্যিকারেব ডলফিন না দেখাব অতৃপ্তি নিয়েই তারা ফিরে এলো। ডলফিন পার্ক সম্পর্কে উড়িষ্যা সরকারের প্রচার বিজ্ঞপ্তি দেখে তারা প্রত্যাশা করেছিল যে ডিসকভারি বা ন্যাশান্যাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে ডলফিন যেমন জাহাজের পাশে পাশে লাফিয়ে বেড়ায়, কাছে কাছে ঘুরে বেড়ায় - এও তেমনি। কিন্তু তার কিছুই দেখা হলো না বলে তাদের খুবই মন খারাপ হয়ে গেল।

তবে ডলফিন পার্কে ডলফিনের খোঁজে চার পাঁচটা বোট যেভাবে ঘুরপাক খেতে খেতে ঘুরছিল, তাতে তিয়াষের একটি কথাই মনে হচ্ছিল যে - অর্থ রোজগাবের ধান্ধায় উন্মত্ত মানুষ ডলফিনদের একটুও বিশ্রাম দিচ্ছিল না। তাদের নিভৃত আশ্রয়ে হানাদার বাহিনীর এই হানাদারি তারা মেনে নিতে পারছিল না। তিয়াষের মনে হয়েছে এই সকল জীবেব প্রতি মানুষের এইটি একটি বর্বব অত্যাচার মাত্র। অচিরেই তা বন্ধ হওয়া দরকার। প্রয়োজনে পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য সেতু কিংবা রোপ ওয়ের ব্যবস্থা করে প্রাকৃতিক পরিবেশে ডলফিন দেখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ফেরার পথে রাস্তাব পাশে লিপায়েল রেস্টুরেন্টে তারা চিংড়ির মালাইকারী, সামুদ্রিক কাঁকড়ার ঝোল, সী-ফিসের পাতুড়ী দিয়ে দুপুরের ভোজ সারলো। খাবার পর পরম তৃপ্তি বোধ করছিল সবাই। বিকেলের মধ্যেই ফিরে এল সকলে। হোটেলে ঘন্টাখানেক বিশ্রাম সেরে রাত আটটা ন'টা পর্যন্ত সমুদ্রতীর, স্বর্গোদ্বারের শপিং কমপ্লেক্স ঘুরে বেড়ালো। ফিরে এসে রাত্রের লাঞ্চ সেরে লম্বা ঘুম। পরদিন ভোর ছটায় ভুবনেশ্বরের পথে। দুইটা ট্যাক্সীতে দুইভাগ হয়ে তারা যাত্রা শুরু করল। ধবলগিরিতে প্রথম তাদের যাত্রা বিরতি।

জনশ্রুতি কলিঙ্গ যুদ্ধের পরে সম্রাট অশোক হিংসা পরিহাব করে অহিংস বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়ে এখানেই নাকি চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোকে রূপান্তরিত হন। ধবলগিরিতে তারা যখন পৌছল, সেই সময় নবকিরণজাল ভেদ করে বালার্ক পূর্ব দিগন্ত কোণে উদ্ভাসিত।

দু'টি পালক

তিয়াষের হঠাৎ চোখে পড়ে অদূরে এক সোপান শ্রেণীর উপর উদীয়মান সূর্যের দিকে পিঠ দিয়ে মুক্ত কেশপাশে জুঁই দাঁড়িয়ে আছে। দেখে প্রথম নজরে সকলেরই ভ্রম হতে পারে যে কোন শিল্পীর খচিত কোন দেবীর ভাস্কর্য মূর্তি নয়তো। জুঁইয়ের দিকে তাকিয়ে তিয়াষের মনে হয় - এ যেন কালিদাসের মেঘদূতে বর্ণিত যক্ষ প্রিয়ার রূপ সুষমা ঃ

''তন্বী শ্যামা শিখরি দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিত হরিণী প্রেক্ষনা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণী ভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্রস্যাদ্ যুবতী বিষয়ে সৃষ্টিবাদ্যেব ধাতুঃ।।''

তিয়াষ জুঁইয়ের অপূর্ব রমনীয় সৌন্দর্যের পানে অপলক নেত্রে চেয়ে থাকে। ডোরা অলক্ষ্যেই জুঁইকে ক্যামেরা বন্দী করে। নিনাও ঝটপট দুটি ছবি নিয়ে নিল। নিনা এসে তিয়াষের পাশে এসে দাঁড়িয়ে টিপ্পনী কেটে বলে - তিয়াষদা, সারাজীবনই দেখতে পাবে। এখন চল আমরা এগিয়ে যাই। তারা সারাদিনই ঘুরে বেড়াল। ধবলগিরির পর লিঙ্গরাজ মন্দির, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, নন্দন কানন, কোনারক, চন্দ্রভাগা সমুদ্রতীর - অপরাহ্নে ঝাউবনের ছায়ায় ছায়ায় পুরীর হোটেলে ফিরে আসা। সারাদিনের দীর্ঘ ভ্রমণে সকলেই ক্লান্ত। তবু নিপাট ভ্রমণের আনন্দ সকলেই সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করল।

ভ্রমণের আনন্দেও তিয়াষের হৃদয় কিন্তু সম্পূর্ণ ভারমুক্ত নয়। তার মনে ক্ষণে ক্ষণেই এক সর্বত্যাগী তপস্বীনি বিদেশীনি রমণী এসে তার পথ আগলে দাঁড়ায়। তখনই তার স্মৃতির সরণি অবরুদ্ধ হয়ে যায়, ক্ষণকালের জন্য উধাও হয়ে যায় বিশ্বজগৎ, বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে পড়ে তিয়াষ। সে যে কারো কাছেই নিনিকোভার কথা বলতে পারছে না। ভাবছে - মাকে সব কথা বলে সে হাল্কা হবে। তিয়াষ মাকে সব কথাই বলতে পারে। বাবা তার ভালো বন্ধু এবং তিয়াষের সঙ্গে বেশ ফ্রি। তবু তিয়াষ বাবাকে সব কথা বলতে পারে না। কেমন যেন ভয় পায়।

কোণারক থেকে ফিরতে চন্দ্রভাগা সমুদ্রতীরে তিয়াষ ও নন্দিতা নির্জনে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ঢেউ এর খেলা দেখছিল। সে সময় তিয়াষ মাকে বলেছিল মামনি হোটেলে গিয়ে তোমায় একটা কথা বলবো। সবাই যখন স্বর্গদ্বারে শপিং করতে বেরিয়ে যাবে - তুমি কোন একটা ছুতোয় কিন্তু যাবে না। আমি সকলের সঙ্গে বেরিয়ে শরীর খারাপ লাগছে বলে চলে আসবো।

সেই পরিকল্পনা মতো পুরীর নির্জন সৈকতের এক হোটেলের বারান্দায় বসে সন্ধ্যার অন্ধকারে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ অবলোকন করতে করতে তিয়াষ নিনিকোভার বিয়ের সব

ঘটনা এবং সোনার বাংলা হোটেলে কি কি ঘটেছিল সবই মাকে জানাল।

মাকে সব জানানোর পর তিয়াষ বলে - মা, আমি কোন অপরাধ করিনি তো! তুমি আমায় যা শাস্তি দেবে আমি মাথা পেতে নেব।

নন্দিতা তো মা। নারী। সব শোনার পর নন্দিতার মাতৃ হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে। এক বরেন্যা বিদেশিনি নারীর জন্য নন্দিতার মন বড়ো ব্যাকুল হয়ে উঠল। নন্দিতা শান্ত কণ্ঠে ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে - বাবুন, তুই কোন অপরাধ করিস নি। একটা সম্পূর্ণা রমনী তোর কাছে স্ত্রীর মর্যাদা চেয়েছে, তুই তাকে সেই মর্যাদা দিয়ে শাশ্বত ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শকে গভীর মর্যাদা দিলি। আমার ছেলে বলেই তোর পক্ষে তা করা সম্ভব হলো। তোর বাবাকে আমি বাড়ি গিয়ে বুঝিয়ে সব বলবো। তুই ভাবিস না। আমার আশীর্বাদ নিনিকোভা সুখী হবে। তোর হৃদয় মন থেকে মেয়েটিকে তুই চিরকালের জন্য নির্বাসনে পাঠাস নি। মাকে নিনিকোভার কথা বলার পর তিয়াষ বেশ হাল্কা বোধ করে। তার মনের উপর আত্মগ্লানির যে বিরাট পাষাণ ভারটা চেপে বসেছিল, যার ভার বহন করতে করতে তিয়াষ কেমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তা নামিয়ে দিয়ে সে এখন সম্পূর্ণ ভারমুক্ত। তারপর মাকে বলে - মা, চল ঘরে গিয়ে বসি, এখানে আমার আর ভালো লাগছে না। বড্ডো ঘুম পাচ্ছে।

নন্দিতা হোটেলের রুমে খাটের উপ গিয়ে বসে। বারান্দার দরজাটা ভেজিয়ে তিয়াষও মার পিছু পিছু ঘরে ঢুকল। - ঢুকেই নন্দিতার কোলে মাথা রেখে চুপচাপ শুয়ে থাকে। নন্দিতা বহুদিন পর তার অবুঝ ছেলেটাকে আদর করতে পেরে খুবই খুশী হয়। যতই বড়ো হোক - নন্দিতার কাছে তো সে এখনো তার ছোট্ট বাবুন।

শপিং সেরে হৈ চৈ করতে করতে সবাই এসে ঘরে ঢুকে। দরজা ঠেলে জুঁই তিয়াষদের রুমে ঢুকে দেখে সে মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে। নন্দিতা গভীর আবেগে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

জুঁই এই দৃশ্য দেখে বলে - মিষ্টি মাসী, তুমি বুঝি তোমার বুড়ো ছেলেকে চুপে চুপে আদর করছ?

নন্দিতা প্রত্যুত্তরে বলে - ছেলে মায়ের কাছে যে চিরশিশু। বুড়ো হবে কেন?

জুঁই - তোমরা মা-পুতে বুঝি এই যুক্তি করেই আজ শপিং এ যাওনি।

জুঁইয়ের পেছন পেছন ডোরা, নিনা, এলিনা সবাই তিয়াষদের রুমে প্রবেশ করে। - সবাই দ্যাখে তিয়াষ মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে, মা তার মাথায় আদর করতে করতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। -

সবাই অবাক চোখে এক মমতাময়ী মাকে সামনে দেখে অভিভূত হয়ে যায়। ডোরা

কখনো তেমন ভাবে মায়ের আদর পায়নি। সে সবাইকে ঠেলে নন্দিতার কাছে চলে আসে। বলে - আন্টি, তুমি তিয়াষদাকে যেমনভাবে আদর করছ, আমাকে তেমনভাবে একটু আদর করে দাওনা। আমি তো কখনো মায়ের আদর পাইনি। বলতে বলতেই দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে ওঠে ডোরা। -তিয়াষ হক চকিয়ে ওঠে বসে। নন্দিতা ডোরাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। তারপর ধীরে ধীরে মাথাটা বুকে চেপে ধরে তাকে আদর করে দেয়। তিয়াষ ঘুম চোখে কিছু বুঝে উঠতে না পেরে হকচকিয়ে খাট ছেড়ে সোফার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। জুঁই, নিনা ও এলিনাও এই অদ্ভুত ঘটনায় কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়ে। তারা সবাই নন্দিতার চারপাশে বসে পড়ে। নন্দিতা এবার চারজনকেই আদর করে দিল।

ডোরা উঠে দাঁড়িয়ে নন্দিতাকে প্রণাম করে বলে - আন্টি, আমার মা থেকেও নেই। এবার তোমায় আমি 'মা' বলে ডাকব। তুমি মেনে নেবে।

নন্দিতা - আমার তো ভালোই হোল। আমার একটা মেয়ে হোল। ঠিক আছে এবার থেকে তুমি আমায় মা বলে ডেকো।

সমুদ্র সমানে তীরে আছাড় পড়ে মনের চির অসন্তোষ ব্যক্ত করে চলেছে। কিসের জন্য সমুদ্র এমন অশান্ত? কী তার দুঃখ? না কেবল নিজের যন্ত্রনায় কেবলই ফুঁসে ফুঁসে উঠছে? সাগর ছাড়া সাগরের এই যন্ত্রনা কেউ বুঝবে না।

আজই রাত সাড়ে দশটার ট্রেনে তাদের কলকাতা ফিরে আসার কথা। সকলেই ঘুম থেকে ভোর বেলাই উঠে গেছে। যাত্রীদল সাগরতীরে ঘুরে ঘুরে ঝিনুক খুঁজে বেড়াচ্ছে। হকারের দল মুক্তোমালার পাশাপাশি ঝুটো মুক্তোর পশরা নিয়ে যাত্রীদের পেছন পেছন ধাওয়া করছে। কুয়াশার চাদর ভেদ করে সূর্য উঠছে। সমুদ্রের জলে লোহিত কণা ঢেউয়ের চূড়ায় খেলা করে বেড়াচ্ছে। কেউ এই ভোর বেলাতেই সমুদ্র স্নান করছে। শীতের আমেজ আছে, কিন্তু শীত নেই। এও এক আশ্চর্য অনুভূতি। প্রাতঃ ভ্রমণ সেরে সবাই হোটেলে ফিরে এসে গরম গরম চা খেয়ে নিল। ঠিক হলো ব্রেক ফাস্ট সেরে আজ সবাই সমুদ্র স্নান করবে। মাধুরী ও নন্দিতা জীবনে এই প্রথম শালোয়ার কামিজ পরেছে। জুঁই গোঁ ধরেছে সে শাড়ী পরে স্নান করতে যাবে।

পর্যটকদের এক একটি দল ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে সমুদ্র স্নান করছে। ঢেউ এর তোড়ে কেউ গা ভিজিয়ে নিচ্ছে। ঢেউ আসতে দেখে কেউ বা পায়ের দিকে দৌড়ুচ্ছে। অনেকেই আবার ঢেউ এর মধ্যে ডুব দিয়ে বা লাফ দিয়ে ঢেউ কাটিয়ে ডুবছে-উঠছে। কেউ বা নুলিয়ার সাহায্য নিয়ে সমুদ্রে স্নান করছে। এক কথায় ঢেউ এর সঙ্গে সকলেরই যেন লুকোচুরি খেলে চলেছে। তপোধীর ও নন্দিতা সমুদ্রের জলে গা ভিজিয়ে নিয়েছে। হিমাদ্রি ও মাধুরী দ্বিধা কাটিয়ে অনেকটা স্বাভাবিক। ডোরা একজন প্রফেশনাল ফটোগ্রাফারকে

দিয়ে তার নিজের ভিডিও ক্যামেরায় সমুদ্র স্নানের দৃশ্য ক্যামেরায় বন্দী করছে। পরম আনন্দে সবাই সমুদ্রে ডুবছে-উঠছে। জুঁই আর তিয়াষও ঢেউ এর সঙ্গে খেলছে। কখনো কখনো লাফিয়ে লাফিয়ে ঢেউ পার হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা উঁচু ঢেউ এসে জুঁইকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তার শাড়ীর আঁচল টেনে ধরে তিয়াষ কোনমতে সামলে নিল। এইটা সামাল দিতে দিতেই আবারও একটা উঁচু ঢেউ এসে দু'জনকে ভাসিয়ে নিচ্ছিল। এবার জুঁই একটু উপরে থাকায় তাকে আর টেনে নিতে পারেনি। কিন্তু তিয়াষকে সমুদ্র একটানে নিয়ে যায়। তিয়াষকে না দেখে জুঁই চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। সমুদ্রের দিকে ছুটে যায়। জুঁইকে ছুটে যেতে দেখে ডোরা ও এলিনা দ্রুত ছুটে গিয়ে জুঁইকে ধরে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। তপোধীর-নন্দিতা, মাধুরী ও হিমাদ্রি - জুঁইয়ের চীৎকার শুনে পাগলের মতো ছুটে আসে। তিয়াষকে দেখতে না পেয়ে চারদিকে চীৎকার, চেঁচামেচি, হৈ চৈ এবং কান্নার রোল পড়ে যায়। সবদিক থেকেই লোকজন ছুটে আসে। এমন সময় সকলে দেখতে পায় তিয়াষ ঢেউ এর উপরে ভেসে ওঠেছে। সাঁতার কেটে আসতে চাইলেও আসতে পারছে না, সমুদ্র ক্রমশই তাকে গভীরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। খবর পেয়ে ছুটে আসে নুলিয়ারা। মুহূর্তে তিন-চারজন নুলিয়া সমুদ্র ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢেউ ভেঙ্গে তিয়াষের দিকে এগিয়ে যায়। বহুদূর গিয়ে তারা তিয়াষকে ধরে ফেলে। কিন্তু প্রবল ঢেউ ভেঙ্গে তাদের আসতে সময় লেগে যায়। ইতিমধ্যে সমুদ্রতীরে অ্যাম্বুলেন্সও এসে গেছে। প্রায় আধঘন্টার লড়াইয়ের পর তিয়াষকে উদ্ধার করে তারা বেলাভূমিতে নিয়ে আসে। ভয়-আতংক ও ক্লান্তিতে তিয়াষের সারা দেহ অবসন্ন হয়ে পড়ে। বেলাভূমির উপর তিয়াষ শুয়ে পড়ে। আর মুহূর্তেই কাউকে কোন সুযোগ না দিয়ে জুঁই পাগলিনির মতো তিয়াষের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তিয়াষের মাথা নিজের কোলের ওপর তুলে নিয়ে নীরবে অশ্রুপাত করতে থাকে। তার পরনের শাড়ী অসংলগ্ন, চুল এলোমেলো, বিস্রস্ত। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, লোকলজ্জা, মা-বাবা, সমাজ-সংসার, অসংখ্য জানা-অজানা লোকের চাউনি কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই তার। জুঁইয়ের কাছে জগৎ-সংসার মিছে। শাড়ীর আঁচল ধূলায় লুণ্ঠিত, পেটিকোটের উপর থেকে সরে গেছে শাড়ী, বুকের আঁচল খুলে পড়েছে, গায়ে ধূলো-কাদা উন্মাদিনী জুঁই বুকে জড়িয়ে ধরে থাকে তিয়াষকে। সেই অবস্থাতেই জুঁই একসময় তার সংজ্ঞা হারায়। দ্রুত দু'জনকেই একটা নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হলো। তিয়াষের ট্রমেটিক শক্ কাটিয়ে উঠতে বেশী সময় লাগেনি। কিছুক্ষণের মধ্যে জুঁইয়ের জ্ঞান ফিরে আসে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর দু'জনকেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

নার্সিং হোমের শয্যায় জ্ঞান ফিরে পেয়ে জুঁইয়ের প্রশ্ন - তিয়াষ দা কোথায়? সে কী সমুদ্র থেকে ফিরে আসেনি?

মাধুরী তিয়াষকে দেখিয়ে বলে - ওই তো তিয়াষ।

জুঁইয়ের জ্ঞান ফিরে আসার আগেই তিয়াষ তার শক্ কাটিয়ে উঠেছে। এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ। সে এসে জুঁইয়ের পাশে এসে দাঁড়ায়। জুঁই সঙ্গে সঙ্গে নার্সিং হোমের বিছানা থেকে উঠে তিয়াষের বুকে মাথা রেখে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অশ্রু ছলোছলো চোখে তাকায় তার মুখ পানে - বলে - আর কোনদিন আমি সাগর দেখতে আসব না। তুমি আজ সারাদিন ঘর থেকে বের হবে না।

হোটেলে ফিরেই তপোধীর নুলিয়াদের ডেকে তাদের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশী বকশিস্ দিল। তারা খুশী হয়ে বাবুজীদের কৃতজ্ঞতা জানিযে চলে গেল। বাকী সময়টা তারা আর হোটেল থেকে বেরই হলো না। রাত নয়টার মধ্যে তারা সবাই ডিনার খেয়ে নিয়ে পুরী স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। এই অপ্রত্যাশিত জীবন-মৃত্যুর ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে ঈশ্বরের অমল মহিমায় বেঁচে গিয়ে প্রভু জগন্নাথকে অন্তরে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করল তারা। এরই ফাঁকে চার মা বাবাই সন্ধ্যার সময় জগন্নাথ দর্শন করে ছেলের শুভ কামনায় পূজা দিয়ে এসেছে। প্রসাদী ফুল এনে তিয়াষ ও জুঁইয়ের ললাট স্পর্শ করিয়েছে।

ট্রেনে গল্পগুজব কিছু হলেও রাগিনীর সুরটা যেমন কোথায় কেটে গেছে। তিয়াষ ফিরে আসার পরও যেন কারোরই বিশ্বাস হচ্ছিল না। তীরে না আসা পর্যন্ত প্রত্যাবর্তনের প্রতিটি মুহূর্ত মনে যে সকলেরই শঙ্কা তৈরী করেছে। প্রত্যেকেই তা স্মরণ করে শিহরিত হয়ে ওঠে নিজেই নিজেই চুপ হয়ে যায়। প্রকাশ্যে কেউই আর তিয়াষের সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়া নিয়ে কোন আলোচনাই করলো না।

তিয়াষ কিন্তু বেশ স্বাভাবিক। তার কাছে পুরো ব্যাপারটাই মনে হচ্ছে একটি গেম অফ্ অ্যাডভেঞ্চার। ট্রেন চলতে শুরু করার পরই তিয়াষের হঠাৎ করে ত্রিপুরাভবনে দেখা স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যায়। তার স্বপ্নের সঙ্গে সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়া এবং ফিরে আসার ঘটনার সাদৃশ্য দেখে তিয়াষ নিজের মধ্যে কেমন উত্তেজনা অনুভব করে। তারপর সকলকেই সবিস্তারে তার দেখা স্বপ্নের কথা জানায়। সবাই তিয়াষের সেই স্বপ্ন দর্শনের কথা শুনে অবাক হয়ে যায়।

নন্দিতা বলে - বাবুন, তুই তোর স্বপ্নের কথাটা আগে বলিস নি কেন?

তিয়াষ - আমি অত মনেও রাখিনি। স্বপ্ন ভেবেই তো ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু এটা এমনভাবে আমার জীবনে মিশে যাবে তো কোনদিন ভাবিনি। মানুষের জীবনে তাহলে স্বপ্নও সত্যি হয়।

নন্দিতা - বাবুন, তোর খুব বড় ফাঁড়া কাটলো রে। বাড়ি ফিরে গিয়ে মা বিপদ নাশিনীর পুজো দেব। মা তুমি আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিলে। বলেই জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানায় নন্দিতা। জুঁই মাঝে মাঝেই কেমন আনমনা হয়ে

যায়। একটা সময় সকলেই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু জুঁই ঘুমুতে পারে না। ঘুম এলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই ভয়াবহ দৃশ্য। আতংকে সারা শরীর অবশ হয়ে আসে। ট্রেনের ভিতরে পৌষের হিমেল পরশ। কিন্তু জুঁইয়ের সারা শরীরে যেন রৌদ্র দহন।

সকলেই ভেবেছিল কলকাতায় ফিরে গিয়ে আরো দু'এক জায়গায় সবাই বেড়াবে। বিশেষতঃ শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় যাবার ইচ্ছা ছিল সকলের। এই ঘটনার পর সকলেরই উৎসাহ ফুরিয়ে যায়। হাওড়া থেকেই তারা আলাদা হয়ে গেল। ডোরা, নিনা ও এলিনা হোস্টেলে ফিরে গেল। তিয়াষ ও জুঁই তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে ত্রিপুরা ভবনে চলে এল। কলকাতায় ফিরেও তারা কোন কাজেই আর উৎসাহ পাচ্ছিল না। তাই এ যাত্রায় ফিরে যাবার সিদ্ধান্তই নিয়ে নিল। যথারীতি একত্রিশে ডিসেম্বরের বিকেলের ফ্লাইটে তপোধীর ও হিমাদ্রিরা আগরতলা উড়ে গেল। মা-বাবাদের সী-অফ্ করে জুঁই ও তিয়াষ নিজ নিজ হোস্টেলে ফিরে গেল।

ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি হঠাৎই ক্যুরিয়ার মারফৎ একটা চিঠি পায় তিয়াষ। নিনিকোভাই দিল্লী থেকে চিঠিটি পাঠিয়েছে। খামটা খুলে চিঠিটি বের করে নেয় তিয়াষ। তাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা।

প্রিয় তিয়াষ,

বিরহ-মিলন মানব জীবনের চিরন্তন ইতিকথা, আবার গীতি-গাথাও বলতে পার। আমাদের এই স্বেচ্ছাকৃত চির-বিচ্ছেদের মধ্যে আমার প্রাপ্তির ভাণ্ডার সম্পূর্ণ রিক্ত নয়। সোনার বাংলা হোটেলের স্যুইটে ফুলশয্যার রাতে আমি তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি, তাতে আমি চিরসুখী। আমি স্নাত, আমি তৃপ্ত। নারীর নারীত্ব তার সতীত্বে নয়, মাতৃত্বে। তুমি জেনে নিশ্চয়ই আনন্দিত হবে যে আমার গর্ভে তোমার সন্তান বিকাশ ও প্রকাশের সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে তিলে তিলে বড়ো হয়ে উঠছে। তুমি আমায় মাতৃত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত করেছ। আমি আজ সত্যই গর্বিত। বাবা ক্রেমলিনে রুশ সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিবের দায়িত্ব পেয়ে বদলী হয়েছে। এ মাসের শেষের দিকে আমরা চলে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে এ জীবনে আর কোনদিন দেখা হবে কিনা জানি না। মা-বাবা ও দিদিকে তোমার সব কথা অবগত করেছি। আমাদের বিয়ের সিডি দেখে তারা খুবই খুশী। আমাদের সম্পর্ক ও স্বেচ্ছাবিচ্ছেদ গভীর দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। প্রতিশ্রুতি মতো আমি শাড়ী, শাঁখা-সিঁদুর পরছি। এবং চিরজীবন তা পরে যাবো। কলকাতা থেকে কয়েক জোড়া শাঁখা ও সিঁদুর নিয়ে এনেছি। আপাতত তাই নিয়ে যাচ্ছি। জুঁইয়ের সঙ্গে

বিয়ে পাকা হলে খবরটা জানিও। রাশিয়ায় পৌছে আমার ঠিকানা জানাবো। আমরা ভালো আছি, তুমি ভালো থেকো।

ইতি-

তোমারই নিনি ।

চিঠিটা পড়ার পর একটা বুক ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। এক অজানিত বেদনা হৃদয়টাকে করাত দিয়ে যেন ছিরে ফেলতে চাইছে। লোহিত বর্ণ ক্ষরিত হয়ে হৃদয় হয়ে ওঠে রক্তাক্ত। চিঠিটি বার বার পড়ে তিয়াষ। তবু তৃপ্তি যে মেটে না। এক বিদেশিনী তার গর্ভে লালন করছে তিয়াষের সন্তান। হতভাগ্য বাবা হয়তো কোনদিন দেখতে পাবে না সন্তানের মুখ। এই আত্মগ্লানিময় পিতৃত্বের মূল্য কি? যে পিতৃত্বের কোন স্বীকৃতি নেই, সে তো বিড়ম্বনারই সামিল। এক ভিনদেশী রমণী তার জীবনে এমন একটা ঝড় তুলে দিয়ে গেল, তা কি কোনদিন থামবে না? তিয়াষ অনেকদিন গান গায়নি। কিন্তু তার জীবনে যে গান এখনো ফুরিয়ে যায়নি। কথা যখন শেষ হয়ে যায়, তখন তো গানই শুধু থাকে। তিয়াষ আপন মনে গলা ছেড়ে গাইতে থাকে,

"উদাসিনী বেশে বিদেশিনী কেসে নাইবা তাহারে জানি,
রঙে রঙে লিখা আঁখি মরীচিকা মনে মনে ছবিখানি।।"

গান শেষ হয়, সুর মিলিয়ে যায়, বহুক্ষণ তাব রেশ বাতাসে ভেসে ভেসে বেড়ায়। তিয়াষ ভেবে পায় না, কি ঘটে গেল তার জীবনে।

নিনিকোভা দেশে-ফিরে গিয়ে যোগাযোগেব ঠিকানা জানিয়ে ছোট্ট একটি চিঠি পাঠায়। তাতে বিস্তারিত কিছু নেই। মে মাসের শেষে নিনিকোভার আর একটি চিঠি পায় তিয়াষ। চিঠিটি পড়ে তিয়াষের শরীরের ভাষা সম্পূর্ণ বদলে যায়। হরিষে-বিষাদে ভেসে যায় সে। আনন্দ যে বেদনা হয়ে এমন আলোড়ন তুলতে পারে তা জানাই ছিল না তিয়াযের। প্রাপ্তির আনন্দ ও হারানোর বেদনার এমন মিশ্র অনুভূতি যে জীবনে প্রকৃত অর্থেই বিরল।

প্রিয় তিয়াষ,

গত ষোলই মে আমাদের একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে। তোমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে বাবা তার নাম রেখেছে টিউনিস্কি নাথ সেবাস্তিনা। আর একটু বড় হলে বাবু সোনার ছবি পাঠাবো। আমরা ভালো আছি। তোমার ছেলেকে আশীর্বাদ করো।

ইতি -

ভালোবাসা সহ

তোমারই নিনি।

দুষ্টি পালক

চিঠি পেয়ে তিয়াষ - একবার বুকে জড়িয়ে ধরে, আবার চুমু খায়। তিয়াষ আজ পিতা। কিন্তু পরক্ষণেই বিষাদ এসে আবার তাকে গ্রাস করে। সে যে আর কোনদিনই হয়তো ছেলের মুখ দেখতে পাবে না। তিয়াষের হৃদপিণ্ডে যেন কেউ হাতুড়ী পিঠছে। গায়ের জামা খুলে চিঠিটাকে এবার হৃদপিণ্ডের উপর চেপে ধরে তিয়াষ। তারপর ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে। আনন্দ-বেদনার মিশেলে অশ্রু বিসর্জন করে মনটাকে কিছুটা হাল্কা করে তিয়াষ। সন্ধ্যায় ব্যাণ্ডেল চার্চে গিয়ে ছেলের শুভ কামনায় মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে মাতা মেরীর মূর্তির নীচে গিয়ে দাঁড়ায় তিয়াষ। মেরীর কোলে শিশু যীশু। কী অপূর্ব স্বর্গীয় মূর্ছনা। ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বুকে হাত রাখে তিয়াষ। নিজের মনে মনেই বলে - নিনি, তুমিও তো আজ এক মাতা মেরী। তোমার কোলে আর এক দেবশিশু - আর এক যীশু। মা-মেরী, তুমি আমার সন্তানকে দেখে রেখো, ভালো রেখো আমার নিনিকে।

ঠিক এমন সময় গীর্জার ঘন্টা বেজে ওঠে। গীর্জার মঙ্গল ঘন্টার ধ্বনি শুনে তিয়াষের মন পুলকিত হয়ে ওঠে। মুহূর্তেই তার মনের সব বেদনারাশি মিলিয়ে যায়। তিয়াষের সব মুস্কিল আসান তার মা। জীবনের বড় বন্ধু। আপদ-বিপদের সবচেয়ে বড় সাথী। মাকেই ফোন করে সব জানায় তিয়াষ।

মা তাকে বলে - আশীর্বাদ করি। তোর ছেলে বড় হোক। ভালো থাকুক। তুই একটা কাজ কর। আমার নাতির জন্য একটা সোনার চেইন, আর ভালো সূতীর কিছু জামা-কাপড় পাঠিয়ে দে। রাশিয়ায় শীত বেশী। ওখানে ফারের কাপড় জামার চল বেশী। সূতীর কাপড় জামার কদর বেশী। সঙ্গে নিনির জন্য টাঙ্গাইল ও ধনেখালি তাঁতের শাড়ী পাঠিয়ে দিস্। আমি টাকা পাঠাচ্ছি।

মায়ের পরামর্শ মতো তিয়াষ নিনিকোভার ঠিকানায় একটা পার্সেল পাঠিয়ে দিল। সেকালের পিতারা প্রসূতি গৃহে গিয়ে গিনি দিয়ে ছেলের মুখ দেখতো। তিয়াষের সে সৌভাগ্য হলো না।

দু'মাসের ব্যবধানে তিয়াষ ও জুঁইদের রেজাল্ট বের হলো। এম.এস.সি.তে তিয়াষ ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হলো। ইংরেজী অনার্সে জুঁইয়েরও একই রেজাল্ট। ফল প্রকাশের পর চারদিক থেকে অভিনন্দনের প্লাবন শুরু হোল। সমাবর্তন উৎসবে দু'জনই স্বর্নপদক পেল। রেজাল্টের পরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তিয়াষকে অধ্যাপনার জন্য অফার দিল। সঙ্গে গবেষণার সুযোগ। জুঁইয়ের পড়াশুনো ও গবেষণার জন্য তিয়াষ আরো দুই বছর কলকাতায় থেকে গেল। দু'বছরের মধ্যেই তিয়াষ ডক্টরেট করে নিল। জুঁই ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ.পাশ করল। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার অধ্যাপনার পদ চেয়ে চিঠি দিল তিয়াষ। কর্তৃপক্ষ এক কথায় রাজী। সঙ্গে জুঁইও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপিকার চাকুরী পেল। শর্ত দেওয়া হোল দুইবছরের মধ্যে নেট উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হবে।

দুখটি পালক

এ দিকে কলকাতা থেকে ফিরেই তপোধীর নন্দিতার সঙ্গে তিয়াষের বিয়ের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে নিল। প্রসঙ্গতঃ নন্দিতা নিনিকোভার ঘটনা সবিস্তারে তপোধীরকে জানাল। তপোধীর এও জানল যে নিনিকোভা সন্তান সম্ভবা এবং তিয়াষই সেই সন্তানের বাবা হতে চলেছে।

তপোধীর অসহায়ের মতো অনেকক্ষণ চুপ মেরে বসে থাকে। কি বলবে কিছু খুঁজে পায় না। অনেকক্ষণ পর নন্দিতাকে বলে, বিয়ে জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন। দেশ-কালের অতীত কর্মফল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গত জন্মে ও ওরা একে অন্যকে চেয়েছিল। পায়নি। এই জন্মেও তারা পেয়েও যে পেল না। এটাকেই বলে নিয়তির নিবন্ধন। ভেবে দেখো তো - কোথায় রাশিয়া আর কোথায় ভারতবর্ষ। কোথায় দিল্লী - কোথায় কলকাতা। কয়েক মাসের পরিচয়ে এমন একটা ঘটনা ঘটলো, যার কোন ব্যাখ্যা মেলে না। নন্দিতা আজ সন্ধ্যায় চল আমরা ঠাকুর বাড়ি যাই, ঠাকুরের চরণে সব নিবেদন করে ওদের সকলের জন্য সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

নন্দিতা - আমার ছেলেটির জন্য বড়ো কষ্ট হয় গো। বাবুনের জীবনে এমন ঘটবে তা তো কোনদিন ভাবতেই পারিনি। দ্যাখো তো পুরীতে কি অঘটনই না ঘটলো। ওখানে নুলিয়ারা ছিল বলেই বাবুন বেঁচে ফিরেছে। মানুষের জীবন বৃষ্টি ভেজা দিনের মত। কখনো মুষল ধারে, কখনো ঝিরঝির, কখনো ইলশে গুঁড়ি, কখনো ঝিলিক দিচ্ছে, কখনো বা রোদের উঁকি। ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলায়। অপ্রত্যাশিত ও অনিশ্চিত ক্ষণ মুহূর্তের বুদ্বুদের সমষ্টির নামই মানব জীবন।

তপোধীর - নন্দিতা, তুমি তো দার্শনিকের মতো কথা বলছ। জীবনের কোন আকার নেই, অবয়ব নেই। জলের মতো। যে পাত্রে থাকে সে পাত্রের আকার ধারণ করে। জল গ্লাসে থাকলে নড়ে না, পুকুরে নড়ে, কিন্তু বইতে পারে না, নদীতে শুধু নীচের দিকে বয়ে যায় - সাগরে নানান স্রোতের খেলা - ঢেউ নয়, উথাল-পাথাল, মেঘে বাস্প, ঠাণ্ডায় ববফ, প্রভাতের ঘাসে শিশির - কুয়াশা - বৃষ্টি - কত তার রকম ফের - কি বলবে বলতো?

নন্দিতা - জীবন তো কবিতার ছন্দ। সারিবদ্ধ বর্ণমালা, নানা সুরের রাগ রাগিনী, রামধনুর সাত রঙ। কবির নানা ছন্দের কবিতা, সাহিত্যিক গল্প-উপন্যাস, সুরস্রস্টার নানা সুরের গান, চিত্রকরের রঙ তুলির বর্ণময় খেলা - সবেতেই জীবন ছড়িয়ে আছে। কবি কৃষ্ণধন নাথের একুশের খোঁজে কাব্যগ্রন্থটি আমি বার বার পড়ি। প্রতিটি কবিতাই আমার মনকে আলোড়িত করে।

তপোধীর - কবির স্বপ্নের নায়িকার নাম তো নন্দিতা। অতীত ছেড়ে দিয়ে চল না

দু'টি পালক

আমরা কবির ঈঙ্গিত পথের সন্ধান করি। কবির সঞ্চিত সমিধ কবিতাটি তো পড়েছ। কবি শেষ পংক্তিতে এসে লিখেছেন—

"নন্দিতা, অতিক্রান্ত অবসন্ন সময় সীমায়

এসো দু'গাছি খড়

বেনারসীর উজ্জ্বল আঁচলে বেঁধে নাও

আমাদের দুঃসময়ের সঞ্চিত সমিধ।"

- অতিক্রান্ত সময়ের পরিক্রমায় আমরা নতুন করে সমিধের সন্ধান করি, চল। আজই হিমাদ্রি আর মাধুরীকে খবর দিয়ে রাখ। আজ দিনটিও ভালো। সর্বসিদ্ধি শুক্লা ত্রয়োদশী। আজ সন্ধ্যা সাতটায় তাদের বাড়ি যাবো। তিয়াষ ও জুঁইয়ের বিয়ের কথা বলব। পারলে পাকা কথা সেরেই ফিরব। আপাততঃ আর কাউকে ডাকার দরকার নেই।

নন্দিতা - এ রাজ্যে কবি কৃষ্ণধন নাথের সঠিক মূল্যায়ন হলো না। কিন্তু তিনি যে দায়বদ্ধ কবি। কোথাও তিনি দাসখৎ লিখে দেননি। বিবেক কোথাও বন্ধক রাখেন নি, কোমরে কলসী বেঁধে উলঙ্গ রাজার কীর্তনে সামিল হননি। তাই তিনি ব্রাত্য, অপাংক্তেয়। তুমি কি দিন বদলের মৌনী লিপি পাঠ করতে পেরেছ? কবি কৃষ্ণধন নাথ একজন ক্রান্তদর্শী কবি। এখন তার মূল্যায়ন না হলেও তিনিই একদিন ভুস করে ভেসে ওঠবেন, আর সবাই চমকিত হয়ে চারপাশেই শুধু তাঁকেই দেখবে।

তপোধীর - আমারও তাই মনে হয় নন্দিতা। ওর কবিতার মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা, স্বজন-স্বভূমি-স্ব-কাল দেশ-কালের অতীত এক ইঙ্গিত নিয়ে প্রকাশিত। তাই তিনি আপন দীপ্তিতেই প্রকাশিত হবেন।

নন্দিতা - সত্য অনিঃশেষ নয়, সত্য স্ব প্রকাশ। সদা দীপ্তিমান দগ্ধ রৌদ্রের মতো প্রখর বাস্তব, উজ্জ্বল ভাস্বর। ভেরী-তুরী-যুদ্ধের দামামা লুপ্ত হবে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে, রাজা একা মসনদে আসীন। কুর্নিশ করার অনুগত ভক্তদল অস্ত্র নিয়ে শিবির বদলায়, পরিবর্তনের দুর্বার হাওয়ায় সাপের খোলসের মত পলেস্তারা খসে পড়ে ঐন্দ্রজালিক সে সব প্রাসাদের। দুর্বিনীত পারিষদ দল মেনে নেয় পরাভব, ইহাই প্রকৃত সূর্যোদয়। দু'জনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। এরই মধ্যে তিয়াষের টেলিফোন আসে। ওরা দু'জনেই এ মাসের শেষ দিকে মহানগরীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে ফিরে আসছে। পরের মাসে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন দায়িত্বে যোগ দেবে।

তিয়াষ ছাব্বিশ পেরিয়ে গেছে। জুঁই চব্বিশের পথে। বিয়ের উপযুক্ত বয়সে তারা এখন দাঁড়িয়ে। পুরীর সমুদ্রতীরে ওরা ওদের মনের কথা জানিয়ে দিয়েছে। আনুষ্ঠানিক

কথাবার্তা বলে নেওয়াই ভালো।

এবার নন্দিতা বলে - ওরা সুখী হবে তো? আমার যেন কেমন ভয় ভয় করছে। আমরা জেনে শুনে মেয়েটির সঙ্গে প্রতারণা করছি না তো?

তপোধীর - প্রতারণা কেন বলছ নন্দিতা? তিয়াষ তো অনুতাপে দগ্ধ হয়ে আরো খাঁটি হয়েছে। আমরা তো ঘটনা দুর্ঘটনার মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য নির্ণয় করতে ব্যর্থ হই। একথা সত্য যে নিনির সঙ্গে তিয়াষের সম্পর্কটা যেমন ঘটনা, তেমন দুর্ঘটনাও। প্রতারণা নয়, তবে জেনে-বুঝে সত্য গোপনের অপরাধে আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী। কিন্তু এছাড়া তো আমাদের সামনে আর কোন পথই খোলা নেই। আমরা কি আর করতে পারি। বড়জোর হিমাদ্রি ও মাধুরীর কাছে মার্জনা চেয়ে জুঁইয়ের সঙ্গে তিয়াষের বিয়ে থেকে আমরা সরে দাঁড়াতে পারি। তখন তো জুঁইকে সান্ত্বনা দিতে পারবো না। তার কৈফিয়তের কি উত্তর দেবে তখন? আমরা তো জানি শৈশব থেকেই ওরা একজন অপরকে ভালোবেসে এসেছে। আমরা যদি তা মেনে না নিই, তবে সেটাই হবে সত্যিকারের প্রতারণা। আমরা জ্ঞানতঃ দুইটি জীবন শেষ করে দিতে পারি না। একটা বিচ্ছিন্ন অতীতকে বিষ ফোঁড়ার মতো দক্ষ সার্জেনের মতো কেটে বাদ দিয়েই আমাদের অব্যক্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে। আমরা কথা দিয়ে সেভাবে কারো কাছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ নই ঠিকই। কিন্তু মৌনী প্রতিশ্রুতি সুপ্ত আগ্নেয় গিরির মতো। লাভা উদগীরণের আগেই আমাদের নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে অন্বিষ্ট হওয়া উচিৎ।

হিমাদ্রি আর মাধুরীও একই কথা ভাবছে। হিমাদ্রি মাধুরীকে বলে - মাধু, তপোধীরদা ও বৌদির সঙ্গে আমাদেব কথা বলা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। জুঁই আর তিয়াষের বিয়ের কথাটা ওরা ফিরে আসার আগেই আমাদের সেরে ফেলা ভালো হবে।

মাধুরী - আমাদের তো মেয়ে। আমাদের সরাসবি কথাটা বলা কি ঠিক হবে?

হিমাদ্রি - সেটাও তো ঠিক। কি করি বলতো। তোমার কথা শুনে তো সত্যিই ধর্ম সংকটে পড়ে গেলাম। তপোধীরদাও তো কিছু বলছে না। ওরা তো আজ-কালকার ছেলে-মেয়ে। ওরাই বা কিছু বলছে না কেন? আমরা তো সবই জানি, সবই বুঝছি। এখন এগোই কি করে?

মাধুরী - নন্দিতাও তো কোনদিন আমায় কিছু বলে না। বলতে তো পারতো। মাধুরী একটু অভিমানী হয়ে ওঠে। আবার বলে - আমবা কত ছোট বেলার বন্ধু। তবু এতদিনেও নন্দিতা মুখফুটে একটি কথাও বলল না। - তপোধীরদা - নন্দিতার সঙ্গে তার প্রেম কাহিনী কোনদিন তোমায় বলেছে। আমার ছেছরীমাই পোস্টিং হলো। বিশালগড়

থাকতাম। দূর সম্পর্কের মাসীর বাড়ি। যাতায়াতে তোমার সঙ্গে পরিচয় - প্রেম। আমি নন্দিতাকে বললাম। কিন্তু তপোধীরদার সঙ্গে নন্দিতার প্রেম -। নন্দিতা যখন সেভেন-এইটে পড়ত - সে সময় থেকে। কিন্তু কি পাকা মেয়ে জান -। তপোধীরদার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হবার পর সে আমায় তার প্রেমের কথা বলেছে। - এমনি গভীর জলের মাছ। আমিও আর বেশী কথা বলব না।

এমন সময় টেলিফোন বেজে ওঠে। - মাধুরী রিসিভার তুলে ধরে - হ্যালো - নন্দিতা? - হ্যাঁ - বল -। না, আজ আর বের হবো না। তোরা আসবি? তপোধীরদা সহ - ভালোই তো - হ্যাঁ বাড়ি থাকবে -। না -দুদিন অফিসে যাচ্ছে না। ছুটি নিয়েছে - সাতটার সময় আসবি - আনন্দ সংবাদ - খুবই ভালো - তিয়াষের বিয়ে দিচ্ছিস - কোথায় - এলে বলবি -। ঠিক আছে - রাখি।

মাধুরীর বুকটা ছ্যাঁত করে ওঠে। সারা শরীর কাঁপতে থাকে। তাদের না জানিয়ে তিয়াষের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে? সাংঘাতিক মেয়েরে বাবা - জুঁই - জুঁইয়ের সঙ্গে যে তিয়াষেব বিয়ে দেবে বলে ঠিক করে রেখেছিল। - মাধুরীর মুখে তিয়াষের বিয়ের কথা শুনে হিমাদ্রির সারা শরীর অবশ হয়ে যায়। জুঁই আগরতলায় ফিরে আসবে। ডোরা শেষ পর্যন্ত বাঙ্গালী ছেলে খুঁজে না পেয়ে বাসব বিশ্বনাথন নামে এক মাদ্রাজী ছেলের প্রেমে পড়েছে। এলিনা অনার্স নিয়ে পাশ করার পর কম্পিউটারে একটা ডিপ্লোমা কোর্স করে একটা বহুজাতিক সংস্থায় চাকুরী নিয়ে দুবাই চলে গেছে। নিনা মাস কমিউনিকেশন কোর্স করে একটা টি.ভি. চ্যানেলে বার্তা সাংবাদিকের পদে কয়েকমাস আগে কাজে যোগ দিয়েছে। ডোরা জুঁইয়ের সঙ্গে তার পড়া চালিয়ে গেছে এবং প্রথম শ্রেণী পেয়ে পাসও করেছে। আপাততঃ দেশে ফিরে যাচ্ছে। ঠাকুর্দা, ঠাকুমার সম্মতি পেলে বিশ্বনাথনকে বিয়ে করবে। ডোরার শিক্ষকতার কাজই পছন্দ। লণ্ডন ফিরে একটা কাজের যোগাড় সে করে নেবে।

ডোরা একদিন জুঁই ও তিয়াষকে লাঞ্চে আপ্যায়ন করল। তাদের সঙ্গে বিশ্বনাথনের সেখানেই পরিচয় ঘটে। সুদর্শন, স্মার্ট গোয়েঙ্কা কলেজ অফ্ কমার্স থেকে বি.কম পাশ করে জোকা থেকে এম.বি.এ.। এখন বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থার মার্কেটিং ম্যানেজার। বিশ্বনাথনের বাবা মাদ্রাজী, মা কিন্তু বাঙ্গালী। তিন পুরুষ ধরে তারা কলকাতার বাসিন্দা। তার বাবা রমন বিশ্বনাথন সিটি কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক। মা নামকরা নৃত্যশিল্পী। বাড়িতে নাচের স্কুল চালান। বাবা গোঁড়া দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। বাবা নিজে বাঙ্গালী মেয়ের পাণিগ্রহণ করলেও, ছেলেকে খ্রীষ্টান মেয়ের সঙ্গে বিয়েতে তাঁর আপত্তি আছে। মা তেমন আপত্তি না করলেও ইউরোপীয়ান মেয়ের সঙ্গে বিয়ের পর - সেই বিয়ে টিকবে কিনা এ নিয়ে তাঁর সংশয় রয়েছে। ইংরেজ মেয়েরা খুবই স্বাধীন চেতা। অতি তুচ্ছ কারণে বিয়ে

ভেঙ্গে দিয়ে পর পুরুষের হাত ধরে ঘর করতে চলে যায়। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন বা সম্পর্কের কথা বিন্দুমাত্রও ভাবে না। তেমনি ইংরেজ পুরুষরাও তাদের পরিবার বা সংসার সম্পর্কে কোন দায়বদ্ধতা স্বীকার করে না। নীতি বা মূল্যবোধের কোন ধারই তারা ধারে না। সম্পর্কের প্রতিটি বন্ধনই তাদের বড় পলকা।

লাঞ্চের পর তারা সায়েন্স সিটিতে চলে যায়। বাকী সময় তারা ঘুরে ঘুরে কাটায়। রোপওয়েতে চড়ে কাটাল অনেকক্ষণ। টাইম মেশিন, তারামণ্ডলও দেখে নিল। রোপওয়েতে চলতে চলতে তিয়াষ জুঁইকে জিজ্ঞেস করেছিল - জুঁই, এত বছর পরেও তোকে একটি কথা আমি জিজ্ঞেস করিনি। কয়েক বারই জিজ্ঞেস করবো করবো করে আর বলাই হয়নি।

জুঁই - কি জিজ্ঞেস করবে?

তিয়াষ - পুরীতে এত লোকজনের সামনে আমায় জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো এমন করে কেঁদেছিলি কেন রে?

জুঁই - তোমরা পুরুষ মানুষ, নারীর মনের ব্যথা তোমরা বুঝতে পারবে না।

"চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদনা বুঝিতে পারে
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

তুমিই আমার সকল লজ্জা, তুমিই আমার সব সম্ভ্রম। প্রেম-ভালোবাসা তো অংকের নিয়মে চলে না তিয়াষ দা, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বও সেখানে অচল। ভালোবাসার সংকোচন-সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জ্যামিতিক সূত্রও কার্যকরী নয়।

তিয়াষ - আমি যদি সত্য সত্যই ডুবে মরে যেতাম, তুই কি করতিস্ রে! জুঁই হাত দিয়ে তিয়াষের মুখ চেপে ধরে - তুমি অমন অলুক্ষণে কথা আর কখনো বলবে না। - ইস্। মরলেই হোল। আমাকে ফেলে রেখে তুমি কোনদিন মরতে পারবে না। ঠাকুরের কাছে চিরকালের জন্য আমি তোমাকে চেয়ে নিয়েছি। আমার কাছ থেকে কেউ কোনদিন তোমাকে কেড়ে নিতে পারবে না। কেড়ে নিলেও আবার আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। এ যেমন - সাগর তোমাকে ছিনিয়ে নিতে গিয়েও পারেনি। আমার সম্পদ আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। শৈশবে না বুঝে তোমার গলায় মালা পরিয়েছিলুম। তোমার উপর আমার অধিকার চিরন্তন। আমার তপস্যা ব্যর্থ হতে পারে না। আমাকে না জানিয়ে তুমি অন্য কাউকে বিয়ে করে দেখ না, সে তোমায় নিয়ে পালাতে পারবে না। তোমাকে আমার কাছে রেখে সে কিন্তু পালিয়ে যাবে। আমাদের দু'জনের সম্পর্ক এ জন্মের নয়। বহু জনমের। স্বর্গ থেকে নির্বাসনের কাল থেকে যুগ যুগান্তর অতিক্রম করেই আমরা অনাদি অনন্ত স্রোতে ভেসে চলেছি।

তিয়াষ - তোর এত আত্মবিশ্বাস?

দু'টি পালক

জুঁই - যেদিন তুমি আমায় শাঁখা সিঁদুর পরিয়ে স্ত্রীর মর্যাদা দেবে, সেদিন আমার এই জোর দ্বিগুণ হয়ে যাবে তিয়াষ দা। তুমিই তো আমার সব লজ্জা? কাকে লজ্জা পাবো বলো? ভালোবাসা নারীকে নগ্ন করে তার লাজ হরণ করে। ভালোবাসা যে লাজহরণ। নারীর প্রেমের উপর আঘাত এলেই সে সর্ব ভয় উপেক্ষা করে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়। তুমি যেদিন আমায় ধূপের মতো দগ্ধ করে নিঃশেষে আমার সমস্ত সৌরভ নিংড়ে নেবে - সেদিন আমি ভাববো - আমার জন্ম স্বার্থক -। আমি স্থাবর নই - আমি জঙ্গম। আমার ভালোবাসা উমার প্রেমের মতো জ্যোতির্ময়, রুক্মীনির প্রেমের মতো তদ্গত, সত্যভামার প্রেমের মতো উদ্বেলিত, সুভদ্রার ভালোবাসার মতো তেজস্বিতাময়।

সন্ধ্যায় যথা সময়ে তপোধীর ও নন্দিতা হিমাদ্রিদের বাসা বাড়িতে আসে। হিমাদ্রি ও মাধুরী দু'জনেই বাড়িতেই ছিল। দু'জনের মনেই গভীর বিষণ্ণতার ছাপ। - নন্দিতাদের মাধুরী এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে। তবে তাতে প্রাণের টান নেই। কথায় আড়ষ্টতা, আপ্যায়নে কৃত্রিমতার ছোঁয়া। নন্দিতা ও তপোধীর সবই বুঝতে পারে। কিন্তু কোন কথা না বলেই সোফায় বসে। একটু পরে হিমাদ্রিও আসে।

হিমাদ্রিই বলে - তপোধীর দা, তোমরা কিন্তু অনেকদিন পরে আমাদের বাসায় এলে।

তপোধীর - সময় কোথায় বল। তোমরাও তো আজকাল তেমন যাওনা। মাধুরী কোথায় গেল?

হিমাদ্রি - ভেতরে গেছে হয়তো। এক্ষুনি আসবে। তোমরা বস। কেউই কোন কথা বলে না। একটু পরে মাধুরী ট্রেতে চার কাপ চা সঙ্গে প্লেইটে দুই প্লেইট মিষ্টি নিয়ে টি-টেবিলের উপর রাখে। তারপর বলে - তপোধীর দা, মিষ্টি নিন। চা খান। - নন্দিতা নে রে।

তপোধীর ভাবছে। কিভাবে কথাটা শুরু করবে। হিমাদ্রি ভাবছে - তপোধীরদা তিয়াষের বিয়ে ঠিক করলো, আমায় একবারও জানালো না। নন্দিতা ভাবছে - মাধুরী - বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করছে না কেন? আমি তো মাধুরীকে তিয়াষের বিয়ের কথা বলেছি। মাধুরী ভাবছে - নন্দিতা এমন স্বার্থপর - আমার মেয়ের কথাটা একটুও ভাবলে না। তিয়াষ পড়াশুনোয় খুবই ভালো। - আমার জুঁইই বা কম কিসে?

কথাটা শুরুই করে দি। তপোধীরের ভাবনা।

তিয়াষের বিয়ে কোথায় ঠিক হোল? তপোধীরদা বলছে না কেন?

মাধুরীটা দিন দিন জানি কেমন হয়ে যাচ্ছে? বড্ডো স্বার্থপর - নন্দিতা।

দ্যাখবো তিয়াষের জন্য কেমন পাত্রী তারা জুটিয়েছে - মাধুরী।

চারজনের মধ্যেই এমনি নানা ভাবনা মনের মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে।

- মাধুরী - তপোধীরদা চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খান। ভাবছেন কি?

তপোধীর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলে - হিমাদ্রি, তোমাকে কথাটা ঠিক কি ভাবে বলি - ভেবে উঠতে পারছি না।

হিমাদ্রি - তিয়াষের বিয়ে ঠিক করেছেন তো। তা কোথায়?

তপোধীর - তোমায় কে বললো তিয়াষের বিয়ে ঠিক করেছি?

মাধুরী - কেন নন্দিতাই তো টেলিফোনেই বলল।

নন্দিতা - আমি বলেছি - তিয়াষের বিয়ে ঠিক হয়েছে? আমি বলেছি তিয়াষের বিয়ে দিচ্ছি - বিয়ে দিচ্ছি আর বিয়ে ঠিক হয়েছে - এক কথা হোল?

মাধুরী - বিয়ে দিচ্ছিস মানে তো - বিয়ে ঠিক না করে কি বিয়ে দিচ্ছিস?

নন্দিতা - বিয়ে দিচ্ছি মানে বিয়ে দেবো। আর সেজন্য এসেছি তোদের মতামত জানতে।

মাধুরী - কার মেয়ে? মেয়ে কি করে?

মাধুরীর কথা শুনে এবার তপোধীর ও নন্দিতা হাঁ হয়ে যায়। - মাধুরী এ কি বলছে? নিজেকে সামলে নিয়ে এবার তপোধীর বলে - হিমাদ্রি, তোমরা জুঁইকে বিয়ে দেবে না?

হিমাদ্রি - নিশ্চয়ই দেব? ·

তপোধীর - আমরা তো জুঁইয়ের কথাই বলতে এসেছি।

এতক্ষণে মাধুরী ও হিমাদ্রির টেনশন মুক্ত হয়। দু'জনে একসঙ্গে হেসে ওঠে। তারপর মাধুরী বলে - আমরা ভেবেছি তোমরা অন্য কোথাও তিয়াষের বিয়ে ঠিক করেছ। - তোমাদের কথা শুনে তো আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছি। দ্বিধা-সংশয় নিয়ে কেবল এক অস্থিরতায় দুলছি।

হিমাদ্রির কথায় এবার তপোধীর ও নন্দিতাও হেসে উঠল। এরপর চারজনই ভারমুক্ত হয়ে হো হো করে হেসে উঠে।

নন্দিতা বলে - মাধুরী, তুই বড় স্বার্থপর রে। তুই কি করে ভাবলি জুঁই ছাড়া আমরা অন্য মেয়ের সঙ্গে তিয়াষের বিয়ে দেব? -

নন্দিতার কথায় মাধুরী সোফা ছেড়ে উঠে নন্দিতাকে জড়িয়ে ধরে। - দুই আজন্মের বান্ধবী দুইজনকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে কেঁদে ফেলে - আমরা আসলে বড্ডো বোকা রে!

দু'টি পালক

হিমাদ্রি উঠে তপোধীরকে প্রণাম করতে যায়। তপোধীর তার আগেই হিমাদ্রিকে বুকে টেনে নেয়।

তারপর নানা কথার পর দুই পক্ষেরই আলাপ-আলোচনা শেষে আগামী অগ্রহায়ন মাসের পঁচিশ তারিখ জুঁই ও তিয়াষের বিয়ের দিন পাকা করা হোল। এখন মাত্র আষাঢ় চলছে। সামনে দীর্ঘ সময় পাওয়া যাবে। অগ্রহায়নের পঁচিশ মানে ডিসেম্বরের এগার তারিখ। কথাবার্তার শেষে নন্দিতা বলে - চল না গো, আমরা সবাই একদিন উদয়পুরে 'মা ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দিরে পূজা দিয়ে আসি' - অনেকদিন যাওয়া হয় না।

জুঁই-তিয়াষের ফেরার আগে ডোরা লণ্ডন ফিরে গেল। বিশ্বনাথন সহ সকলেই ডোরাকে এয়ারপোর্টে গিয়ে সী-অফ্ করে এল। ব্রিটিশ এয়ার লাইসেন্সের বিমানে সোজা হিথ্‌রো বিমান বন্দর। লণ্ডন পৌঁছেই ডোরা খবর জানাবে। ডোরা-বিশ্বনাথন দু'জনই বিষণ্ণ।

যথাসময়ে তিয়াষ ও জুঁই আগরতলা ফিবে এলো। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাব কাজে যোগ দিল। আগরতলা ফিরেই তারা তাদের বিয়ের পাকা কথা জানতে পারল। মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে তিয়াষ নিনিকোভাকে তার বিয়ের তারিখ জানিয়ে চিঠি পাঠাল।

বিবাহের রীতি মেনে মঙ্গলাচরণ, গায়ে হলুদ সবই হোল। ডোরা ও এলিনা জুঁইকে কথা দিলেও বিয়েতে আসেনি। তবে নিনা এসেছে। তিয়াষের বন্ধু সোমনাথও এসেছে। বিয়ের আসরে অপ্রত্যাশিত ভাবে বিশ্বনাথন এসে সকলকে অবাক করে দিয়েছে। সোহম, পলাশ, আব্দুল, তৃপন, সায়ন, মৌ ও মিলিদি বিয়েতে এসেছে। মৌ ও মিলিদি তাদের বরদের নিয়ে এসেছে। চারদিকে আনন্দের ফোয়ারা।

বিয়ের দিন সকলা বেলা ক্যুরিয়ারে তিয়াষের নামে একটা পার্সেল এলো। পার্সেল খুলে তিয়াষ পেল একটা গ্রিটিংস কার্ড, সাইবেরিয়াব শ্বেত ভল্লুকের ফার দিয়ে তৈরী দুটি সুন্দর আলোয়ান। এক জোড়া শ্বেত পালক আর একটা চিঠি।

প্রিয় তিয়াষ,

তোমার বিয়ের দিনই আমার প্রেরিত এই পার্সেল তোমার হাতে পৌঁছে যাবে। আমার বাবাই রাশিয়ান দূতাবাসের মাধ্যমে তোমার কাছে এই পার্সেল পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। তুমি আর জুঁই আগামী এগারই ডিসেম্বর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার অঙ্গীকার করেছ জেনে বড়োই খুশী হলাম। তোমাদের জন্য আমার আগাম শুভেচ্ছা রইলো। তোমাদের জন্য রাশিয়ার শ্বেত ভল্লুকের ফার দিয়ে তৈরী অঙ্গবস্ত্র পাঠালাম, দুজনেই গ্রহণ করো। সেই

সঙ্গে সাইবেরিয়ার মরাল-মরালীর এক জোড়া শ্বেত-শুভ্র পালকও পাঠালাম। এই দুইটি পবিত্র পালক। তোমরা যেমন ময়ূরের পালককে পবিত্রতার প্রতীক মনে করো, আমাদের দেশে এই শুভ্র হংস বলাকার পালক তেমনি পবিত্রতার প্রতীক। একদিন আমি ক্রেমলিনের গীর্জায় গিয়েছিলুম। চার্চের আর্চ বিশফ্ আমায় এই দুটি পালক দিয়ে বলেছিলেন - তোমার সবচেয়ে প্রিয়জনকে এই পালক দুটি উপহার দিও। এই পালক দুটি যাদের কাছে থাকবে তারা চিরসুখী হবে। তোমরা ছাড়া এই জগতে আমার একমাত্র প্রিয়জন - আমার গর্ভজাত সন্তান। তাকে আমি আমার সমস্ত স্নেহ ও তোমার আশীর্বাদকে পাথেয় করে বড় করে তুলবো। তোমার সুখ-শান্তি কোনরকমে বিঘ্নিত হোক, তা কোনদিনই আমার অভিপ্রেত নয়। তাই সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক স্বরূপ এই পালক দুটি তোমাদের জন্য পাঠালাম। ঘরের কোন পবিত্র স্থানে রেখে দিও। তোমাদের কল্যাণ হবে। তোমরা সুখী হও।

ইতি -

তোমারই নিনি।

বিয়ের লগ্ন সমাগত। চারদিকে আলোর রোশনাই। বর সহ বরযাত্রীরা এসে গেছে। আকাশে আতসবাজির ফুলঝুরি। নহবত বসেছে। কিন্তু তিয়াষের মন হংস মরালের পাখায় ভর করে শূন্যপথে নিরুদ্দেশের পানে উড়ে যায়। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে একসময় কুশণ্ডিকা, সাতপাকে ঘোরা ও অরুন্ধতী দর্শন সমাপনের মধ্য দিয়ে তিয়াষ ও জুঁই বহু প্রতীক্ষিত নতুন পথের পানে পা বাড়াল। বিয়ের পর অভ্যাগতরা ধীরে ধীরে বিদায় নেয়। নেমে আসে নীরবতা। বাইরে তখন সাহানা রাগে বিসমিল্লা খানের সানাইয়ের ক্যাসেট বেজে চলেছে।